পথিক

প্রকাশক :—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ।

প্রিণ্টার :—
শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলি-বন্ধনে বেঁধে নীরব ক'রে রেখো না। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বল।"

পথ, নিশীথের কালো পর্দ্দার দিকে তর্জ্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে!

"ওগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা এত ইচ্ছা সে-সব গেল কোথায়?"

বোবা-পথ কথা কয় না। কেবল সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক পর্য্যন্ত ইসারা মেলে রাখে!

"ওগো পায়ে-চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মত পড়েছিল, আজ তারা কি কোথাও নেই?"

পথ কি নিজের শেষকে জানে? যেখানে সমস্ত লুপ্ত-ফুল আর স্তব্ধ-গান পৌঁচল; যেখানে তারার আলোয় অনির্ব্বাণ-বেদনার দেয়ালি-উৎসব হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথিক

— ১ —

একটা কোন বড় রকমের অসুখ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে যেমন অসোয়াস্তি বোধ করা যায়, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারা যায় না যে কেন তাহা হইতেছে; উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে কেবলই তাহা যেন বাড়িয়া চলে; মনের জোর করিয়া 'কিছু হয় নাই' বলিয়াও কোন উপকার পাওয়া যায় না; ঐ গ্লানিটা অদৃশ্য কণ্টকের মত শরীরের কোন খানে লাগিয়া থাকে, তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার উপায় নাই,—মিত্র-পরিবারেও ঠিক এই রকমের একটি অশান্তির কাঁটা, কোথায় যেন লাগিয়াছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন কিন্তু ইহার কারণ কেহই ঠিক ধরিতে পারেন নাই এবং প্রত্যেকেই যে ঐ অদৃশ্য কাঁটার খোঁচা খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন তাহা তাঁহাদের সমস্ত কাজ এবং কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল।

সকালে চা খাইতে বসিয়া বীরেন্দ্রনাথ খানসামাকে বকিয়া উঠিলেন—সবাই এক-একটি নবাব-জাদার নাতী হয়েছ, আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না—'

কিন্তু বাস্তবিক তখনও চা-এর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই এবং নবাব-জাদার নাতী 'খান্‌সামা' ঠিক সময়েই তাহার কর্ত্তব্য

কি?' কি

বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী করুণা তাঁহার কন্যা দীপ্তিকে লইয়া পড়িলেন—দু'স্লাইস্ টোষ্ট, আর একটা ডিম, এমন কিছু গুরুভার পদার্থ নয়, যার ওপর একটা কলা আর একটা সন্দেশ খাওয়া যায় না!—খাও।

কন্যার মেজাজও বিগ্‌ড়াইয়া গেল। সন্দেশ খাওয়াটা যদিও 'জিওমেট্রি' পড়া নয় তবু ঈষৎ নাকিস্বরে সে বলিল—পারি না মা, তবু জোর ক'রে খাওয়াবে—'

ইহার পরই তাহার নাকের ডগাটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল এবং চশমা-ঢাকা চোখের কোণে জল ভরিয়া উঠিল! তাহা দেখিয়া কি বলিতে যাইয়া করুণা থামিয়া গেলেন এবং একখানা টোষ্টের উপর মাখন মাখাইতে লাগিলেন। তাঁহার কপালের মাঝখানে সেই অশান্তির খোঁচার দাগ একটু বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

শ্রীশ মাথা নীচু করিয়া চা-এর 'কাপে'র উপর ঝুঁকিয়া যেন কি গভীর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিল, তাহা দেখিয়া করুণা বলিয়া উঠিলেন—তোর আবার হ'ল কি?

ইহার উত্তর কিছু শোনা গেল না, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ততাসহকারে এক নিশ্বাসে চা-এর 'কাপ' খালি করিয়া শ্রীশ উঠিয়া পড়িল।

এতক্ষণ কেহই লক্ষ্য করেন নাই যে, শ্রীশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই চা খাইতে বসিয়াছিল, কিম্বা এটা তাহার প্রতিদিনের নিয়মের মধ্যে বলিয়া সকলেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু করুণার দিদি সুবর্ণ তাহা এতক্ষণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভগিনীর নিকট অল্প দিন হইল আসি[illegible]ছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে সংসারের সমস্ত কিছুই যেন তাঁহার [illegible]ইয়া গিয়াছে, কিছুই অবিদিত এবং অগোচর নাই।

ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি, করুণার মানসিক দুশ্চিন্তা, দীপ্তির কি একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা এবং শ্রীশচন্দ্রের আদি ও অন্ত, নাড়ী ও নক্ষত্র সবই, এই ক'দিনে তিনি জানিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এমন ভাবে তিনি কথা কহেন যেন সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা লইতে পারে।

শ্রীশ ঘরের দরজার কাছে যাইতেই স্বর্ণ বলিয়া উঠিলেন—তিয়াত্তর নম্বরে যাবে বুঝি?

এটি মুখের কথা কিন্তু শ্রীশ এমন ভাবে আড়ষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া একটা কথার তীর বুকের মাঝখানে আসিয়া বিঁধিয়া গিয়াছে! সে শুধু একবার কপালটাকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—হাঁ।

চামচে করিয়া খানিকটা ডিম মুখে দিয়া চোখ একটু ছোট করিয়া স্বর্ণ বলিলেন—ও—'

ঐ ছোট্ট 'ও'-শব্দটির অন্তরালে যে কি রহিল তাহা সকলেই বুঝিলেন কিন্তু কেহই কোন কথা কহিলেন না; কারণ উহা হইতে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। মিত্র-পরিবারের বুকে অশান্তির খোঁচা তেমনিই বিঁধিয়া রহিল।

শ্রীশ চলিয়া যাইবার পরে বীরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া স্বর্ণ বলিলেন—দেখুন, এ-সমস্ত কিন্তু আপনাদের জন্যেই হচ্ছে। অতটা স্বাধীনতা, ছেলেই হ'ক আর মেয়েই হ'ক, কাকেও দেওয়া উচিত নয়।

বীরেন্দ্রনাথ ছুরি লইয়া একটা কেক-এর উপর একটু চাপ দিয়া একবার স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ কতকটা যেন 'আমার ছাগল আমি যদি লেজের দিকে কাটি, তাতে তোমার কি?' কিন্তু মুখে বলিলেন—হুঁ—'

এখানে কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া সুবর্ণ করুণাকে লইয়া পড়িলেন—তোর ঐ মেয়েটাকে যা ধিঙ্গী ক'রে তুলেছিস্ করুণা, আর যা চাল-চলন হচ্ছে ওর, সমাজে বা'র কর্‌বি কি ক'রে?

সুবর্ণের কথার মাঝখানেই দীপ্তি বলিয়া উঠিল—ও-ই যাঃ! কি হবে? শান্তাকে একটা বই পাঠাতে হবে—একেবারে ভুলে গেছি!

সে টেবিল ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

করুণাও এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, যেন অমনি কোন একটা মতলব খাটাইয়া দিদির হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তিনিও বাঁচিয়া যান।

চা খাওয়া শেষ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ খবরের কাগজে মুখ ঢাকিলেন, তাঁহার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সুবর্ণ করুণাকে বলিলেন—তা হ'লে শ্রীশের ও-কথাটা সত্যি?

করুণা। সত্যি বৈকি। ও যখন ধরেছে তখন কর্‌বেই। ও ত আর ছোট নয়? ওর মনে যদি এটা লেগে থাকে, করুক, তাতে আমাদের বাধা দেবার ত অধিকার নেই।

সুবর্ণ। অধিকার নেই? তার মানে? আশ্চর্য্য কর্‌লি করুণা! তুই না মা?

করুণা হাসিয়া বলিলেন—আমার মাতৃত্বের অভিমানকে বড় ক'রে, সুস্থ সবল মনের ছেলের স্বাধীনতায় হাত দেবো কি ক'রে? তা ছাড়া ও ত আর চুরি ডাকাতি কর্‌তে যাচ্ছে না!

সুবর্ণ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—স্বাধীনতা? একে বল্‌তে চাও স্বাধীনতা? ডাকাতি নয় ত কি? জোর ক'রে রাস্তার লোকের কাছ থেকে কাপড় কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াটা ডাকাতি নয়? এই যে 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' ব'লে উপদেশ দিচ্ছিলে, এটার অর্থ

কি? আমার যদি ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার কর্‌ব, তাতে তোমার মাথা-ব্যথা কেন? আমার খুশীমত চল্‌বার অধিকার এবং স্বাধীনতা অবশ্য আমার আছে।

করুণা কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর দিবার ছিল না বলিয়া নয়, তর্ক এবং অনর্থক একটা গোলমাল হইবে ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু স্থবর্ণ ছাড়িলেন না; তিনি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন—এই যে কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে পথে পথে টো-টো ক'রে বেড়ান, এরই মধ্যে কি খুব একটা পৌরুষ আছে? আর এই বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পুলিশের হাতে মার খাওয়া, জেলে যাওয়া—'

করুণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন—আছে। এত বড় পৌরুষ আমাদের বংশে কেউ দেখায় নি। ওর এই পৌরুষে আমি ধন্য হ'য়ে গেছি। পড় নি কাগজে তার বিবরণ? যখন তারা মেয়েদের সঙ্গে অমন কাপুরুষের মত ব্যবহার কর্‌ছিল, তখন আমার শ্রীশ—আমার ছেলে—'

কথার মাঝখানে স্থবর্ণ হাসিয়া বলিলেন—এই নিয়ে তুই গর্ব্ব করিস্ করুণা?

করুণা। গর্ব্ব?—গর্ব্ব বল্‌লে ঠিক আমার মনের কথাটা প্রকাশ হয় না; সে আমি তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না দিদি, কি মনে হয় আমার, যখন ঐ ছবি আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে!

স্থবর্ণ একটু বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—চমৎকার ছবি।

আজ সকালে এই যে ঘটনাটুকু হইয়া গেল, মিত্র-পরিবারে মাসী-মাতার আবির্ভাবের পর হইতে প্রতিদিনই ঠিক ঐ রকম হইতেছে। কিন্তু কোন প্রতিকার হইবার উপায় নাই অথচ আরো বেশী দিন এমন সহ্য করাও সকলের পক্ষে শক্ত।

কিন্তু আপনা হইতেই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে শুধু খাইবার ও শুইবার ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সময় বাহিরে কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীশ ত পিতার বহু পূর্ব্বেই ঐ পথটি খুঁজিয়া লইয়াছিল, এবং দীপ্তি তাহার ঘর ছাড়িয়া বড় একটা বাহির হইত না। কিন্তু করুণার হইল মুস্কিল। দিদির হাত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন না।

সংসার পাতিয়া সংসারী হইয়া কত ভুল ত্রুটি লইয়া যে তিনি চলিয়াছেন তাহাই শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণ বুঝাইয়া দিলেন—করুণার 'মা'-হওয়াই একটা ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে, কারণ ছেলে-মেয়েকে তিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই; এবং ইহার জন্য যে তাঁহাকে চিরজীবন ভুগিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহই আর নাই—ইত্যাদি।

স্বর্ণ ও করুণার মধ্যে আকৃতি, স্বভাব এবং সংস্কারের এত পার্থক্য যে, সকলে তাঁহাদের সম্বন্ধটিকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না। স্বর্ণের চোখ দুটি সর্ব্বদাই দেখিতে পায়—অন্যায়, অশোভন, যাহা কিছু নীচ। তিনি যেন মানুষের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কিছু যে দেখিবার আছে তাহা ভাবিয়া পান না। একজন কেহ অপরিচিত তাঁহার কাছে আসিলে, একবার দেখিয়াই তিনি ঠিক করিয়া ফেলেন—ঐ অপরিচিতের মধ্যে কতখানি নির্লজ্জতা, কতখানি নির্ব্বুদ্ধিতা, কতখানি উপযুক্ত চাল-চলনের অভাব ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। তাহার নাক্‌টা কতখানি কুৎসিত রকমের উঁচু বা থ্যাব্‌ড়া, মুখের হাঁ, বড় বা ছোট হওয়ার জন্য কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে, পোষাক পরিধানের বিশেষত্বে তাহাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ—বখাটে, ইয়ার, বাবু ইত্যাদি ভাবিয়া লইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় না।

কোন ছেলের মাথায় বড় চুল দেখিলে বলেন—'মটর ড্রাইভার' ছোট দেখিলে বলেন—'কয়েদী'। মেয়েদের জ্যাকেটের ছাঁটের কম-বেশীর জন্য যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাও ইহা হইতে কম শ্রুতিমধুর নয়।

মন্দিরে বা পারিবারিক উপাসনার সময়ও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিছুতেই তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দেওয়া হয় না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে থাকে—ঐ ছেলেটা, ঐ মেয়েটির দিকে যেন 'কেমন করিয়া' তাকাইল! তাহার তাকান'র ভিতর যেন কি একটা কদর্য্য ভাব ছিল এবং ঐ মেয়েটি যেন হাসিয়া তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল।

সুবর্ণের ধারণা, আজকাল সমাজটা এত উচ্ছৃঙ্খল এবং বেয়াড়া হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি না রাখিলে তাহা অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করিবে। তাই তিনি এমন ভাবে সকলের সঙ্গে মিশেন যে, মনে হয় তিনি যেন এই জগৎটার মত একটা 'বোর্ডিং-হাউসে'র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াই জন্মিয়াছেন। অথচ ঠিক কেমনটি হইলে যে জগৎ সুন্দর হয় তাহা তিনিও যে বুঝিতেন তাহা মনে হয় না।

তাঁহার নিজের কেশ এত অসম্ভব রকমের সংযত যে, প্রলয়ের ঝড় বহিতে সুরু হইলেও এক গাছি চুল স্থানচ্যুত হইবার উপায় নাই। বসন এমন নৈপুণ্য-হীনতার সহিত পরিহিত যে, দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না।

তাঁহার শারীরিক গঠন সুন্দর। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের বিকাশ নাই। লাবণ্য এবং লালিত্য তাঁহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে! তাঁহার চোখ মুখ নাক সর্ব্বদা তাঁহার তাড়া খাইয়া যেন ইচড়ে পাকিয়া

গিয়াছে। পাতলা ঠোঁটের আড়ালে মুক্তার মত দাঁতগুলি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, শারীরিক নিয়ম পালন ছাড়া তাহারা ভুলিয়াও এমন কিছু করিয়া বসে না, যাহাতে সাধারণ মানুষের মন খুশী হইয়া উঠে।

একবার তাঁহার স্বামী চন্দ্রকুমার তাঁহাকে একটু হাসিতে বলিয়া যে তাড়া খাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানে। সুবর্ণও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন—আমি 'ন্যাকামি' সইতে পারি না—'ওঁকেও' ছেড়ে কথা কই না।

শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ যে শুচিতার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাদের কপালে শুধু যেমন অশুচি এবং অপবিত্র স্তূপ বহন করাই লেখা থাকে, সুবর্ণেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। অনবরত ঐ সমস্ত বিষয় ভাবিয়া এবং সতর্ক হইবার চেষ্টা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ আপনার অজ্ঞাতসারে সকলের নিকট হইতে কেবলই দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন।

কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্রী নহেন। কেহ তাঁহার খোঁজ না লইলে, আপনি গায়ে পড়িয়া তাহার খবর লইতেন এবং এই গায়ে-পড়া জোর-করা একটা সম্বন্ধ তিনি সকলের সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। মানুষের নিকট হইতে ভয় এবং ভক্তি তিনি জমিদারী খাজনার মত আদায় করিয়া লইতেন। 'ভালবাসা'য় তাঁহার প্রয়োজন ছিল কি না জানি না, কিন্তু এই 'আদায়' বা 'প্রাপ্য' দিবার সময়ও মানুষ সহজে পার পাইত না। যে মুহূর্ত্তে হুকুম হইত তখনই তাহা সম্পন্ন না হইলে আর রক্ষা থাকিত না। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন—উহাদের কাজের মধ্যে তাঁহার আদেশ পালন করিবার কতখানি অনিচ্ছা রহিয়াছে, কাজ করিবার

সময় তাহাদের হাত কেমন ভাবে নড়িতেছে বা চলিবার সময় কেমন ভাবে পা পড়িতেছে তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

এক সময়ে দীপ্তিকে কি একটা করিতে বলায় সে কেমন করিয়া উঠিয়া গেল, তাহার যাওয়ার মধ্যে কতখানি না-যাইবার ইচ্ছা ছিল তাহা তিনি করুণাকে বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীশ ডাকিল—মা!

স্বর্ণ করুণার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—ছেলে এল বেড়িয়ে, দুধ দাও গে জুড়িয়ে!—

করুণা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীশকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

সমস্ত দিন পথে পথে অনাহারে ঘুরিয়া বেড়াইলে যেমন একটা কালো ছাপ মুখের উপর আসিয়া পড়ে, শ্রীশের মুখের উপরও সেই রকম দাগ লাগিয়াছে, চোখ ঈষৎ লাল, পা ধূলায় ভরা! গায়ের খদ্দরের জামাটা চটের আকার ধারণ করিয়াছে!

শ্রীশ বলিল—আজ বিচার শেষ হ'ল মা। স্থধীরের ছ'মাস জেল হয়েছে! তা'হোক্ এটা সহ্য হবে কিন্তু মিসেস্ রায়ের—'

করুণা, শ্রীশের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিলেন—চুপ—চুপ, ও যে তোর মাসী শ্রীশ!

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা তাই না হয় হ'ল, কিন্তু ওঁর ঐ বিলিতি কাপড়ের বাক্সটা ত আর এখানে রাখা চল্‌বে না মা!

করুণা। তুই কি পাগলের মত বক্‌ছিস্ শ্রীশ! 'চল্‌বে না' কি? তুই কি মনে করিস্ জগৎটাকে এক ছাঁচে ঢালাই কর্‌বি নাকি? তোর যদি ঐ মত হয়, তা হ'লে তোর মাসীর সঙ্গে খুব মিল আছে বল্‌তে হবে।

'এমন শরীর কি করিয়া হইল, কি কি ব্যায়াম করা হয়, যুযুৎসু জানা আছে কিনা, লাঠি খেলায় কতদূর দখল আছে, বোমা কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানা আছে কিনা—' এবং ইহার উত্তরে পুলিশ তাহার নিকটে কোনটিতে 'না' পায় নাই—সে ও-সমস্তই জানে।

হাকিম প্রশ্ন করিলেন—কোথা হইতে শিক্ষা লওয়া হইয়াছে, তোমার দলের অন্য লোকের নাম কি ? গুরু কে ইত্যাদি।

সুধীর বলিল—সুস্থ শরীরটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি। যুযুৎসুটা 'কেম্ব্রিজে' থাক্‌তে শিখেছি, লাঠি খেল্‌তে শিখেছিলাম বনোয়ারীলালের কাছে, আমাদের দরোয়ান, সে এখন স্বর্গে, আর বোমা তৈরী-করা শিখেছিলাম কলিকাতার কলেজে —এম্‌ এস্‌, সি ক্লাসে।

অপরাধগুলি যদিও অত্যন্ত গুরুতর, কারণ কৃষি-বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞাতব্য এবং একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যা ছাড়িয়া ঐসব বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি 'এই প্রথম অপরাধ' বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া হাকিম সুধীরের ছয় মাস সশ্রম কারাবাস রায় প্রকাশ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছাদের উপর বীরেন্দ্রনাথ, করুণা, সুবর্ণ এবং দীপ্তি, শ্রীশের নিকট ঐ সমস্ত শুনিতেছিলেন, এমন সময় নীচে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল ; সেই শব্দটি ক্রমে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া থামিয়া গেল। তাহার পরই শোনা গেল—দীপ্তি—'

করুণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ওমা ! এ যে মায়া !

সুবর্ণ যেন করুণার কথা বিশ্বাস করিতে চান না, এমন ভাবে বলিলেন—মায়া ?

ছাদে আসিয়া সকলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া অন্ধকারে একবার সকলকে দেখিয়া লইয়া করুণার কাছে বসিয়া মায়া বলিল—হাঁ আমি মায়া, তোমরা মায়া-কাটালেও আমি মায়া।—আজ কি বার ছোট-মাসী ?

মায়ার কথার সুরে অভিমানের আভাস পাইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া করুণা বলিলেন—ভুলে গেছি মা, একেবারে ভুলে গেছি, গাড়ী পাঠাই নি।

মায়া হাসিয়া বলিল—তা ত যাবেই !

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কি ক'রে এলি ?

মায়া। কলেজ থেকে একটা ভাড়াগাড়ী ক'রেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাঝ-পথে এসে বাস্-এ চড়্‌বার ইচ্ছে হ'ল, তাই গাড়ীটাকে বিদেয় দিয়ে তাতে উঠে পড়্‌লাম।

সুবর্ণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুই একা ?

মায়া। না, একা কেন ?—আরও প্রায় ত্রিশ জন মানুষ ছিল। আমি যে সিট্-টায় এসে বস্‌লাম সেখানে আর একজন ভদ্রলোক বসে-ছিলেন। তিনি দেখ্‌লাম আমায় চেনেন।

সুবর্ণ। তুই অবাক্ করলি মায়া !—চেনে মানে ?

মায়া। মানে কি ক'রে জান্‌ব ? দেখ্‌লাম তিনি আমায় চেনেন। নমস্কার ক'রে একটু স'রে বসে বল্‌লেন—শ্রীশবাবুর সঙ্গে আমিও দিন-কতক ঘুরে এসেছি।

সুবর্ণ। কি স্পর্দ্ধা !—তুই কি বল্‌লি ?

মায়া। আমি নমস্কার ক'রে বললাম—বড় কি কষ্ট পেয়েছেন ?

সুবর্ণ ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—আত্মীয়তা না ক'রে বুঝি আর পারলে না ?

মায়া। না মা, পার্‌লাম না। তিনিই ত আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বেশ ছেলেটি। অত চওড়া কপাল বড় একটা চোখে পড়ে না। স্থধীরবাবুর খবর ত তাঁর কাছেই পেলাম।

স্থবর্ণ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—তোর বেহায়ামি দেখে অবাক্ হচ্ছি!—তোর লজ্জা ক'র্‌ল না?

মায়া। মা, তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই! বাস্‌-এ যাচ্ছি, শ্রীশদার বন্ধু ভদ্রলোক অমন সহজ ভাবে এসে কথা বললেন, তার মধ্যে অন্যায় কোথায় দেখ্‌লে?

স্থবর্ণ। অন্যায় তোর কথা বলাতে।

এবার মায়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দীপ্তি তাহাকে টানিয়া তাহার ঘরে আনিয়া গলা জড়াইয়া বলিল—রাগ করেছিস্ ভাই দিদি আমার ওপর?

যেখানে কিছু লাভের আশা থাকে সেখানে মানুষের ধৈর্য্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দীপ্তির উপর রাগ বা অভিমানের কোন কারণ না থাকিলেও মায়া একটু কেমন আড়ষ্ট ভাব ধারণ করিয়া অত্যন্ত ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল—নাঃ, রাগ কর্‌ব কেন তোমার ওপর?—আর কর্‌লেই বা তাতে তোমার কি এল গেল?

দীপ্তি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। বার বার করিয়া ক্ষমা চাহিল। তাহার ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে, গাড়ী পাঠাইবার কথা মাকে মনে করিয়া দেয় নাই। শেষে অভিমান করিয়া বলিল—কিন্তু যদি জান্‌তিস্ দিদি, কি ক'রে আজকের দিন কেটেছে আমার তা'হলে—'

দীপ্তির গলার স্বর ভারী লক্ষ্য করিয়া মিথ্যা অভিমানের খোলস ফেলিয়া হাসিয়া মায়া বলিল—না গো না! অত সহজে মায়ার

অভিমান হয় না। তোদের মত ভগ

গড়েন নি।—তুই কি ব'লে কাঁদ্‌ছিস্ দী

তার জন্যে কান্না কেন ?

দীপ্তি। আমি বুঝি সে-জন্যে কাঁদ্‌ছি ? কিপ্রাশ করিয়াও দীপ্তি না আস্‌তিস্—তাহ'লে—' আছে, কিন্তু সে

মায়া এবার দীপ্তির দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তাহার সর্ব্বগ্রাসছে না। কাছে দীপ্তির না-বলা সমস্ত কথাই ধরা পড়িল। তাহার গালে চুমো দিয়া আদর করিয়া বলিল—খুব 'সার্‌মন্' শুনেছিস্ বুঝি ?—বেচারী !

মায়া ঐ 'বেচারী' কথাটা এমন ভাবে বলিল যে, দীপ্তি তাহার কান্নার মধ্যেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না ! চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—উঃ, সে কি বক্তৃতা দিদি ! সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে ! তবু তুই আমাকে বল্‌তে চা'স্ নরম চাম্‌ড়া ?

মায়া। নিশ্চয় বল্‌ব। নরম নয়ত কি ? শক্ত হ'লে হাত ঠেক্‌লেই বেজে ওঠে। আমায় বলুন না !—প'ড়ে প'ড়ে মার খাবি তা কি হবে ? তোরা ভাবিস্ কোন গুরুজন যদি কোন সমস্যার কথা কিম্বা যা-কিছু বলেন, তাই মাথা পেতে নিতে হবে এবং নেওয়াটা উচিত, কোন তর্ক বা বিচার না ক'রে ! আমি কি ভাবি জানিস্ ?—ভাল হওয়ার যে সমস্ত নিয়ম-কানুন চোখের সাম্‌নে লট্‌কে রেখেছেন আমাদের গুরুজনেরা, তা হচ্ছে 'স্লেভ্‌ মেণ্টালিটি'র বীজ। একটা কোন নিজস্ব মত প্রকাশ করেছ কি সর্ব্বনাশ !—অম্‌নি ধম্‌কানি ! আর ঐ ধম্‌কানিকে প্রশ্রয় দিস্ তোরাই।

—স্কুল-কলেজের কম্পাউণ্ডে দেখি দলে দলে ঘুরে বেড়ায় সব নম্রতা, শীলতার এক একটি প্রতিমা !—মাথাটি নীচু পিঠটি উঁচু ! মুখের উপর আছে তাদের ভাল মেয়ের মার্কা মারা !

..দ হুটোপাটি করে, এঁরা চোখ রাঙ্গিয়ে
ত নেই,—আমাদের দেখে শেখ।

.ন লাহোর থেকে এলাম, এখানকার ছেলে-
দেখে হেসে বাঁচি না; কিছুতেই ভেবে পেতাম না,
. ওরা কি ক'রে এমন বুড়ো হ'য়ে উঠল!—হাস্‌তে জানে
ত জানে না, কথা কইতে জানে না। সবারই প্রাণে যেন একটা আতঙ্ক লেগে রয়েছে—এই বুঝি খারাপ হ'য়ে গেলাম! নিজেদের এত পল্কা, এত সস্তা মনে করে এরা! এদের অভিভাবকেরা ভাবেন যেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—খারাপ হ'য়ে যাবার জন্যে। কেউ তাদের হাত ধ'রে ঐ পথে নিয়ে গেলে যেন তারা বেঁচে যায়।—আশ্চর্য্য মানসিক দুর্ব্বলতা!

সদাহাস্যময়ী মায়ার মুখে এ-সমস্ত তীব্র কথা শুনিয়া দীপ্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে মায়ার কাছে বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া অত্যন্ত ভীত-ভাবে বলিল—ভাই দিদি, তোকে ত এমন কোন দিন দেখি নি?—কি হ'ল তোর?

মায়া। কি হ'ল?—মার কাছে আজ যে-সমস্ত অপমানের কথা শুন্‌লাম, তা ভুল্‌তে হয় ত চিতায় শুতে হবে।—কি অবিশ্বাস! দেখ্‌ দীপ্তি, আমার সময় সময় মনে হয়, মানুষ যে খারাপ হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ অবিশ্বাস।

দীপ্তি অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মেয়ে। সে কোন বিষয়ে কিছুতেই অভটা যাইতে পারে না। মায়ার কথার ঈষৎ প্রতিবাদের স্বরে বলিল—কিন্তু দেখাও ত যায় যে—'

মায়া। যা দেখা যায়, তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তার মধ্যে আমি অন্যায়ও কিছু দেখ্‌তে পাই না। তোমরা দেখ শুধু 'কাজ'কে,

—৩—

সে-রাত্রে বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়াও দীপ্তি ঘুমাইতে পারিল না। তাহারই পাশে মায়া শুইয়া আছে, কিন্তু সে জাগিয়া আছে কি না বোঝা যায় না। ডাকিতেও সাহস হইতেছে না। বিছানায় শুইয়া অবধি মায়া একই ভাবে পড়িয়া আছে। ক্রমে ঘরের নিস্তব্ধতা অসহ্য হওয়াতে দীপ্তি মায়াকে একটু ঠেলিয়া ডাকিল—দিদি!—'

মায়া একেবারে উঠিয়া বিছানা হইতে নামিয়া বলিল—চল্ একটু ছাদে ঘুরে আসি।

বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু শ্রীশের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। দীপ্তিকে কাছে টানিয়া লইয়া মায়া বলিল—দেখ্ Sinners have no rest! শ্রীশ-দা এখনও বসে বসে লিখ্‌ছে! কিন্তু কি লিখছে জানিস্?

দীপ্তি। আমি জগতের অনেক জিনিসই জানি না বা বুঝতে পারি না, আমার দাদাটি তার মধ্যে একটি! জন্মে অবধি ওকে দেখ্‌ছি, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ওকে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

মায়া। বুঝ্‌তে হ'লে ভালবাস্‌তে হয় দীপ্তি, এই খানটায় এগিয়ে আয়, বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবি।

দীপ্তি মায়ার পাশে দাঁড়াইয়া এক হাতে তাহার কোমর জড়াইয়া আর এক হাতে ছাদের প্রাচীরের উপর ভর দিয়া দেখিল, শ্রীশ তাহার টেবিলের উপর লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া আছে, দুই তিনবার কলম লইয়া কি যেন লিখিতে চেষ্টা করিল, শেষে

কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হাত দুটি জড় করিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

মায়া বলিল—ঐ শ্রীশ-দা! দুনিয়ার ব্যথার বোঝা বয়ে বেড়ায় কিন্তু এখন এমন একজন কেউ ওর পাশে নেই যে, ওর কপালটায় হাত বুলিয়ে দেয়—একবার তাকায় ওর মুখের দিকে! ওকে তোরা গম্ভীর চাপা, আরো কত কি বলিস্, না?—এখন দেখ্ একবার, ঐ গম্ভীর ঐ চাপা মানুষটার মধ্যে কি করুণ বেদনার উৎস ছাপিয়ে উঠেছে!

দীপ্তি। দিদি, তুই এমন ক'রে সব জিনিসকে দেখ্‌বার চোখ ফুটিয়ে দিস্ যে, সত্যি বল্‌ছি আমার ভয় করে।

মায়া। নির্ভয়ে ত অনেক দিন কাট্‌ল, এবার একটু ভয় কর্, একটু ভাব্। দিনের আলোতে হাসি-গানের ভিতর দিয়ে যে পৃথিবীকে দেখিস্, রাতের অন্ধকারে তাকে কেমন দেখায় একবার ভাল ক'রে দেখে নে।

শ্রীশকে দেখিতে দেখিতে উভয়েরই সময়ের জ্ঞান ছিল না। ড্রইং-রুমের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। দীপ্তি বলিল—আর নয় দিদি, শুবি চল্। অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

মায়া একটু বেশী অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, দীপ্তির কথা শুনিতে পায় নাই। দীপ্তি আবার ডাকিল—দিদি, চল্ ঘরে যাই।

মায়া। কিন্তু কি ক'রে যাই বল্ ত? চোখের সাম্‌নে ওকে ঐ-রকম দেখে ঘুমাতে পার্‌ব না ত। ও কাঁদ্‌ছে! জানিস্ দীপ্তি, ঐ-রকম ক'রে পুরুষ মানুষরা কাঁদে! ঐ হাত দুটো যে ওরই তা যেন ওর খেয়াল নেই! কি ক'রে মোচ্‌ড়াচ্ছে, দেখেছিস্? আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছে—আমার মনে হয় কান্নাটা পুরুষের পক্ষে একটু শক্ত। কাঁদ্‌তে

গেলে সমস্ত শরীরের ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় হ'তে থাকে, ওদের কাছে কান্নাটা আমাদের মত সহজ নয়।

দীপ্তি। যাবি ভাই একবার ওর কাছে?

দীপ্তি এমন সহজ সরলতার সঙ্গে ঐ কথাটি বলিল যে, মায়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—বলিস্ কি দীপ্তি! তুই যাবি?

দীপ্তি। হাঁ, তাতে ক্ষতি কি?—অন্যায় কি আছে এতে?

মায়া। না, আমি অন্য কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের কথা ভাব্‌ছি না। আমার মনে হয় আমাদের ও এখন সইতে পার্‌বে না। তাছাড়া আমরা ওর এই কষ্টের ওপর আরো খানিকটা লজ্জা চাপিয়ে দেবো। এখন শুধু একটি মানুষ ওর কাছে যেতে পারে দীপ্তি, সে তুইও ন'স্, আমিও নই।

দুই ভগিনীতে আবার বিছানায় আসিয়া শুইল। দীপ্তি মায়ার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি, ওর কিসের দুঃখ?—

মায়া অত্যন্ত শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল—জানি না দীপ্তি—তুই ঘুমো।

সকালে চা খাওয়ার পর শ্রীশ প্রতিদিনের মত পলায়নের আয়োজন করিতেছে দেখিয়া মায়া বলিল—শ্রীশ-দা, তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে, এখুনি পালিও না।

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—শ্রীশ-দা তোমার যদিও পালাতে পার্‌লে আর কিছুই চায় না, তবুও হুজুরে হাজির রইল।—কি কথা শুনি?

মায়া। প্রথম নম্বর হচ্ছে—তুমি পরের বোন্‌দের জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষটা ঘেঁটে যেখানে যেখানে ভাল খদ্দর পাও তা জোগাড় ক'রে এনে দাও, এদিকে তোমার নিজের বোন্‌গুলো দেশী খদ্দর ত দূরের কথা, 'জাপানী' বা 'ম্যাঞ্চেষ্টারের' খদ্দরও পায় না।

মায়ারই কথার প্রতিধ্বনির মতই শ্রীশ বলিল—নিজের বোনগুলো পরের ভাইয়ের খোঁজ-খবর নিতে এতই ব্যস্ত যে, আমার ঘরে খুব কম ক'রে এখনও প্রায় দশ জোড়া ভাল অন্ধ্রদেশের খদ্দর সাড়ী রয়েছে তা একবার কষ্ট ক'রে দেখ্‌বারও ফুরসুৎ পায় না!

মায়া হাসিয়া বলিল—ওরে বাস্‌রে! আচ্ছা বাপু, আমি না হয় প্রথম নম্বরে হার্‌লাম। দ্বিতীয় নম্বর হ'চ্ছে—আজ ঠিক একমাস হ'ল তুমি আমায় দেখ্‌তে যাও নি! প্রত্যেক ভিজিটার্স ডে'তে 'এব্‌সেণ্ট' হওয়ার দরুণ তোমার একটা শাস্তি আমি ঠিক করেছি।

শ্রীশ। তা এটাও বৃথা হবে। তুমি দ্বিতীয় নম্বরেও হার্‌লে। একমাস্ পূর্ব্বে শ্রীশ 'শ্রীঘর' বাস কর্‌ছিল—তার অপরাধটা স্বেচ্ছাকৃত নয় বোধ হয়।

মায়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা শ্রীশ-দা, তুমি কি আগে জান্‌তে পেরেছিলে আমি তোমাকে ও-সব প্রশ্ন কর্‌ব?

শ্রীশ। দূর, তা কেন, আমি যে তোর দাদা।—দাদা মানে জানিস্ ত?

মায়া। খুব জানি বাবা, তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে? 'নন্‌-কো-অপারেশন' আর 'প্যাসিভ্ রিজিস্‌টান্স্' প্রচার ক'রে ক'রে সত্যি তোমাদের মাথার ঘিলুগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে—'

ভাই-বোনের এই স্নেহের কলহটুকু সকলেই আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছিলেন। এমন কি স্বর্ণও হাসিয়া বলিলে—শ্রীশ আর মায়ার পাল্লায় পড়্‌লে মরা মানুষও হেসে ওঠে।

অনেক দিন পরে মিত্র-পরিবারে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘ্‌লা আকাশের গায়ে সোনার আলোর মত এই হাসিটুকু বজা

রাখিবার জন্ম মায়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে করুণাকে বলিল—মাসী-মা, শ্রীশ-দা'র সঙ্গে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে এনে একদিন খাওয়াতে হবে।

করুণা বলিলেন—সে ত ভাল কথা—আমি খুব রাজি। তোমরা দিন ঠিক কর।

কিন্তু শ্রীশ আপত্তি করিল—সুধীর না ফিরলে ও-সব হবে না মায়া—'

মায়া রাগিয়া বলিল—তোমাদের sentiment-গুলো সব পচে গেছে শ্রীশ-দা, ওটা মোটেই healthy sign নয়। তা ছাড়া সুধীর বাবু একথা শুনলে খুশী ছাড়া দুঃখিত হবেন না।

মায়ার জয় হইল। বীরেন্দ্রনাথ মায়ার পক্ষ লইলেন। বলিলেন—তাহ'লে ঐ খাওয়াটা সকালেই হওয়া চাই, আর তার জের্ রাত পর্য্যন্ত চল্‌তে দিতেও আমার আপত্তি নেই। তাতে আমার একটা লাভ হবে। অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি এই সব 'মিনিয়েচার' গান্ধীদের নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করব। এই সুযোগে সেটা হ'য়ে যেতে পারে।

মায়া, দীপ্তি, শ্রীশ এই তিন জনের মধ্যে আর একবার তর্ক হইয়া যাইবার পর ঠিক হইল, রবিবার অর্থাৎ পরের দিনই সকলকে আনিয়া খাওয়াইতে হইবে।

তখন বেলা প্রায় দশটা। বেয়ারাকে দিয়া নিমন্ত্রণপত্র যথাস্থানে পাঠাইয়া দীপ্তির ঘরে বসিয়া মায়া একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। দীপ্তি স্নান সারিয়া ভিজা চুলের ডগায় 'গের' দিয়া মায়াকে তখনও পড়িতে দেখিয়া তাহার হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—বাবা, রাত দিন বই! আমরা যেন আর কেউ নই!—'

মায়া হাসিয়া বলিল—বা রে মেয়ে, নিজে দিব্যি ক'রে স্নান সেরে এলেন—আর আমি বেচারী একলাটি থাকতে না পেরে একটু পড়তে বসেছি, অমনি চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নেওয়া হ'ল! কিন্তু এমন জায়গায় থামালি দীপ্তি, তোকে কোন দিন ক্ষমা কর্‌ব না—ওঃ কি সুখ পাচ্ছিলাম যে—'

দীপ্তি। ছাই সুখ!

মায়া। ছাই সুখ?—বলিস্ কি রে! তিন দিন পরে জর্জ্জের সঙ্গে আইরিসের দেখা হয়েছে, তাও আবার কত কষ্ট ক'রে, কত বাধা এড়িয়ে, বুড়ী পিসির চোখে ধুলো দিয়ে, সন্ধ্যা[illegible] অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে, চারিধার নিস্তব্ধ—আইরিস্‌কে [illegible]ছে টেনে নিয়ে জর্জ্জ চাপা আর ভারি গলায় বল্‌ল—I love you [illegible]is, I—'

আইরিস্ তার মুখখানি জর্জ্জের মুখের কাছে [illegible] ধর্‌ল। জর্জ্জের ঠোঁট দুটি নেমে আস্‌ছে! আইরিস্ কেঁপে উঠ[illegible]! তার চোখ বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে সুখের আবেশে, আর বাঁদর মেয়ে তুই এসে বাধা দিলি?'

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—যত trash নভেল পড়বে!

মায়া। Trash?—তার মানে?—আচ্ছা ধর্ তুই [illegible]ন ঐ আইরিসের মত একজনকে মুখ বাড়িয়ে দিবি আর যদি তখন বাধা পড়ে—তুই কি করিস্?

দীপ্তি। জানি না—যাও—'

মায়া। খুব জান বাবা, খুব জান; আচ্ছা দেখা যাবে, [illegible]ত আর আজই মর্‌ছি না। কিন্তু বলে রাখ্‌ছি, কাল মেলাই Gr[illegible]-shot এখানে এসে পড়বে—

দীপ্তি। তাতে আমার কি?

মায়া। এমন কিছুই নয়, তবে লোভে বা 'লভে' প'ড়ে সে বেচারীকে—'

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—আঃ থাম্ বল্‌ছি।

মায়া থামিল না, হাসিয়া বলিল—সে বেচারী বিলেত যাবার সময় তোকে মেলাই জিনিস দিয়ে গেছে।

দীপ্তি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন স্নানটা সেরে নাও গে ত লক্ষ্মী মেয়ের মত, নইলে কালকের মত বকুনি খেতে হবে।

মায়া উঠিয়া বলিল—নাঃ সেটার প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ নেই ; এখন tangible কিছু খাবার জন্যে পেটটা চেঁচামেচি কর্‌ছে—চল্‌লাম।

মায়া স্নান করিতে চলিয়া গেলে দীপ্তি, জর্জ্জ ও আইরিসের নিকট অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বইখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল এবং জর্জ্জ ও আইরিস্‌কে তাহাদের বড় দুঃখের মিলন-সুখ নিঃশব্দে উপভোগ করিতে দিল।

দীপ্তি পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছে। বারে বারেই আইরিস্ কাঁদিয়া বলে—কি হবে জর্জ্জ? পিসি-মা আর বাবা কিছুতেই—' তাহার কথা আর শেষ হয় না, কান্নায় কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। জর্জ্জ নিষ্ফল আক্রোশে দন্তে দন্ত চাপিয়া বলে—Damn it! কিন্তু কোন উপায় দেখিতে পায় না।

ঝোপের মধ্যে নিশাচর পক্ষী ডাকিয়া উঠে…আইরিস্ শিহরিয়া জর্জ্জকে জড়াইয়া ধরে…সময় বহিয়া যায়! আইরিস্ ভয়ে ভয়ে বলিল—আর ত থাকা যায় না জর্জ্জ, আজ ছেড়ে দাও—' জর্জ্জ বলিল—তবে যাই আইরিস্—' আইরিস্ তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলে—আর একটু থাক—একমিনিট, শুধু একমিনিট—'

জর্জ্জ তাহার চওড়া হাতখানি আইরিসের গালে বুলাইয়া বলিল—সাম্‌নের এপ্রিলে আমার মাইনে হবে সাত পাউণ্ড। আর তিন পাউণ্ড যদি কোন মতে যোগাড় কর্‌তে পারি…আচ্ছা থাক্, এখন কাজ করি আট ঘণ্টা, ধর যদি এবার থেকে আর চার ঘণ্টা বেশী কাজ করি আর 'ব্রেকফাষ্ট'টা বাদ দিয়ে যদি একেবারে 'লাঞ্চ' খাই,—না তাতে আমার কোনই কষ্ট হবে না আইরিস্, তাহ'লে বোধ হয় বছরখানেকের মধ্যে তোমার জন্যে ছোট্ট একখানা ঘর—ওঃ আইরিস্, ছোট্ট একখানা নিজের ঘর…তুমি নিজের হাতে সব সাজাবে কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখ্‌ছি পুরাণো 'ফার্‌নিচার' কিন্‌তে দেবো না, সব নতুন চাই—

আইরিস্ জর্জ্জের মাথাটি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—জর্জ্জ—my husband—'

হঠাৎ জর্জ্জ বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল! আইরিস্ দেখিল, তাহার বাবা চাবুক হাতে লইয়া, তাহাদের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে এবং কিছু দূরে তাহার পিসি-মা!

জর্জ্জ লাফাইয়া আইরিসের পিতার হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া তাহারই উপরে উহার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেই আইরিস্ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—না জর্জ্জ, তা হ'তে পারে না।

জর্জ্জ চাবুক ফেলিয়া তাহার আরক্ত চোখদুটি আইরিসের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—Good bye—'

স্নানের ঘরে জলপড়ার শব্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মায়া তখন গান ধরিয়াছে। দীপ্তি বই ফেলিয়া দিয়া একবার ডাকিয়া উঠিল—দিদি তোর হ'ল? কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। দীপ্তি আবার বইখানি তুলিয়া লইল।

এই অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন এবং স্বাভাবিক কাহিনীটি দীপ্তির মনকে ক্রমেই গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল, সে পড়িতে আরম্ভ করিল—
এক সপ্তাহ পরে জর্জ্জ একখানি পত্র পাইল, আইরিস্ লিখিতেছে :—

'কাল আমার বিয়ে জর্জ্জ—আমি যখন বল্‌তে পার্‌ছি একথা, তখন তোমার কষ্ট পাবার কোন কারণ থাক্‌তে পারে না। তা-ছাড়া আমার কষ্ট ঘোচাবার জন্যে তোমাকেও আর বার ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে হবে না। বুড়ো মার্‌কুইসের টাকাগুলো—থাক্ সে কথা। এই লোকের হাতেই একটু লিখে জানিও তোমাকে কোথায় দেখ্‌তে পাব—আর একটিবার অন্তত তোমাকে দেখ্‌তে চাই—'

তোমারই আইরিস্

জর্জ্জ লিখিল :—

কাল যখন গির্জ্জায় যাবে, ঠিক ফটকের পাশেই আমায় দেখ্‌তে পাবে, কিন্তু বেরিয়ে এসে আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না। তার কারণ তোমার বিয়ের সময় জান্‌লাম চারটে পঁয়তাল্লিশ আর আমার ট্রেণও ঠিক ঐ সময়ে ছাড়্‌বে। আমি 'নিউজিলাণ্ড' যাচ্ছি আইরিস্। শুনেছি সেখানে এখনও সভ্যতাটা এত প্রবল হ'য়ে ওঠে নি, তাছাড়া কাজ কর্‌বার পক্ষে অমন দেশ আর নেই। খুব কাজ কর্‌ব সেখানে গিয়ে—

তোমার জর্জ্জ

দীপ্তি আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পাতা উল্‌টাইয়া ফেলিল। ইহাতে সেই পরের দিনের কথা লেখা আছে। জর্জ্জ ফটকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চারিদিকে গোধূলির অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতেছে,

লোকের ভিড় ঠেলিয়া আইরিসের গাড়ী আসিয়া থামিল—তাহার মুখ মোমের মত সাদা !

দীপ্তি আর পড়িতে পারিল না। বই ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিল, না, দিদিটা আমার আজকের সব আনন্দ নষ্ট ক'রে দিল—ওর স্নান কি আজ আর হবে না ?

সে আসিয়া স্নানের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল—দিদি ! বাবা, তোর আজ হ'ল কি ?

মায়া উত্তর দিল—বাঃরে মেয়ে, এখনও দশ মিনিট হয় নি !

মায়া ঘরে আসিতেই দীপ্তি বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দিদি, এ কিন্তু ভারি অন্যায়, না ?

মায়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে কি অন্যায়, হঠাৎ অমন ক্ষেপে গেলি যে ?

দীপ্তি। পয়সাটাই বড় হ'ল, মানুষের প্রাণটা কিছু নয় ?—'

মায়া বুঝিতে পারিল যে, সে এতক্ষণ বইখানা পড়িতেছিল, বলিল—তা যদি হ'ত তাহ'লে কোন গোলই থাক্‌ত না, আর তোকেও কষ্ট ক'রে গল্প পড়্‌তে হ'ত না।

দীপ্তি। চাই না পড়্‌তে, ওঃ, ওদের সমাজটা কি হৃদয়হীনদের সমাজ !

মায়া। ওগো ঠাকৃরুণ, সমাজটা চিরদিনই হৃদয়হীন, আর সব সমাজই এক রকম, 'আমাদের' ও 'ওদের' ব'লে বিশেষ পার্থক্য নেই।

দীপ্তি। কিন্তু কেন ওরা পাবে না পরস্পরকে ?—ওদের কি অপরাধ ?—'

দীপ্তির কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই করুণা ঘরে আসিয়া বলিলেন—কিরে ! তোরা যে ওপর থেকে নাম্‌তেই চাস্‌ না !

বিমল। ঐ ত তোমার ভুল শ্রীশ! কে থাবার ঠিক ক'রে রাখ্‌বে?—তাকেই ক'রে নিতে হবে সব, নিজের হাতে।

শ্রীশ। তাহ'লে তুমি বল্‌তে চাও, এই যে দেশের লোকের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে কত রকম নাম দিয়ে, তার থেকে কিছু ঐ কর্ম্মীরা দাবী কর্‌তে পারে না?

বিমল। না। সেটা তাঁদের জন্যে রাখা হবে—যাঁরা দেশের জন্যে চিন্তা কর্‌ছেন।

বিমল এই 'চিন্তা' কথাটির উপর এমন করিয়া জোর দিল যাহাতে বোঝা যায়, যেন চিন্তা করিলে মানুষ পঙ্গু হইয়া যায়, কাজেই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঐ টাকা সযত্নে রক্ষিত হইবে। যাহারা কাজ করে তাহাদের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কারণ নিজেদের সুখ-সুবিধা তাহারা যেমন করিয়াই হোক করিয়া লইবেই।

বিমল বলিল—এই ধর না পুলিনবাবু। তিনি শুধু ভাব্‌তে জানেন। মানুষের মনের মত ক'রে কি ক'রে ভাব্‌তে হয় তা তিনি জানেন। আর তাঁর ঐ চিন্তাকে কাজে লাগাতে পার্‌লে কত সহজে যে উন্নতি হ'তে পারে, তা তাঁর মত এমন সহজে কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। বাস্তবিক অমন ক'রে উপায়গুলোকে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলে কাজ কি সহজ হ'য়ে আসে না?

এবার শ্রীশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মায়া বলিয়া উঠিল—তাহ'লে এক কাজ করুন না কেন বিমলবাবু, এই কর্ম্মীদেরও ভাব্‌তে বসিয়ে দিন। ভেবে ভেবে প্রবন্ধ লিখে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে যদি ওরা কাজে নামে, তাহ'লে ওদের দু'বেলা দু'মুঠোর জন্যে ভাব্‌তে হবে না—ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘট্‌বে না। বলেন ত আমিও চিন্তা কর্‌তে রাজী আছি। আপনার কাগজে লিখ্‌লে, কি রকম 'পে' করেন?—

দু'একটা ইংরিজি কাগজ ভাল প্রবন্ধের জন্যে দৈনিক সত্তর টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে থাকে।—মাস ছয় লিখ্‌তে পার্‌লেই 'প্রপাগাণ্ডা ওয়ার্কস্‌' আর অত শক্ত মনে হবে না।

মায়ার কথার তীব্র খোঁচাটি বিমলকে বেশ একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কোন কথা বলিবার না পাইয়া মাথা নীচু করিয়া থালার ভাত-তরকারীগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল, কিন্তু ঐগুলিকে যে মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হইবে তাহা যেন তাহার মনে নাই।

দীপ্তি বিমলের এই বিব্রত ভাবটি তাহার চশমার আড়াল দিয়া দেখিয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে তাকাইয়া নীরবে জানাইতেছিল—আর কেন ভাই দিদি? ওকে ছেড়ে দে—'

করুণা তর্ক থামাইবার জন্য বলিলেন—এই মাত্র তুই সকলকে বলিয়ে নিলি যে, খাবার সময় কেউ তর্ক কর্‌তে পার্‌বে না আবার নিজেই আরম্ভ করেছিস্‌?

মায়া লজ্জিত হইয়া বলিল—ভুলে গেছি মাসী-মা, কিন্তু সব সময় চুপ ক'রে থাকাও শক্ত।

খাওয়া শেষ হইলে বসিবার ঘরে সকলে আসিতেই, বিমল মায়ার পাশে বসিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ যে আপনি বল্‌লেন প্রবন্ধের কথা,—সত্যি লিখুন না। আপনার মধ্যে এমন চমৎকার সব জিনিস রয়েছে!—

মায়া। কি লিখ্‌ব?

মায়ার কথার সুরে উৎসাহ পাইয়া, বিমল বলিল—কি লিখ্‌বেন?—সব চেয়ে সহজে আপনি যা বল্‌তে চান বা পারেন,

তাই।—নারীর কথা, তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তার বাধা, এই সব—আমি আর কি বল্‌ব আপনাকে? সে সব ত আপনি বোঝেন। আমি চাই আপনারা এবার বেরিয়ে আস্থন, আমাদের দেখ্‌তে দিন্, সৃষ্টির প্রথম থেকে যাদের আমরা সব দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম, শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হাজার রকমের নিষেধ-বিধান তৈরী ক'রে রেখেছি—সে সমস্ত সম্বন্ধে প্রত্যেক নারীর আলোচনা কর্‌বার সময় এসেছে—গতানুগতিক ধারণা, সংস্কার বা প্রথাগুলোকে একটু ঘসে মেজে দেখ্‌তে হবে।

মায়া। কি হবে?

অতখানি বক্তৃতার পর ছোট্ট ঐ উত্তরটি পাইয়া বিমল আবার যেন উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—কষ্টি-পাথরের ওপর দাগ পড়্‌লে খাঁটি মেকি ধরা পড়ে। সত্যকে চেন্‌বার সুযোগ পাব—'

মায়া হাসিয়া বলিল—কাজ চালান নিয়ে যখন কথা তখন যদি সোনার চেয়ে পেতলটাকেই বেশী দরকারী বলে ভাবি তাতে আপনার রাগ কর্‌বার কি আছে?

বিমল। দরকারী ভাব্‌তে পারি কিন্তু তাই বলে সোনাকে অস্বীকার কর্‌ব কেন?

মায়া। অস্বীকার ত কর্‌ছে না কেউ। আমাদের দেশের মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব চায় না কোন দিন, তাতে অশ্রদ্ধার চেয়ে শ্রদ্ধাই বেশী স্পষ্ট। তাঁরা বলেন—'আমার স্ত্রী কাজ কর্‌বে?'—[illegible] অভিমানে আঘাত লাগে। নারী তাঁদের কাছে [illegible] মায়া [illegible] আর [illegible] না। আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়ে, পুরু[illegible]শেষে ঐ ক[illegible]খুব ভাল ক'রেই বোঝে।

স্বর্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—মায়া, তোর এ কথাগুলো কি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে না? আজ যে তুই একা পথ দিয়ে চলে ফিরে বেড়াস্, তার মধ্যে শিক্ষিত সমাজের কি কোন হাত নেই বল্‌তে চাস্?

মায়া। হাঁ মা। এতে শিক্ষিত সমাজের কোন হাত নেই।—আমি চলে ফিরে বেড়াই, কিন্তু তুমি কি দাও? হাজারবার ভাব নাকি এতে আমার মর্য্যাদার হানি হ'ল? তুমি ভাব, শিক্ষা পেলে তবে মেয়েরা বেরুতে পারে, কিন্তু এটা তোমার ভুল ধারণা মা।—আচ্ছা আমি ত তোমাদের শিক্ষিত সমাজের মেয়ে,—বল কোন্ পথটা তোমরা আমার জন্যে খোলা রেখেছ?

স্বর্ণ। বলিস্ কি মায়া, তুই যে অবাক্ কর্‌লি! তুই বল্‌তে চাস্—সেকালের মেয়েরা যে অসুবিধা ভোগ কর্‌ত আজও আমরা তাই কর্‌ছি?

মায়া। তার চেয়ে বেশী মা। তখন মেয়েরা বুঝ্‌ত, তাদের পক্ষে কোন পুরুষ মানুষের মুখের দিকে তাকান পাপ, বাইরে বেরোন পাপ, লেখাপড়া শেখা পাপ। এটা তারা বিনা-বিচারে মেনে নিয়েছিল; তার কারণ, তাদের কানে ঐ-সব মন্ত্র দেওয়া হ'ত, আর আজ তোমরা আমাদের সে-সব ধারণা কেড়ে নিয়েছ—অথচ কোন উপায় রাখ নি!

স্বর্ণ। তার মানে?

মায়া। মানে—তোমরা ভাব এতে অন্যায় হবে।

স্বর্ণ। কি কর্‌তে চাও?

মায়া। তা কি ক'রে বল্‌ব? একটা [illegible]?—সব [illegible] চাই। জীবনটাকে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা না [illegible] ত দিয়ে [illegible] [illegible] ভিতর দিয়ে দিন-রাত ছুটে বেড়াতে চাই—[illegible]

সুবর্ণ। মায়া, তুই কি পাগলের মত বক্‌ছিস্ ?

মায়া হাসিয়া বলিল—তাই যদি আমার কথা থেকে প্রমাণ হয়, তাহ'লে আমার কথা না বলাই ভাল—আচ্ছা ছোটমামা, তোমার কি মনে হয়, আমি পাগল ?

নগেন্দ্র একবার মায়ার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু হাসিলেন ; তাহার পর পাইপে জোরে একটা টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—আমি ঠিক ধর্‌তে পার্‌ব না, কারণ ওটা যদি পাগলামীই হয় তাহ'লে ও-ছাড়া তোকে আমি চিন্‌তেই পার্‌ব না।

বিমল এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে মায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মায়া তাহার দিকে চাহিতেই বিমলের সমস্ত শরীর-মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

মায়া হাসিয়া বলিল—কি বিমল বাবু, আপনি মনে মনে সব লিখে নিচ্ছেন নাকি ? কিন্তু দোহাই আপনার, 'নারীর কথা' নাম দিয়ে ঐ যে-সব প্রবন্ধগুলো আপনাদের কাগজে ছেপে বার করেন তার মধ্যে আমায় টেনে আন্‌বেন না। আমি কারো কাছে কাঁদি না, কারুকে আঘাত দিতে চাই না, আমার যদি কিছু কর্‌বার ইচ্ছে হয় তা আমি যেমন ক'রে পারি নিজেই ক'রে নিই—নিঃশব্দে। খবরের কাগজের পাতায় কাঁদুনি গেয়ে আমাদের দেশের মানুষকে ঘুম পাড়াবার পক্ষপাতী আমি নই।

বিমল আহত হইয়া বলিল—এটা কিন্তু আপনি অবিচার কর্‌লেন, সবাই কি ঐ রকম ?—একজনও কি এমন মানুষ নেই যে—

মায়া। থাক্‌তে পারেন, কিন্তু লজ্জায় মরে যাই যখন দেখি, কোন মেয়ে, পুরুষের কাছে কাঁদ্‌ছে, পুরুষেরই অত্যাচারের উল্লেখ ক'রে !—

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ব'লে যাঁরা নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধটা প্রচার করেন, তাঁদেরই কাছে কাঁদতে হবে?

এই কথা কয়টি সকলকেই একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে একটা বই-এর পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন, নগেন্দ্র নির্ব্বাপিত পাইপটায় অল্প অল্প টান দিতেছেন, শ্রীশ মাটীর দিকে তাকাইয়া হাতের আঙ্গুলগুলি মুড়িয়া মুড়িয়া শব্দ করিতেছে, করুণার চোখের কোণে জলের বিন্দু দেখা দিয়াছে—কিন্তু সুবর্ণ আগুন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—মায়া তুই থাম্ বল্‌ছি—নইলে—

করুণা মায়ার কাছে উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তুই সব জিনিসকেই বড় বাড়িয়ে দেখিস্ মায়া—একটু ভেবে দেখ্, তোরা যাতে সুস্থ সবল মন নিয়ে বেড়ে উঠ্‌তে পারিস্ এমন কোন পথই কি রাখে নি সমাজ?

মায়া তাহার আরক্ত মুখখানি করুণার মুখের দিকে তুলিয়া তাঁহার আঁচলের এক প্রান্ত নিজের আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—গোটা দুই পথ দেখ্‌তে পাই ছোটমাসী, একটা হচ্ছে—'ইস্কুল মাষ্টারি,—আর একটা—বিয়ে—'

সুবর্ণ। তোর এই কথাগুলো মেয়ে-মানুষের স্বাভাবিক নম্রতা শ্লীলতাকে যে কত দূর ছাপিয়ে উঠেছে আজ তা জান্‌লাম, আর সব চেয়ে আমার কষ্ট হচ্ছে এই কথা মনে ক'রে যে, তুই আমারই মেয়ে!

মায়া। কিন্তু তুমি যেটাকে নারীত্ব বলে ভাব মা, আমি তাকে অন্য নাম দিয়েছি, কিন্তু তা বল্‌তে চাই না।

নগেন্দ্র পাইপটা টেবিলের উপর ঠুকিয়া বলিল—Thus far and no further—আর তর্ক চল্‌তেই পারে না—কিন্তু মায়া তোরই হার হ'ল।

মায়া। ইস্—কি প্রমাণ ?

নগেন্দ্র। তোর কথা। ব্যস্, আর তর্ক চল্‌তে পারে না। এখন বল ত কাল্কের menu-টা কি হবে ?

বীরেন্দ্রনাথ। বেঁচে থাক দাদা। উঃ, সেই তখন থেকে 'হত্যে' দিয়ে প'ড়ে আছি শুন্‌তে পাব বলে, কথা শুনে ত আর পেট ভরে না !—কি মায়া ? এখন যে একেবারে চুপ !—ডাল হবে কি ডালনা হবে, ঝোল হবে কি কালিয়া হবে—লাগ একবার কোমর বেঁধে দেখি—'

মায়া হাসিয়া সুবর্ণের পাশে বসিয়া আদর করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল—তুমি ঠিক ক'রে দাও মা—'

মায়ার কথায় সুবর্ণের অনেকখানি রাগ পড়িলেও অভিমান গেল না, তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের কি হবে-না-হবে তার মধ্যে নেই।

মায়া। কেন ? সে হবে না মা, তোমাকে বল্‌তেই হবে।

সুবর্ণ মুখখানি মায়ার দিক হইতে ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—না।

মায়া। তুমি এর মধ্যে তা'হলে থাক্‌বে না ?

সুবর্ণ। না।

মায়া। কেন ?

সুবর্ণ। তার ত কোন দরকার নেই। তোমরা যখন সব নেমন্তন্ন কর্‌তে পাঠাও আমার মত চেয়েছিলে কি ?

সুবর্ণের অভিমানের কারণ বুঝিয়া মায়া তাঁহার কোলে বসিয়া বলিল—আচ্ছা, আর এমন ভুল হবে না। ওটা আমারই দোষ হয়েছে তা মান্‌ছি। কিন্তু এতে যে তোমার কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে মা, তা জান্‌তাম না।

সুবর্ণ। আমার মত নেই। ব্যস্! নে ওঠ্, বিরক্ত করিস্ নি।

করুণা। কেন এতে অন্যায় কি দেখ্‌লে ?

সুবর্ণ। অন্যায় ত বল্‌ছি না—আমি যদি না চাই আমার মেয়ে ঐ-সব ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে, যাদের কোন পরিচয়ই জানি না —শুধু শ্রীশের সঙ্গে জেলে গিয়েছিল ছাড়া—'

এই কথার খোঁচা খাইয়া বিমল এবং শ্রীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শ্রীশ সুবর্ণের কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য মুখ তুলিতেই করুণা কোন কথা না কহিতে ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু মায়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে একবার শ্রীশ এবং বিমলের দিকে তাকাইল, তাহার পর চোখ বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল, এবং করুণার কাতর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—হাঁ, মা, তাঁরা কেউ সিভিলিয়ন বা ব্যারিষ্টার বা ঐ রকমের কিছু ন'ন যে, যদি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে ফেলি আমাকে তাঁদের কাছে লজ্জায় পড়্‌তে হবে। তবে এঁদের সঙ্গে মেশার দরুন যদি তোমরা আমাকে অনুপযুক্ত ভাব, আমাকে ছেড়ে দাও মা, আমি হাত জোড় ক'রে তোমাদের 'সভ্য সমাজ' থেকে বিদায় চাইছি।

ঘরের সবাই একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সুবর্ণও মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিবার সাহস পাইলেন না। মায়ার কথার সুরে মনে হইল যেন সহস্র সহস্র বৎসরের শৃঙ্খলিত নারী-হৃদয় মুক্ত আলো-বাতাসের স্পর্শ পাইবার জন্য নড়িয়া উঠিয়াছে !

শ্রীশ ফুলদানী হইতে একটা ফুল লইয়া ছিঁড়িতে লাগিল। বিমল একবার তাহার মুগ্ধ দুটি চোখ দিয়া মায়াকে দেখিয়া লইয়া বলিল—আমি এখন আসি।—প্রেসে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে—

করুণা। তাহ'লে কাল তুমি আস্‌ছ ত বিমল ?

কিন্তু বিমল এইমাত্র স্থবর্ণের কথাগুলি শুনিয়াছে, সেই কথার জ্বালা এখনও তাহার মনে মিলাইয়া যায় নাই, তাই একটু আপত্তি জানাইয়া বলিল—খুব লোভ হচ্ছে কিন্তু এত কাজ প'ড়ে রয়েছে যে—

মায়া। না, সে হবে না বিমল বাবু, আপনাকে আস্তেই হবে। না বল্তে পাবেন না। মেশোমশাই, আপনার সম্পাদক অবাধ্য হচ্ছেন, ওঁকে আস্তেই হবে বলে দিন্—কোন ওজর চল্বে না।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—ওহে বিমল, যত রকমের অপবাদ আছে তার মধ্যে পুরুষের কাছে 'Joy-killer'এর মত আর একটাও নেই।

দীপ্তি তাহার কালো কালো দুটি চোখ বিমলের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—কাল আপনি এলে বেশ হবে কিন্তু, আমার কতকগুলি বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, বিশেষত ঐ কল্যাণী—সেই যে, যার লেখার আপনি খুব প্রশংসা করেন—'

বিমল একবার ভয়ে ভয়ে স্থবর্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া সম্মতি জানাইল; তাহার পর সকলকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

বিমল বাহিরে যাইতেই স্থবর্ণ বলিলেন—তাহ'লে কাল এখানে একটা 'বারোয়ারি' বস্ছে বল?

শ্রীশ। বারোয়ারি মানে?

স্থবর্ণ। মানে যা তাই—'

শ্রীশ আরক্তমুখে বলিল—দেখুন মাসী-মা, আপনি কি ভাবেন বয়সে বড় হ'লে ছোটদের যা খুশী তাই বল্তে পারেন?

করুণা রাগিয়া বলিলেন—আঃ শ্রীশ, তোর কি আজ কোন কাজকর্ম নেই—যা এ-ঘর থেকে, বেরো—

শ্রীশ। না মা, আমি আজ ওঁর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া ক'রে নিতে চাই—তুমি বাধা দিও না। আমার বন্ধুদের দেখ্বার এবং

জান্‌বার পূর্ব্বে এমন সব কথা বল্‌বার ওঁর কি অধিকার আছে? উনি বল্‌লেন—তাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না—শুধু শ্রীশের সঙ্গে জেলে গিয়েছিল ছাড়া—'

সুবর্ণ। সত্যিই ত তাই—'

শ্রীশ। মা, এখনও সময় আছে, ওদের জানিয়ে আসি আমরা মত বদ্‌লেছি।

করুণা ব্যথিত হইয়া বলিলেন—দূর পাগ্‌লা! তার দরকার নেই। দিদির মত না থাকে, ওঁর ভাল না লাগে, তফাতে থাক্‌বেন। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাব্‌ছি শ্রীশ, আমিও ত মা। আমার ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে ভয় থাক্‌বে না? এই যে এতগুলি ছেলেকে আমার ঘরের মধ্যে আন্‌ব—যাদের সঙ্গে আমার মেয়েরা মিশ্‌তে চাইছে—এই মেশাটা এখানেই শেষ হবে না এটা নিশ্চয়ই, এ-থেকে কি দাঁড়াবে তার সম্বন্ধে কোন বিচার কর্‌ব না?—নিশ্চয়ই কর্‌ব। যতদিন আমি মা, তোরা আমার ছেলে-মেয়ে, ততদিন ও-ভাবনা আমি ভাব্‌বই।

মায়া বলিল—তা ভাব না, কিন্তু ঐ ভাবনার মধ্যে অশ্রদ্ধা থাক্‌বে কেন?

করুণা। এটাকে তুই অশ্রদ্ধা বল্‌তে পারিস্ না মায়া। মানুষ চিরকালই গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌তে চায়। কারণ আমি যেখানে থাক্‌ব, সেই জায়গাটার সমস্ত বিষয়ই আমার জানা চাই। এই জানা কথাটারই আর একটা নাম হচ্ছে 'গণ্ডী'। এর মধ্যে এখন যদি বাইরে থেকে এমন কিছু নিয়ে আসি, যাতে আমার এই চিরঅভ্যস্ত ঠাঁইটুকুর মধ্যে একটা বিপ্লব বা 'বদল' হবার সম্ভাবনা আছে, আমি তার সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ কর্‌ব না?

শ্রীশ। তাহ'লে আমায় আর একটা কথাও বুঝিয়ে দাও।

তোমরা যখন একটা চিরঅভ্যস্ত গণ্ডী ভেঙ্গে নিজেদের মনের মত ক'রে থাক্‌বার ঠাঁই গড়ে নিয়েছিলে, আর যার মধ্যে আজও রয়েছ, তাতে তোমরা যা আশা ক'রেছিলে 'পাব বলে,' তা পেয়েছ ?

করুণা একটু ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—ঠিক বল্‌তে পারি না শ্রীশ, কি আশা করেছিলাম—হয় ত আমরা কোন আশাই করি নি। কারণ ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে থেকেই আমি 'বোর্ডিং'-এ কাটিয়েছি। জগতের অবস্থাটা যে ঠিক কি ছিল তা জান্‌তে অনেক সময় লেগেছে—জান্‌বার সুযোগও পাই নি, কারণ 'বোর্ডিং' থেকে বেরিয়েই তোদের সংসারে এসে পড়্‌লাম। জগৎকে প্রথম দেখ্‌লাম—তোর যখন বয়েস তেইশ বছর।

—যখন স্কুলে পড়্‌তাম, মনে পড়ে আমাদের সঙ্গে কতকগুলি মেয়ে পড়্‌ত তারা ব্রাহ্ম নয়। তাদের আমরা বেশ অশ্রদ্ধার চোখেই দেখ্‌তাম—ওদের চাল-চলন আমাদের মত নয় বলে কত সময় হেসেছি—নিজেদের বড় মনে করেছি। আমরা স্বাধীনতাকে হাতের মধ্যেই পেয়েছি, তা কারো কাছেই চাইতে হয় নি, বা পেতে কোন কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয় নি। সে কষ্টগুলো সব আমার মা সয়ে গিয়েছেন, তার বিষয় শুধু গল্প শোনা ছাড়া বুঝ্‌তে বিশেষ কিছু চেষ্টা করি নি। যে অবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠেছি তাকেই সহজ বলে মনে হয়েছে।

শ্রীশ। এই রকম ভাবে সহজ হ'তে গিয়ে দেশের কাছ থেকে আমরা কি তফাৎ হয়ে যাই নি মা ? আমার মনে হয় এতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে।

করুণা। সে ক্ষতিকে বেড়ে উঠ্‌তে না দেবার অধিকার তোমাদের আছে। আমাদের দিন আমরা কাটিয়ে এসেছি শ্রীশ, এবার তোমাদের পথ তোমরা ক'রে নাও। শুধু এই কথাটি মনে

রেখো—তৃপ্তিকে বাইরে পাওয়া যায় না, সে আছে তোমার মনেই। 'ছোট'র মধ্যে থাক্‌লে যেমন মনটা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে, 'বড়'র মধ্যে থাক্‌লে তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পায়। কোন্ অবস্থা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, বলা বড় শক্ত।

শ্রীশ। সেই ভেবে কি চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব এক জায়গায় মা?—

করুণা। না, চল্‌বে। আমাদের ভয়-ভাবনা তোমাদের পথ আট্‌কাতে পার্‌বে না—

শ্রীশ। তুমি কি অমঙ্গল আশঙ্কা কর মা?

করুণা। অমঙ্গল নয় শ্রীশ, অশান্তি। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক্, আচ্ছা মায়া, এই সঙ্গে তোদের কমলা, কল্যাণী, শান্তা, উমা আর যদি কেউ থাকে তাদেরও বল্ না আস্‌তে, ওরা ত সব এক একটি 'স্বদেশিনী' বল্‌লেও হয়।

মায়া বলিল—বাঃ, সে ত আমরা ঠিক করেছি আগেই। ওরা সবাই আস্‌বে। 'ফোনে' জানিয়েছে।

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—মায়া 'মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি—' এ কিন্তু বড় সুবিধে ঠেক্‌ছে না ছোড়্-দি! এতগুলি মনসা দেবীর এক জায়গায় আবির্ভাবটা একটু উৎকণ্ঠার কারণ, বিশেষত যখন 'ধূণোর' গন্ধের সম্ভাবনা আছেই—'

মায়া প্রতিবাদ করিল—এ কিন্তু তোমার বড় অন্যায় ছোটমামা, আমরা বুঝি সব মনসা?

নগেন্দ্র। নিশ্চয়ই, সে-বিষয়ে ত আমার আর তিলমাত্রও সন্দেহ নেই—কিন্তু উপস্থিত আর একটি মনসা কখন যে অন্তর্ধান করেছেন তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!—দীপ্তিটা গেল কোথায়?

সকলের প্রথমে মনে পড়িল যে, দীপ্তি সেখানে নাই। করুণা বলিলেন—তর্ক হ'লেই ও আর টিক্‌তে পারে না, কখন্ পালিয়েছে।

নগেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—তর্কগুলো 'হজমিগুলি' হ'লেও এই দুপুর বেলা একটু 'গড়িয়ে' নিলে বিশেষ অন্যায় হবে কি? এবং সকলের আপত্তি না থাক্‌লে আমি উঠ্‌তে পারি কি?

সকলে বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া গেলে মায়া উপরে আসিয়া দেখিল দীপ্তি সকাল-বেলাকার সেই অসমাপ্ত বইখানি লইয়া পড়িতেছে। সে দীপ্তির পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল—কি রে, ব্যর্থ প্রেমের নাম্‌তা মুখস্থ কর্‌ছিস্ নাকি?

দীপ্তি বইখানি বন্ধ করিয়া মায়ার দিকে সজল দুটি চোখ তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, এর কি কোন উপায় হ'তে পারে না দিদি? এই যে এমন সুন্দর সুন্দর জীবনগুলি অশান্তির কালিতে ভরে ওঠে, এই যে লজ্জা, এর হাত থেকে বাঁচ্‌বার কি কোনই উপায় নেই?

মায়া। উপায় তোরই হাতে, কিন্তু যদি ভাল মেয়ে হ'তে চাস্ তাহ'লে নেই। তোর হাতে তুলে কেউ কিছু দেবে না। মারামারি ক'রে নিতে পারিস্—বাঁচ্‌বি, নইলে অমনি ক'রে মরে থাক্‌তে হবে।

দীপ্তি। আচ্ছা, আইরিসের কি করা উচিত ছিল তুমি মনে কর?

মায়া। ঐ অপমানিতের পাশে দাঁড়িয়ে বলা—এ অপমান আমারও অপমান, তোমাকে একা বইতে দেবো না।

দীপ্তি। তার পর?

মায়া। ঐ 'তারপর'কে জুজু ভেবেই ত মানুষ মরে দীপ্তি! তারপর ঐ বন্ধুর হাত ধরে জীবনের পথ দিয়ে চলে আসা উচিত ছিল। পুরুষ মানুষ একেবারে অসহায়—যতক্ষণ না নারী তাকে চলায়। পর নড়্‌বার ক্ষমতাই নেই। জর্জ্জ যখন বল্‌ল—বিদায়— তখন তার

ঐ কথার সুরের ভিতর দিয়ে কি অসহায় ভাবে সে আইরিস্‌কে ডেকেছিল!

মেয়েদের Martyr হবার স্বভাবতই একটা নেশা থাকে, একটু ধাক্কা পেলে অমনি ওরা নিজেদের জীবনের যা-কিছু সবই ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু কতক্ষণ পারে?—ঐ আইরিস্ আর একজনকে বিয়ে করল, কিন্তু এক মাসের মধ্যেই আবার জর্জ্জকে লিখছে—'

দীপ্তি। এটা কি উচিত?

মায়া। উচিত অনুচিত জানি না দীপ্তি, ওটা হচ্ছে ভ্রম-সংশোধন। অভাবকে কোন যুক্তি-তর্ক দিয়ে থামান যায় না। ফলে কি হ'ল?— ঐ চমৎকার ছেলেটার নির্ভীকতা, সততা, তেজস্বিতার ওপর ফুটে উঠল—ধূর্ত্ততা, নীচতা! দেখ্‌ত কি ক'রে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আস্‌ত! এই কাছে আস্‌বার কত নূতন নূতন উপায় তারা বার করত! ভালবাসার নাম দিয়ে যে স্বেচ্ছাচারিতাকে তারা প্রশ্রয় দিল, তাকে কোন যুক্তি দিয়ে 'স্বাস্থ্যকর' প্রমাণ করতে পারি না দীপ্তি—জীবনে যাকে সব চেয়ে বড় সত্য বলে জান্‌ল, তাকেই অবহেলা, অপমান, অস্বীকার ক'রে শুধু কতকগুলি মানুষের মন রাখ্‌বার জন্যে কিম্বা বিশেষ কতকগুলি অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এমন ক'রে প্রচণ্ড সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার ক'রে দিল!

—মানুষ যখন বলে—তোমায় ভালবাসি, তখন তার ঐ কথার মধ্যে দিয়ে আর এক নূতন জগতের সৃষ্টির আরম্ভ হ'য়ে যায়, এ-কথা কারো মনে থাকে না! ঐখানটা পড়ে দেখ একবার—ঐ [illegible] সাত পাতার নীচে যেখানে আইরিস্ তার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছে—Can it be George?—or he—? দীপ্তি, ভগবানের রাজ্যে এর চেয়ে আর একটা বড় শাস্তির কথা ভাব্‌তে পারিস্?

দীপ্তি চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল—মায়াও আর কোন কথা কহিল না।

—৫—

যে জমিটা একটু বেশী নীচু সেইখানেই সমস্ত জল আসিয়া জমা হয়। সুপ্রকাশের ঘরখানিরও ঐ-রকমের একটি গুণ ছিল—বাইরের মানুষকে টানিয়া আনিয়া ভিতরে জড় করে! কিন্তু ঘরখানির এই আশ্চর্য্য শক্তির প্রভাব সকলে প্রাণ-মন দিয়া অনুভব করিলেও ঠিক কারণটা বুঝিতে পারিত না।

নিজের ঘরে বসিয়া কিছু কাজ করিতেছে, হঠাৎ কাহারও মনে ঐ আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হইল, তাহার আর না যাইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। কেহ বাজার করিয়া ফিরিতেছে, তবু অফিসের 'বেলা' হইবার আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া একবার সুপ্রকাশের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারে না, ইহা ছাড়া অবসরের সময়গুলির কথা বলাই বাহুল্য। এইজন্য সকলের মনেই একটা কৌতুক-মিশান ভয় লাগিয়া থাকিত—ওর কাছে গেলে চট্ ক'রে ওঠা যায় না। এই আকর্ষণী শক্তির বিষয় জানিত শুধু সুপ্রকাশ নিজে। তাহার প্রকাণ্ড চায়ের পেয়ালাগুলির মধ্যেই এতগুলি মানুষের প্রাণ বাঁধা ছিল।—যে যখনই আসুক এক 'কাপ' হইবেই! সুপ্রকাশ নিজে বেশ সৌখীন মানুষ। ঘরখানি পরিপাটি করিয়া সাজান, বসিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়—সমস্ত সময়ই কোন-না-কোন ফুল তাহার টেবিলে থাকিবেই।

বই পড়িবার অপেক্ষা কিনিবার বাতিক তাহার অত্যন্ত বেশী ছিল। ঘরে ঢুকিলেই বড় বড় আল্‌মারিগুলি চোখে পড়ে।

দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে। তাহাও তাহার খুশী-মত। সে-সমস্ত ছবি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাদিতে ছাপা হয় এবং ইহা হইতে প্রতি মাসে তাহার যে কয়টি টাকা হাতে আসে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট, তাহাকে [illegible]বার তাহার কোনই আগ্রহ নাই।

মানুষকে লইয়া আনন্দ করিতে এবং আনন্দ করিবার সহস্র উপায় ও পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার মত আর কেহ নয়: এই জন্য সকলেই তাহাকে চাহিত।

বন্ধুদের বেদনায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে তাহার ক্লান্তি নাই। সবাই তাহার কাছে মন হাল্কা করিয়া বাঁচিত। এই জন্য সময় সময় ঠাট্টা করিয়া সুপ্রকাশ বলিত—আমি যেন মিউনিসিপালিটির 'কন্‌জারভেন্‌সি লরি'! ভুনিয়ার ময়লা বুকে নিয়ে বেড়াই।

স্বদেশী আন্দোলন লইয়া শ্রীশের সহিত তাহার পরিচয়। এত অল্প সময়ে পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর সহানুভূতির বন্ধন পড়িয়াছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা বহুকাল হইতে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষ[illegible]র দিকে দেখিলে কোথাও কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু [illegible]র অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—নিজেদের মত ইত্যাদির পার্থক্য যত [illegible]ই থাক, কোন দিন একজন আর একজনের উপর নিজের প্রভাব বি[illegible] করিতে চেষ্টা করে না। অথচ কাজের সময় দেখা গিয়াছে [illegible]ন আর একজনের পাশেই আছে।

শ্রীশ যখন খদ্দর ঘাড়ে করিয়া পথে পথে ফিরিত, সুপ্রকাশ আপত্তি করিত, কিন্তু তাহাকে একা ছাড়িয়া দিত না; এবং তাহার যে-কয়দিন জেল হইয়াছিল তাহা শ্রীশের পাশে থাকার জন্যই।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হইবে, সুপ্রকাশ ছবি-আঁকার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে এমন সময় বিকাশ, মুনি এবং জীবন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—কি গো হঠাৎ এমন রণবেশে যে ?

মুনি। রণে আহ্বান করলে কি আর চুপ ক'রে থাকা যায় ?—'

সে একখানি চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া সুপ্রকাশের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—আচ্ছা প্রকাশ, এর অর্থ কি ? আর আমিই একা নই, এরাও এক এক পরোয়ানা পেয়েছে !

সুপ্রকাশ। অর্থ হচ্ছে—অনর্থ !

জীবন। তার মানে ?

সুপ্রকাশ। মানে, মাছ ধর্‌বার সময় বঁড়্‌শীতে টোপ্‌ দেবার যে মানে তাই। নাকে কাঁটা আট্‌কে খেলাবে।

জীবন তাহার নাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—সে এ নাক নয়—কিন্তু তোমার ঠাট্টা রাখ, ব্যাপারটা কি বল।

সুপ্রকাশ। আমি অত ভাবি-টাবি না। আমিও ত একখানা চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তোদের মত মাথা ব্যথা করে না।

মুনি। তা না হয় তোমার মাথা একটু ভাল। আমাদের পচা মাথা যদি একটু বেশী ব্যথা করে—এখন কি করা উচিত বলে দাও।

সুপ্রকাশ। বুদ্ধিমানের কাজ—অর্থাৎ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন !

সকলে একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল—কখ্‌খন না—'

সুপ্রকাশ। তবে আর অত ভাব্‌বার কি আছে ?

বিকাশ। ভাব্‌বার থাক্‌বে না ? বল কি প্রকাশ ? এই ধর ন জীবনটা চেয়ারে বস্‌লেই পা দোলায়, মুনিটা নাক খোঁটে, আ: আমাকে ত চেনই ফিক্‌-ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেলি কারণে-অকারণে

চিরকাল মেসে একা-একা থেকে ঐ-রকম কত বদ্ অভ্যাস হয়েছে, এখন যদি সেখানে একসঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে ঐ-সমস্ত ক্রিয়া-কলাপগুলি কর্‌তে থাকি—তাহ'লে ?

সুপ্রকাশ। হাঁ, তা ভাব্‌বার কথা বটে, তবে যদি বল, তোমাদের চপেটাঘাতে বা চিম্‌টিঘাতে সচেতন ক'রে তুল্‌তে পারি।

মুনি। সত্যি, কিন্তু আমি ঐ ব্রাহ্ম বাড়ীগুলিকে ভয়ানক ভয় করি, ওদের চার পাশ এমন ঘসা-মাজা যে, সর্ব্বদাই যেন কেমন তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তে হয়। একবার মিঃ চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে গিয়ে ওঃ সে কি বিপদেই পড়েছিলাম! ড্রইং রুমে সকলে জটলা ক'রে বসেছিলেন, সেইখানে আমার ডাক পড়্‌ল! দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়্‌ল আমার জুতোর ওপর—অমনি ফস ক'রে খুলে ফেলে ভিতরে গিয়ে পড়েছি! ইস্!—সে কি সকলের চোখ টেপাটেপি ক'রে হাসি! চ্যাটার্জি বল্‌লেন—এখানে মেয়েরা রয়েছেন, জুতোটা পায়ে দিয়ে আসুন। মাইরি বল্‌ছি আমার কান্না পাচ্ছিল।

বিকাশ। আচ্ছা ধর্ যদি কাল আমার ভয়ানক মাথা ধরে বা পেট কামড়ায়, আমায় রেহাই দিবি ?

জীবন। কখন না। যমের বাড়ী গেলেও টেনে নিয়ে আস্‌ব।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা; এক কাজ কর্ না কেন? তোরা সবাই আমাকে যা কর্‌তে দেখ্‌বি তাই কর্‌বি। আমি উঠ্‌লে উঠ্‌বি, বস্‌লে বস্‌বি, হাঁচ্‌লে হাঁচ্‌বি—

মুনি। ও বাবা, তা পার্‌ব না, তার চেয়ে নিজের মৎলবে মর্‌ব।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা, তোদের এত ভয়ের কারণটা কি ?

মুনি। চিঠিটা প'ড়ে দেখ না।

সুপ্রকাশ। দেখেছি ত—শ্রীশ লিখ্‌ছে—মায়া আর দীপ্তি আমার মত দু'একটি 'জেল্‌বার্ড'দের খাওয়াতে চায়, এতে ভয়ের কি আছে?—খাবি রে—খাবি। নেমন্তন্ন!

জীবন। সে ত জানি। কিন্তু মানুষের কাছে গেলেই কথা বল্‌তে হয়—কি বল্‌ব?

সুপ্রকাশ। এরই জন্যে এত ভাবনা?—তা এক কাজ কর্—আমার শেল্‌ফ্ থেকে 'Moral Discourse of Epictetus'খানা নিয়ে খানিক মুখস্থ ক'রে যা। ঘরে ঢুকেই আওড়াতে থাক্‌বি—সবাই ধন্য ধন্য কর্‌বে।

সুপ্রকাশের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমন সময় ভৃত্য একটা প্রকাণ্ড ট্রে-তে করিয়া চা ও সিঙাড়া লইয়া উপস্থিত!

জীবন হাত জোড় করিয়া অভিনয়ের সুরে ভৃত্যকে বলিল—হরি বাপ্, তুই কি আমাদের হৃদয়ের গোপন কন্দরে লুক্কায়িত অতি সূক্ষ্ম ঐ বাসনার কথাও জানিস্?—ওরে বিকাশ—অ সুপ্রকাশ, আরে দেখ্ দেখ্, হরি কি এনেছে—'

সুপ্রকাশ একটা সিঙাড়া খাইতে খাইতে বলিল—আচ্ছা মুনি, ব্রাহ্ম সম্বন্ধে তোর কি মত?

মুনি বলিল—ব্রাহ্মরা হিন্দু হ'তে পারে কিন্তু বাঙালী নয়।

বিকাশ তখন সবে একটু চা মুখে দিয়াছে; মুনির কথায় হাসির চোটে তাহার 'বিষম' লাগিল। মুনি বলিল—তা তোমরা হাস্‌তে পার কিন্তু ওটা আমি সত্যি ভেবেই বল্‌ছি। আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সহজ সম্বন্ধটা বজায় নেই। কিন্তু কোথায় যে মেলে না, তা তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। খুব সহজে ওদের অন্যদেশীয় বলে মনে ক'রে নিতে পারি, যদিও ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে, তা বাঙলা বল্‌তে আমি বাধ্য। খদ্দর প'রে, তোমার

আমার পাশে দাঁড়িয়েও দেখ্‌বে ওরা যেন হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষ।

সুপ্রকাশ। অর্থাৎ কোন মতে ওদের বিদেশী বলে বাজারে প্রমাণ ক'রে বাঙলার ঐতিহাসিক-মণ্ডলীর কাছ থেকে নাম কিন্‌তে চাও ত?

মুনি। ধ্যেৎ পাগ্‌লা। আমি তা বল্‌তে চাই না। এই দেখ না শ্রীশকে, ও ত সমানে আমাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কাটাচ্ছে, এক কাজ এক ভাবনা নিয়ে, তবু দাঁড়াও ত দেখি ওর পাশে—ঐ রুক্ষ অস্থিচর্ম্মসার মানুষটার পাশে তোমাদের রমণীরঞ্জন চেহারা-গুলোর চেক্‌নাই দেখ্‌বে আর থাক্‌বে না। আমাদের মত হাজার মানুষের ভিড়ের ভিতর থেকে ওর স্বাতন্ত্র্য এবং পার্থক্য বুঝে নিতে কারো বেশী সময় লাগ্‌বে না।

সুপ্রকাশ। ঠিক যেন কাশীর চিনির পাশে দোবরা চিনির মত?

মুনি হাসিয়া বলিল—হাঁ তাই বটে।

সুপ্রকাশ। কিম্বা যেন আমরা 'অন্ধকারের কম্বল' মুড়ি দিয়ে সব ভিড় ক'রে বসে আছি, আর ও-যেন আলোর জোয়ারে 'গা-ভাসান্‌' দিয়ে তর্‌ তর্‌ ক'রে ভেসে চলেছে, না?

মুনি। তাও হ'তে পারে।—মোটের ওপর, 'তুমি আমি' এক হ'তে পারি কিন্তু 'ও আমি' এক নই। আমরা চলেছি সহস্র বছরের তাগা-তাবিজ, নিষেধ-বিধানের বোঝা বয়ে, আর ও-যেন ছেঁড়া কাপড়ের মত পথের এক পাশে সে-সব ঠেলে সরিয়ে রেখে উচ্ছৃঙ্খল স্রোতটির মত বয়ে চলেছে! দেখিস্‌ নি, ও-যখন পথ চলে, মনে হয় যেন উনপঞ্চাশ বায়ু ওকে ঠেলে নিয়ে যায়!—ওর সঙ্গে পা ফেলে চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মায়া গভীর স্নেহে একবার শ্রীশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—চল তুমি শোবে, আমি তোমার মশারি ফেলে দিয়ে আসি।

শ্রীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না লক্ষ্মীটি, থাক্, আমি এখন লিখ্‌ব, ঘুম পায় নি—

মায়া। আচ্ছা সে আমি দেখে নিচ্ছি।

শ্রীশকে ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া মায়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। শ্রীশ আর কোন আপত্তি করিল না, আপত্তি করিবার তাহার শক্তিও ছিল না। এই সেবাটুকু পাইয়া তাহার চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানে না!

ঘরে আনিয়া শোয়াইবার পর মিনিট পনেরোর মধ্যে শ্রীশকে ঘুম পাড়াইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মায়া তাহার হাতদুটি বুকের উপর চাপিয়া বলিয়া উঠিল—এমনি করেই কা'কে যেন ঘুম-পাড়াতে চাই কিন্তু আর বেরিয়ে আস্‌তে চাই না। তারই বিছানার একপাশে—

নিজেরই মুখের কথা শুনিয়া লজ্জায় মায়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অতি সন্তর্পণে উপরে আসিয়া দীপ্তির পাশে শুইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। এই অবস্থায় বিছানায় বেশীক্ষণ থাকা একেবারে অসম্ভব, বিশেষত আর একজন যখন তাহার পাশে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আকাশের তারাগুলি যেন কে ঘসিয়া মুছিয়া দিয়াছে! চারিধার নিস্তব্ধ! পৃথিবী যেন কিসের আশঙ্কায় নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছে! সুখ-সুপ্ত দীপ্তির দিকে চাহিয়া কেমন একটা শ্রান্ত হাসি

মায়ার মুখে দেখা দিল। সে জানালার বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া বলিল—সবাই ঘুমিয়েছে, সকলের চেয়ে যে অশান্ত সে-ও এখন জেগে নেই—আমার পোড়া চোখে আজ কি হল কে জানে!

ভিজা মাটির গন্ধ-মাখা বাতাস আসিয়া মায়ার উত্তপ্ত কপাল স্পর্শ করিয়া তাহার সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া দিল। তাহার পরই জোরে বর্ষণ নামিল!

মায়া জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া একখানি সোফায় বসিয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—এমন আশ্চর্য্য বর্ষণ সে যেন আর কখনো দেখে নাই! অবিশ্রান্ত ভাবে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু বিদ্যুৎ বা বজ্রের শব্দ কিছুই নাই! এ যেন কাহার নিঃশব্দ ক্রন্দনের মত! আপনার গোপন আবেগে আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে, সবার অলক্ষ্যে! . . .

ক্রমে মায়ার শ্রান্ত চোঁখদুটি তন্দ্রায় মুদিয়া আসিল, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া আসিল। জলপড়ার শব্দ ঘুমপাড়ানি গানের মত ধীরে—অতি ধীরে তাহার কানে মিলাইয়া গেল, সে-ও ঘুমাইয়া পড়িল।

—৭—

তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। মায়া ও দীপ্তিকে তখনও নীচে নামিতে না দেখিয়া করুণা উপরে আসিয়া দেখিলেন, মায়া সোফায় শুইয়া আছে এবং দীপ্তি তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

করুণা জিজ্ঞাসা করিলেন—ও যে এখনও ঘুমচ্ছে দীপ্তি?

দীপ্তি বলিল—কি জানি মা, কাল রাত্রে বোধ হয় ও এইখানেই শুয়ে কাটিয়েছে!

তাহাদের কথার শব্দে মায়া জাগিয়া উঠিল। করুণা বলিল—এমন তুই এখানে শুয়ে যে মায়া?

মায়া হাসিয়া বলিল—জানই ত ছোটমাসী, ঘুমুলে আমি একেবারে যেন মরে যাই। এখানে একটু বসেছিলাম, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না—অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখ্‌ছি!

করুণা। রাতে ভাল ঘুম হয় নি নিশ্চয়ই?

মায়া। ঠিক তা নয়, তবে একটু দেরীতে ঘুমিয়েছি! দীপ্তি, তুই আবার বস্‌লি যে?

দীপ্তি। বাঃ, নিজের ওঠ্‌বার নাম নেই, আবার আমায় বকা হচ্ছে! আমি ত কোন্ কালে উঠেছি।

মায়া। তা ডাক্‌তে কি হয়েছিল?

দীপ্তি। আমি দেখ্‌লাম তুই বিছানায় শুস্ নি, এখানে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছিস্—

মায়া। আচ্ছা-আচ্ছা থাম্, তোকে আর ব্যাখ্যা কর্‌তে হবে না।

করুণা। নে তোরা চট্-পট্, ওদিকে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

করুণা নীচে নামিয়া যাইতেই মায়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান ধরিল—

'তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে
এল—এল—এল গো!
বা বুকের আঁচলখানি—
পা I beg your pardon miss—
সুখের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
মারা আঙ্গিনাতে মেল গো—'

করিতেছিল, কিন্তু শেষে তাহারও হাসিতে হাসিতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, এবং আপনার বর্ণনার মাধুর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া সুবর্ণও হাসিয়া ফেলিলেন।

মায়া অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া বলিল—আমি তোমায় কাগজ পেন্সিল এনে দিচ্ছি মা, তুমি লেখ, চমৎকার হবে!

বেয়ারা আসিয়া বীরেন্দ্রনাথকে খবর দিল—মুকুলবাবু আসিয়াছেন।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—তাঁকে বস্‌তে বল, আমি আস্‌ছি; আর করুণা, কিছু চায়ের জোগাড় কর।

করুণা। কে উনি? আগে ত ওঁর নাম শুনি নি?

বীরেন্দ্র। আমিও খুব অল্পদিন হল ওঁকে চিনেছি, খুব ভাল Sculptor, ওঁর studio-তে দ্বিজেশ আর বিমলার দুটো Plaster bust আছে, চমৎকার করেছেন, বিশেষত বিমলারটা!—ওঁকে একদিন আমাদের এখানে আস্‌তে বলেছিলাম। চা-টা হয়ে গেলে পাঠিয়ে দিয়ে যদি পার ও-ঘরে একবার এসো! আর শ্রীশ, উনি সেদিন বল্‌ছিলেন তোমায় চেনেন, মুকুল দেব।

শ্রীশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমাকে? কিন্তু আমার ত মনে হচ্ছে না!

বীরেন্দ্র। যদি পরিচয় না থাকে করে নিও। বিমল এঁর একজন খুব গোঁড়া ভক্ত।

বীরেন্দ্র চলিয়া যাইতেই মায়া ও দীপ্তি শ্রীশের সঙ্গে তাহার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কিছু জান না এঁর কথা?

শ্রীশ। না, কিছু মনে পড়্‌ছে না। মুকুল দেব! নামটাও কখন শুনি নি—

মায়া। তবে উনি তোমায় চিন্‌লেন কি ক'রে?

শ্রীশ। তাই ত ভাবছি, বোধ হয় জেলে গিয়ে জগৎ-বিখ্যাত হয়ে গেছি।

মায়া। কেউ গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে নি?

শ্রীশ। না। তবে একদিন 'পিকেটিং' কর্‌বার সময় একজন আমাদের বয়েসী লোক আমায় বলেছিল—'দুধের ফেনাটা না সর্‌লে জলো কি খাঁটি বোঝা একটু শক্ত।'

আমার উত্তেজনার মুখে ঐ কথাগুলি খুব ভাল লাগে নি, তাকে বলেছিলাম—আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করেছে ত ঐ পরিণামদর্শিতা! উৎসাহ,উত্তেজনা—এগুলোকে অশ্রদ্ধা করেই ত আমাদের কাজ এগোয় না।

মায়া। তিনি কি বল্‌লেন?

শ্রীশ। সে বল্‌ল—'উৎসাহ থাক, কিন্তু উত্তেজনাকে বাদ দিলে বোধ হয় কোনই অসুবিধে হবে না কাজের—' কি পাগল! It's the heat that boils water—উত্তেজনাটাই যে সব সফলতার মূল, তা এই হঠাৎ-দার্শনিকেরা বুঝ্‌তে পারে না, বা চায় না।

মায়া। কিন্তু শ্রীশ-দা, আমার মনে হয় উত্তেজনা মানে তিনি শুধু ফেনা, শুধু উচ্ছ্বাসটাকেই মনে করেছেন, আর আমার কেমন মনে হচ্ছে যে ইনিই তিনি—

শ্রীশ। তা যদি হয়, ওকে আজ flat করব।

মায়া। কিন্তু তোমার মুখে ঐ দুটো কথা শুনেই মনে হচ্ছে flat করা একটু শক্ত হবে।

শ্রীশ। তাহলে লাভটা হবে আমারই, ওকে আর ফিরে যেতে হবে না।

মায়া। তুমি বুঝি এমনি ক'রে বন্ধু জোগাড় কর, যে তোমাকে হারাতে পারে তার সঙ্গেই তোমার ভাব?

শ্রীশ। নিশ্চয়ই। তাকে নিয়েই ও কাজ কর্‌বার স্ুবিধে বেশী—কিন্তু তোরা আজ কি পর্‌বি বল্‌ত?

মায়া। কেন ম্যান্‌চেষ্টারের তৈরী খদ্দর আছে, সে তোমার তাঁতে-বোনা খদ্দরের চেয়ে ঢের ঢের ভাল। তোমাদের ত খদ্দর নয়, যেন খেরো—কোন্ দিন দেখা যাবে, ঐ সব প'রে, আমরা সবাই আর ওপরের দিকে না বেড়ে কেবল আয়তনে চাকার মত বেড়ে চলেছি—

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—কেন এত কষ্ট সহ্য কর্‌বার ত কোন দরকার নেই। ঢাকাই মস্‌লিন ইচ্ছে কর্‌লেই প'রতে পার।

মায়া। না, তা ত নয়, খাওয়াটা আমাদের নিজের ইচ্ছে মত হ'তে পারে কিন্তু 'পরা' সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন।

দীপ্তি। কেন?

মায়া। কেন? প্রমাণ চাও? যখন খেতে ব'স তখন ভাল বা মন্দ লাগার expression-টা কি তোমার মুখের ওপর ফুটে ওঠে না?—চোখ বুজে খাও, চপ্-চপ্ শব্দ ক'রে খাও, চেটে-চেটে খাও, নাক শিঁট্‌কে খাও, তোয়াজ ক'রে খাও,—এই খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যখন তুমি ব্যস্ত তখন আর কারো কথা কি তোমার মনে থাকে? এমন কি খাবার সময় তোমার মুখ দিয়ে যে 'লাবনি' গড়িয়ে পড়ে তার কথাও মনে থাকে না! কিন্তু যখন পোষাক পর তখন সাম্‌নে পিছনে আর্‌সি দিয়ে দেখ কেন, কোথায় কোন fold-টা ঠিক পড়্‌ল না, চুলের কোন্ খানটা একটু টিপে বা ফুলিয়ে দিলে ভাল লাগ্‌বে। তোমার তখনকার চোখ দুটো হয় যেন আর একজনের চোখ, নিজেকে যেন আর একজনের চোখ দিয়ে দেখে যাচাই ক'রে নিয়ে তবে সকলের সামনে বার হও—আর শুন্‌তে চাও কিছু?

দীপ্তি গলায় আঁচল দিয়া বলিল—না গুরুমশাই, ঢের হয়েছে!

শ্রীশ। এ 'ডিক্রি'টা কিন্তু একতরফা হ'ল মায়া।

মায়া। কখনই না—তোমার মাথার ঐ লম্বা রুক্ষ চুলের কি কোনই উদ্দেশ্য নেই?

শ্রীশ। নিশ্চয়ই আছে, তবে তোমাদের toilet-এর থেকে ওর কাজটা একটু আলাদা। ওদের বড় একটা বদল দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু তোমাদের চুলের দিনে যদি অন্তত পঁচিশবার ফটো নেওয়া যায় তাহলে—

মায়া। তাহলে প্রতিবারই আলাদা আলাদা ছবি উঠ্‌বে, এই ত? কিন্তু এই নিয়ে যদি বিদ্রূপ কর্‌তে চাও শ্রীশ-দা, তাহলে বলব ছেলেরা সব অকৃতজ্ঞ।

ঝগড়াটা ঐ-খানেই থামিয়া গেল। বেয়ারা আসিয়া শ্রীশকে বলিল—সাহেব ডাক্‌ছেন—

করুণা তখন ছোট একটি টিপয়ের উপর চা ইত্যাদি রাখিয়া মুকুলকে খাওয়াইতেছেন এবং করুণার অনুরোধের সঙ্গে বীরেন্দ্রও তাঁহাকে বলিতেছেন—আপনাদের বয়েসে আমরা যে কি কর্‌তাম তা যদি সম্ভব হত, দেখাতাম।

মুকুল। দেখানটা অসম্ভব হতে পারে কিন্তু শুন্‌তে ত পারি।

বীরেন্দ্র। গল্প ক'রে বল্‌বার মত নয় সে-সব, কেন-না তার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নেই—এই ধরুন না, দশ সের মাংস চন্দ্রকুমার, নগেন আর আমি এই তিন জনে শেষ করেছি, অন্য সমস্ত খাবারের সঙ্গে, আর তাতে কোনই অসুখ হয় নি! সাড়ে-বারোগণ্ডা মুণ্ডী সন্দেশ আর আড়াই সের দই, আমাদের সময়ে যে-সে খেত আর আজও চেষ্টা কর্‌লে যে একহাত লড়্‌তে পারি না তা বল্‌তে পারি না।

মুকুল। তাহলে আমরা যে আধ্‌-মণ কেলেসের গল্প শুনেছি সেটার মধ্যে সত্যি যথেষ্ট আছে দেখ্‌ছি।

বীরেন্দ্র একবার করুণার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই আছে—তবে আমি একটু out of practice হয়ে পড়েছি, তেমন সুবিধে আর পাই কই ?

করুণা সকৌতুক বিরক্তির সুরে বলিলেন—তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই! কবে তুমি খেতে পাও নি ?

বীরেন্দ্র বলিলেন—তা নয়, আমার পরিচয়টা মুকুলবাবুকে দিয়ে রাখ্‌ছি যদি কোন দিন ভুল ক'রে আমায় চা'য়ে বা ফলারে বা অন্য কিছুতে ডেকে ফেলেন তখন না মুস্কিলে পড়েন। তবে আমি যতই বড়াই করি, চন্দ্রকুমার আমার 'দাদা'। সে ছিল গেরস্থ-ফেল-করা ছেলে। অ মুকুলবাবু, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে ?

মুকুল। তা যাক্‌ না, সাম্‌নেই যখন কেট্‌লি রয়েছে, তখন আর ভয় কি ? আপনি ঐ কথাটাও বলুন।

বীরেন্দ্র। হাঁ বল্‌ছি। ওকে কোন ঠাট্টার সম্পর্কীয় মানুষ একবার নেমতন্ন করেছিলেন তাঁদের দেশের বাড়ীতে। চন্দ্রকুমার ত খেতে বস্‌ল। কে একজন অপরাধের মধ্যে বলে ফেলেছিল, কল্‌কাতার বাবুর খাওয়া দেখ! ব্যস্‌ আর যায় কোথায় ? যা আসে তাই নেই! কল্‌কাতার বাবু পাড়াগেঁয়ে ভূতদের ভয় খাইয়ে দিল! সে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ! বাড়ীর ভিতর মেয়েরা কপালে হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন 'যেই জন যায় সেই আসে না ফিরে—' সন্দেশ রসগোল্লার হাঁড়ি সব সাবাড় !' and Chandrakumar wants more !—শেষে সেই বাড়ীর যিনি দিদি-মা তিনি কর্‌লেন কি,—ধাঁ ক'রে খুব খানিকটা লঙ্কা

ফোড়ন্ অল্প তেলে ছেড়ে দিয়ে কড়াটাকে চন্দ্রকুমারের পিছনের এক জানালায় রেখে সরে গেলেন।

মুকুলের হাসির সঙ্গে তাহার চোখের জল বাহির হইয়া আসিল। এই সময়ে শ্রীশ ঘরে আসিল। বীরেন্দ্র বলিলেন—আর ঐ দেখুন না শ্রীশকে—ওকে দেখ্‌লেই মনে হবে যেন 'রকিফেলার দি সেকেণ্ড!'

শ্রীশের দিকে তাকাইয়া মুকুল বলিল—নমস্কার শ্রীশবাবু! কিন্তু বোধ হয় আমার পরিচয় আর আপনাকে দিতে হবে না!

শ্রীশ তাহার পাশে বসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই না, আপনার সঙ্গে ত একদিন প্রায় দাঙ্গা হবার জোগাড় হয়েছিল!

মুকুল। আপনার কাজ আশা করি ভালই চল্‌ছে?

শ্রীশ মুখটিকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল—আশাটা আমরাও করি, কিন্তু—হচ্ছে না, কিন্তু কেন যে, তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না!

মুকুল। কারণ ভণ্ডামি, আর চুরি—'

শ্রীশকে কে যেন চাবুক মারিল। সে প্রাণপণে আপনার মনের বিদ্রোহী ভাবটাকে চাপিয়া বলিল—remark-গুলো একটু সংযত হলে ভাল হয় না কি, মুকুলবাবু?

মুকুল। আমার পক্ষে সম্ভব নয় শ্রীশবাবু, কারণ আমি জান্‌তে পেরেছি ভুলটা কোথায়। আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ এই খানেই।

মুকুলের আরক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া শ্রীশের মন নরম হইয়া আসিল। বলিল—আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল না হলেও ক্ষতিটাকে অস্বীকার করি না—যে-জন্যই হোক আমাদের কাজ এগোচ্ছে না। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই কি?

মুকুল। না।

শ্রীশ। কি আশ্চর্য্য! আপনি জোর না দিয়ে কি কোন কথাই কইতে জানেন না?

মুকুল টিপয়টাকে একটু সাম্‌নের দিকে সরাইয়া রাখিয়া বলিল— জানি, কিন্তু এ অবস্থায় বলাটা দরকার মনে করি না।

শ্রীশ। কিন্তু 'না' কথাটা আপনি এমন ভাবে বল্‌লেন যেন কাজ চালাবার কোনই উপায় আমাদের নেই!

মুকুল। নেই-ই ত! আমাদের দেশের মানুষ ভণ্ডামি ছাড়্‌তে পার্‌বে কি? আমাদের দেশের মানুষ হুজুক ছাড়া, গুরু ছাড়া পার্‌বে কি চল্‌তে কোন দিন? যখন আপনি জেলে যান, তখন আমাদের দেশের যে ব্যাপার দেখে গিয়েছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে তাই কি দেখ্‌ছেন?

শ্রীশ চুপ্ করিয়া রহিল। মুকুল বলিল—এ ক'দিনেই এত বদল হয়েছে, তারপর আপনার অন্য বন্ধুরা যখন ফির্‌বেন, তাঁরা তাঁদের জেলে যাবার 'কারণ'ও হয় ত ঠিক খুঁজে পাবেন না; আর বল্‌বেন— What a blinking idiot I was!

বীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু মুকুলবাবু, বেচারি চা'টা যে জুড়িয়ে গেল! আর ও টোষ্ট্‌খানা—'

মুকুল লজ্জিত হইয়া বলিল—আমায় মাপ কর্‌বেন শ্রীশবাবু, আর আশা করি এই কথাটা মনে রাখ্‌বেন, আমি আমার দেশকে কম শ্রদ্ধা করি না।

শ্রীশ। ও-সব কিছু ভাব্‌বেন না মুকুলবাবু, কিন্তু আজই আমাদের ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে চাই না। আমার বিশ্বাস, ভাবের চেয়ে ঝগড়াটা পরস্পরকে কাছে টেনে রাখার পক্ষে সাহায্য করে বেশী।

মুকুল। আর ঝগড়াটা ভাবের চেয়ে বেশী sincerely-ই করা যায়।

করুণা বলিলেন—আপনাকে মধ্যে মধ্যে আমাদের এখানে পেলে খুব সুখী হব। আপনার সময় থাক্‌লে—

কথা বলিতে বলিতে মুকুলের মুখে একটু ম্লান হাসির রেখা দেখিয়া করুণা থামিয়া গেলেন। তাহার সেই হাসির মধ্যে এমন একটি বেদনা এবং অসহায় অবস্থার আভাষ পাইলেন যে, এক মুহূর্ত্তে মুকুলের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি তাঁহার মনে জমা হইয়া উঠিল।

মুকুল বলিল—সময় আমার যথেষ্টই আছে—না থাক্‌লেও চুরি কর্‌তে পারি, তাতে আমি ভয় পাই না; কিন্তু একটা কথা আছে জানেন ত?—কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই!—এটা আমার পক্ষে খুব খাটে। তা ছাড়া আমার নিজের ধারণা হচ্ছে—কাঙালের দৃষ্টিটা শনির দৃষ্টি।

বীরেন্দ্র ও করুণা মুগ্ধ হইয়া মুকুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীশ এবং মুকুল পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের শারীরিক সাদৃশ্য। কেবল শ্রীশের অপেক্ষা মুকুলকে একটু বেশী শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে হয়। সে যেন আজীবন পৃথিবীর ঝড়-ঝাপ্‌টা মাথায় করিয়া জীবনের পথ চলিয়া আসিতেছে, কোথাও বিশ্রাম বা শান্তি পায় নাই! চোখের জ্বালা-ভরা নিষ্ঠুর চাহনিটি নিরাশার শুষ্কতায় যেন তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে। অনবরত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ঠোঁটের কোণ যেমন চাপা হইয়া যায়—সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে যেমন একটা অবজ্ঞার ভাব মুখে ফুটিয়া উঠে, মুকুলের মুখেও সেইরূপ একটি তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল।

মুকুল যখন শ্রীশ এবং করুণার সহিত কথা কহিতেছিল, তখন পাশের ঘর হইতে মায়া ও দীপ্তি চুপ্‌ করিয়া তাহাদের কথা

শুনিতেছিল। মুকুলের কথা শেষ হইতেই মায়া দীপ্তিকে বলিল—আমি যাই—

দীপ্তি অবাক্ হইয়া বলিল—কোথায় ?

মায়া। ওকে দেখ্‌তে।

দীপ্তি। সেকি ? সে কি ক'রে হবে ?

মায়া। দেখি কি ক'রে হয়,—কিন্তু হ'তেই হবে।

মায়া বসিবার ঘরে আসিয়া করুণাকে বলিল—ছোটমাসী, তোমার চাবির রিং-এ 'কর্ক-স্ক্রু' আছে ? দাও না—

মায়া চলিয়া যাইবার পর হইতে দীপ্তি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। মায়া আসিতেই সে বলিয়া উঠিল—দিদি—তুই—

দীপ্তির মুখে হাত চাপা দিয়া মায়া বলিল—চপ, ওপরে চ'।

কিন্তু উপরে আসিয়া মায়াকে জানালার ধারে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দীপ্তি অস্থির হইয়া বলিল—দিদি—

মায়া। বল্‌ছি বল্‌ছি, শুধু একটু আমায় হাঁফ্ ছাড়্‌তে দে দীপ্তি!

দীপ্তি। কিন্তু এদিকে যে আমি হাঁফিয়ে উঠ্‌ছি তা'র কি ?

মায়া জানালার দিকে পিছন করিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ দুটি চোখ দীপ্তির মুখের উপর রাখিয়া বলিল—দেখ, আমি একদিন রবীন্দ্রনাথকে সৌখীন কবি বলেই জান্‌তাম। ওঁর কবিতা বা গল্পের যে একটা মন মুগ্ধ করবার শক্তি আছে তা বিশ্বাস কর্‌তাম—স্বপ্নের জাল বুন্‌তে ওস্তাদ বলে—কল্পনার যাদুকর বলে, শব্দ-বিন্যাসে আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে কতজনের সঙ্গে কত তর্ক করেছি—কিন্তু আজ এইমাত্র পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমার জীবনে প্রথম মনে হল—তিনি সত্য কথাও

বলেন—তুই "ফাল্গুনী" পড়েছিস্? চন্দ্রহাস ছেলেটাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিস্? না বেসে ত উপায় নেই, কারণ তার কথায় মন ভুলে যায়! তাকে বোঝ্‌বার কথা, তাকে বিচার কর্‌বার কথা আর মনেই থাকে না।

দীপ্তি রাগিয়া মায়াকে ঝাঁকানি দিয়া বলিল—কিন্তু এর সঙ্গে মুকুলকে দেখার কি সম্বন্ধ আছে, কবিত্ব রাখ্—বল্ কেমন দেখ্‌লি?

মায়া। তাহলে তুই যাকে ভালবাসিস্ তার কথাতেই বলি—আমি ত তাকে চোখ দিয়ে দেখি নি, আমার প্রাণ দিয়ে দেখেছি—ব্যস্ আর একটি কথাও না—

দীপ্তি। দিদি, তোর পায়ে পড়ি ভাই, আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল্—

মায়া। বল্‌বার ত কিছুই নেই। মেসোমশাই পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার ক'রে আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন—সে কি মানুষের চোখ? কয়েক মুহূর্তের একটি চাউনি! কিন্তু কি সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্রূপ, নিরাশা, বেদনা, ক্ষুধিত তৃষিত, জ্বালা-ভরা সে চাউনি, দীপ্তি! তুই দেখিস্ নি ভাল করেছিস্, মনে হল আমার বুকের ভিতরের সমস্ত দীনতা হীনতা ঐ একটি চাউনির মধ্যে ধরা পড়ে গেল! আর তাঁর মুখে সে কি শ্রান্ত হাসি!

মায়া যখন কথা বলিতেছিল, দীপ্তি তাহার প্রকাণ্ড চোখ দুটি দিয়া মায়ার প্রত্যেকটি কথা যেন গিলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ মায়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল!

দীপ্তি কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—ও আবার কি ঢং! তোকে ভূতে পেল নাকি?

মায়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসির মধ্যেই ... ত লাগিল—fool—কি বোকা রে—কি বোকা! উঃ দীপ্তি!—

মায়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া পেট টিপিয়া হাসিতে লাগিল! দীপ্তি রাগিয়া বলিল—যাঃ, তোকে আর কক্‌খন বিশ্বাস করব না—তুই একটা পোড়ারমুখী—

দীপ্তি যত রাগে, মায়ার হাসিও তত বাড়িয়া যায়। শেষে দীপ্তি অভিমান করিয়া তাহার বিছানায় আসিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল! মায়া তাহাকে রাগাইবার জন্য সুর করিয়া বলিতে লাগিল—O! Mukul, Mukul my dear! how absurd you are!—Your ball-pointed nose, your swollen cheeks, your ever-smiling half-shut eyes—your thick lips and the teeth!—O my God—I think and think—how unconceivably ugly you are! উঃ—দীপ্তি, তুই কি ঠকাটাই ঠক্‌লি!—একবার দেখ্‌লি না তাকে কেমন দেখ্‌তে?—যতই ভাব্‌ছি ততই আমার—

দীপ্তি একটা বালিশ মায়ার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল—আড়ি, তোর সঙ্গে জন্মের আড়ি, বেরো আমার ঘর থেকে।—তাহার পরই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—তুই প্রথমে যে-রকম ভাবে আরম্ভ করেছিলি—

মায়া। সে-ভাবে শেষ কর্‌লে বাড়ী মাথায় কর্‌তিস ত? তার পরই আরম্ভ হত পাড়া মাথায় করা—তারপরই Mrs. D—'s ... her party—তা যখন হল না, উপস্থিত স্নানু-টানগুলো সেরে নিলে হয় না?

—৮—

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মুনি হাঁকিল—ঠাকুর, জীবনবাবুর ভাত বাড়ো।

ঘরের ভিতর হইতে জীবন বলিল—হঠাৎ জীবনবাবুর ওপর এতটা অনুগ্রহের কারণ?

মুনি। অনুগ্রহ নয়, পরোপকার—আমি আজই তোমার ঐ সাড়ে সাতসেরি bag-টার খবর ওঁদের দিতে চাই না। তা ছাড়া ভাল জিনিষ পেলে ওটা সাড়ে-আট বা নয়সেরি হতেও পারে, তার খবরটা আমার জানা আছে কিনা? তাই কিছু শাক-ডাঁটা দিয়ে 'hold'-টা ভরাট্ করে দেবার জন্যে কাল রাতেই ঠাকুরকে ফর্মাস করেছিলাম।

বিকাশ একখানা খবরের কাগজ লইয়া পড়িতেছিল, সে বলিল—তোমার অসীম দয়া মুনি, আর একটু যদি পরোপকার কর তাহলে আমি তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাক্‌ব—আর ঠিক একঘণ্টা পরেই আমার শরীর খারাপ হবে, তুমি যদি ওঁদের বলে দাও—বিকাশ আস্‌তে পার্‌লে না, এর জন্যে সে ভয়ানক দুঃখিত, তার খুব ইচ্ছে ছিল—

জীবন। আর যেহেতু আমার যাবার কোন দরকার নেই, কেন না আমার hold টা already ভর্ত্তি, তুমি যদি আমাদের দুজনের হয়ে বেশ বিনয় সহকারে তাঁদের ক্ষমা করতে বল—

মুনি। বেশ যা হোক! আমি কোথায় ভাব্‌ছিলাম তোমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিয়ে একটা জরুরি কাজে বেরুব—

জীবন। যাক্, তাহলে আজ প্রমাণ হয়ে গেল—Birds of the same feather flock together—এখন ভগ্ন-দূত কে হবে?

মুনি। কাজ কি ভাই, তার চেয়ে—'সবে মিলে করি কাজ
হারি-জিতি নাহি লাজ—'

বিকাশ। আচ্ছা কেন এত ভয় পাচ্ছে বল্‌তে পারিস্‌?

জীবন। ভয়? ছি ছি বিকাশ, এই সেদিনও আমরা না পথে পথে গান গেয়ে এলাম—'মানুষ আমরা, নহি ত মেষ'—কতখানি তেজ থাক্‌লে অমন নির্লজ্জের মত চীৎকার কর্‌তে পারে মানুষ তা জানিস্‌?

বিকাশ। তবে—'

মুনি। ঐ 'তবে'টাকেই ত আমিও ভাব্‌ছি কাল রাত থেকে, কিন্তু কোন কিছু স্থির কর্‌তে পারি নি!

জীবন। এখন যাবে কি, যাবে না?

মুনি। ও বাবা—যাব না! বলিস্‌ কি? ও সব ন্যাকামি চল্‌বে না, যেতেই হবে।

জীবন। ব্যস্‌ চুকে গেল। এখন বিকাশ, তোমার 'toilet' সেরে নাও। তোমার চুল আঁচ্‌ড়ানটা যে কতক্ষণে হবে তা তোমার আর্‌সি বা চিরুণী এরা কেউই জানে না। আর জামা কাপড় পর্‌তে পর্‌তে তোমার dressing mirror-এর সাম্‌নে যে কত ঘুরপাক খাবে বা খেতে হবে তোমায়, তা তুমিও জান না।

বিকাশ হাসিয়া বলিল—না, ভাব্‌ছি ছেঁড়া-খোঁড়া ঢিলে-ঢালা কিছু পরে যাব, কিন্তু তা'কি আছে ছাই, আর ঐ বুদেটার কাণ্ড দেখ্‌চ জীবন, জুতোটাকে পালিস ক'রে একেবারে যেন গ্রীক্‌দের bronze shield ক'রে ফেলেছে! লক্ষ্মীছাড়াটার যদি একতিল বুদ্ধি আছে!

জীবন। তা ও বেচারী কি ক'রে বুঝবে বল? বাবু ছেঁড়া-খোঁড়া পরে কোন দিন ত আজ পর্য্যন্ত কোথাও যান নি?

বিকাশ। তোমারও ত আচ্ছা বুদ্ধি জীবন ! কখনও যাই নি বলে যে কখনও যেতে হবে না এমন ভাব্‌বার তোমার কি কারণ আছে ?

জীবন। দোহাই বিকাশ, আমি জীবন, তোমার 'বুদে' নই। তবে যদি সম্মতি দাও তোমার জুতোটার এমন চেহারা খুলে দিতে পারি যে, ওটা যে কোন্‌দিন কি ছিল তা কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না। আল্‌বার্ট কি স্থ, কি সেলিম, কি লপেটা, কি লেডিজ্‌ স্লিপার, কি কট্‌কি চটি— কি বল, রাজী ?—

বিকাশ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ তা নয়, কি জান, একটু carefully careless হতে পার্‌লে মন্দ হয় না।

মুনি। অর্থাৎ তুমি কিছুতেই মানুষকে জানাতে চাও না যে, তুমি শ্রীবিকাশ বসু সৌখিন-চূড়ামণি। তুমি দিনে অন্তত দশবার মাথায় চিরুণী লাগাও, পঁচিশবার আর্‌সিতে মুখ দেখ, খাওয়া সম্বন্ধে পিট্‌পিটেদের মধ্যে তুমি অদ্বিতীয়, বাইরে বেরুবার সময় তোমার 'খদ্দর', আর ঘরে প'রে থাক 'চায়না-সিল্কের পা—জা—'

জীবন। এই মুনি ওকি, অসভ্যতা কোর না।

বিকাশ। আচ্ছা বেশ বাপু, আমি ও-সব স্বীকার করেই নিচ্ছি, কিন্তু যদি আমার পাঞ্জাবীটার গলায় একটা বোতাম আর বাঁ-হাতের একটা বোতাম না থাকে, তাহ'লে তোমাদের আপত্তির কোন কারণ আছে ?

মুনি এবং জীবন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়ই আছে।

বিকাশ। কেন ?

মুনি। তুমি ঐ দেখিয়ে মানুষকে বোঝাতে চাও, তোমার কষ্টের শেষ নেই, জামা কাপড় যেমন তেমন প'রে হাব্‌জা-গোব্‌জা যা-তা খেয়ে তোমার দিন যায়, এদিকে—'

বিকাশ। ব্যস্, আর এদিকের দরকার নেই।

জীবন। তবে লক্ষ্মী-ছেলেটির মত আমাদের সঙ্গে খদ্দরের কোট্‌টা গায়ে দিয়ে নাও।

বিকাশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল—ও বাবা, সে কিছুতেই পার্‌ব না! আমি—না—না—কিছুতে না—আমায় মেরে ফেল্‌লেও পার্‌ব না।

জীবন। কেন? মেয়েরা খদ্দর সাড়ীটাকে hobble skirt-এর-মত ক'রে প'রে বাইরে আসতে পারেন আর তুমি কোট্ পর্‌তে পার্‌বে না?—পার্‌তেই হবে। আর তার নীচে দিয়ে তোমার পাঞ্জাবীর খানিকটা বেরিয়ে থাক্‌বে, আর পাঞ্জাবী-মেয়েদের 'সুরথানের' মত করে কাছা-কোঁচা বাদ দিয়ে কাপড়টা পর্‌তে হবে—নইলে তুমি স্বদেশ-সেবক বলে কি ক'রে পরিচয় দেবে?—'

বিকাশ শুইয়া পড়িয়া বলিল—উঃ মরে গেলাম, আমার Colic pain উঠেছে, Dr. Saha-কে ডেকে পাঠাও, তিনি এসে certificate লিখে দেবেন। আমার ভয়ানক অসুখ—নড়া-চড়া বারণ,—

মুনি হাসিয়া বলিল—এই জীব্‌নে, ওকে ছেড়ে দে, বেচারা কাবু হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু তুই কি পর্‌বি শুনি?—

জীবন। এখন যা প'রে আছি তাই।

মুনি চোখ দুটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া এবং তদনুরূপ মুখের হাঁ বড় করিয়া ধীরে ধীরে বিকাশের পাশে বসিয়া বলিল—বলিস্ কি রে! তুই কি আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা খেয়েছিস?—আমাকেও যে ঘাব্‌ড়ে দিলি! ঐ গুণচট্ প'রে তুই যাবি?

জীবন। হাঁ।

বিকাশ মুনিকে বলিল—তুমি কি পর্‌বে মুনি?—'

মুনি। ভাব্‌ছি।

বিকাশ। Let me help you—শান্তিপুরি ধুতি, বহরমপুরি সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদর, এ সবই দিশী জিনিষ মুনি—'

মুনি। ঐই ত' ভাব্‌ছি বিকাশ, এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে কি লাভ?

বিকাশ সাহস পাইয়া বলিল—আর একটি জিনিষ বাড়াতে চাই, ভাই জীবন, রাগ কোর না,—রুমালে, বেশী নয় একটি ফোঁটা Violet.

জীবন কোন কথা কহিল না। বিকাশ তাহাকে বুঝাইতে লাগিল—দেখ যে গরম পড়েছে, আর তুমি যা ঘাম, তা ছাড়া ঐ খদ্দরগুলো ভিজে গিয়ে—বাপ্‌রে—'

জীবন হাসিয়া বলিল—Sanitation-এর দিক দিয়ে আমি তোমার কথা খুব মানি, তবে—আমি—'অগুরু'।

বিকাশ। O! there is a darling! কতকগুলি নিরপরাধ মানুষের মাথাধরা তুমি সারালে, এর জন্য তাঁদের হয়ে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঘড়িতে টুং করিয়া একটু শব্দ হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল—সাড়ে দশটা!

বিকাশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—উঃ এত দেরী হয়ে গেছে, কখন কি করি?—ওরে এই বুদে হতভাগা! আঃ এখনও আমার জামা কাপড় কিছু ঠিক ক'রে রাখিস্‌ নি?

মুনি হাসিয়া বলিল—Let me help you Miss—'

* * * *

শ্রীশ তখন মায়া ও দীপ্তিকে লইয়া 'ড্রইংরুমে'র চেয়ার ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছিল। দীপ্তির কিছুই পছন্দ হয় না, কত রকমেই

সে যে সব সাজাইল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মনের মত আর হয় না।

মায়া হাসিয়া বলিল—তুই নিজে পার্‌বি না—আমাদেরও কর্‌তে দিবি না—কেমনটি হ'লে তোর মনের মত হবে বল্‌?

দীপ্তি একটা চেয়ারে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল—তুই কর্‌, আমি পারি না—'

মায়া যথাসম্ভব নিপুণতার সহিত ছবি, ফুলদানিগুলি সাজাইতে আরম্ভ করিতেই দীপ্তি বলিয়া উঠিল—আহা! কি বাহারই না হ'ল!—মরি মরি, ওর চেয়ে ঢের ঢের ভাল ক'রে আমিই রেখেছিলাম।

মায়া। দেখ্‌ ফের যদি বক্‌-বক্‌ কর্‌বি, এই সব এমনি ভাবে ফেলে চলে যাব—'

দীপ্তি। তা যা না, আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্‌ কি?

দীপ্তির কথা শেষ হইতেই বাহিরে একটি শব্দ হইল—একটু অস্বাভাবিক মিষ্ট কথা—'বেয়ারা—'

দীপ্তি ঘর ছাড়িয়া পালাইবার আয়োজন করিতেছিল কিন্তু মায়ার চোখের একটু খোঁচা খাইয়া অতি নিবিষ্ট মনে একটা ছবির কাঁচ মুছিতে লাগিল। শ্রীশ সুপ্রকাশকে ভিতরে লইয়া আসিয়া বলিল—দীপ্তি, ইনিই সুপ্রকাশবাবু; আর মায়া ত এঁকে চেনই—'

সুপ্রকাশ, মায়া ও দীপ্তিকে নমস্কার করিয়া বলিল—হাঁ, সে দিন ট্রামে ওঁকে দেখেছিলাম, তা ছাড়া আগেও দু একবার দেখেছি এঁদের কিন্তু কোথায় তা ঠিক মনে নেই।

কথা বলিতে বলিতে একবার ঘরটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সুপ্রকাশ বলিল—ও শ্রীশ, ওছবিটা ত মোটেই ওখানে মানাচ্ছে না—ওটা এমনিভাবে রাখ্‌লে বোধ হয় বেশ হবে।

তাহার পর সে অত্যন্ত সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে ঘর সাজাইতে আরম্ভ করিল।

দীপ্তি ব্যস্ত হইয়া বলিল—দেখুন, আপনি আর কেন এ-সব ঘাঁট্‌ছেন ? তা ছাড়া বিশেষ কিছু কর্‌বার ত নেই—'

সুপ্রকাশ। শুধু আর একটা জিনিষ, ঐ বাজনাটা—ওটাকে একটু কোণঘেঁসা ক'রে দিলে ঘরে একটু বেশী জায়গা হবে, আর যখন কেউ ওতে বাজিয়ে গান কর্‌বেন তখন তাঁর মুখের এক পাশ বেশ দেখা যাবে—শ্রীশ, তুমি ঐ দিকটা একটু ধর না ভাই—'

এই সময়ে করুণা এবং বীরেন্দ্রনাথ ঘরে আসিয়া দেখিলেন—সুপ্রকাশ এবং শ্রীশ প্রকাণ্ড অর্গ্যানটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে !

বীরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ওরে শ্রীশ ! ওঁকে দিয়ে এ-সব ঠেলা-ঠেলি করাচ্ছিস কেন ?—একজন কাকেও ডেকে নে না—বেয়ারাটা গেল কোথায় ?—'

বাজনাটিকে যথাস্থানে রাখিয়া রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সুপ্রকাশ বলিল—না, ওটা এমন কিছু ভারি নয়—অন্তত শ্রীশ আমাকে দিয়ে যে খদ্দরের গাঁট্‌রি বইয়েছে তার চেয়ে হাল্কা।

মায়া করুণাকে বলিল—আচ্ছা ছোটমাসী, এখন ঘরটা ঢের ভাল দেখাচ্ছে না ? আর কত বেশী জায়গা হ'ল—কিন্তু এ plan-টা সুপ্রকাশবাবুরই। এত খেটেও আমরা পারি নি—ওঁর taste-টা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল।

সুপ্রকাশ। কিছু মনে কর্‌বেন না, আমার একটা বদ অভ্যাস সব জিনিষেই—তা ছাড়া দেখ্‌লাম আপনারা সাজাচ্ছেন—'

দীপ্তি। আপনার নিজের ঘর নিশ্চয়ই খুব সাজান থাকে ?

স্বপ্রকাশ। সাজান ঠিক বল্‌তে পারি না, সাজাবার মত কিছুই নেইও; তবু গাছতলায় থাক্‌লেও ভিখারী জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার ক'রে নেয়,—এটা আমার আছে—'

কথাটাকে দীপ্তি একেবারেই পছন্দ করিল না। স্বপ্রকাশের কথার মধ্যে যেন কিসের একটু অহঙ্কার রহিয়াছে—যেন পরিহাস বলিয়া মনে হইল! পোষাক পরিচ্ছদ এবং শারীরিক গঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই মানুষটিকে 'নিখুঁৎ' বলা যাইতে পারে এবং তাহার মুখে ঐ 'গরীবিয়ানা'র স্বরটি একেবারেই মানাইতেছে না!

মনের মধ্যে যখন প্রতিকূলতার ঝড় বহিতে থাকে, তখন তাহাকে একটা মিষ্ট হাসির আড়াল দিয়া সহজভাবে কথা কহিবার অভ্যাস দীপ্তির ছিল না, তাই সে একটু বিপদে পড়িল। কথা বলিবার সে আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না কিন্তু তাহার এই বিব্রত ভাবটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। স্বপ্রকাশ বলিল—আমি মনে মনে বেজায় 'আর্টিষ্ট,' এটা একটা মস্ত অপরাধ, না মিস্ মিত্র?

এই সময়ে ঘরের বাহিরে কতকগুলি পায়ের শব্দ শুনিয়া শ্রীশ বাহিরে আসিয়া বলিল—আপনারা আসুন, ওখানে দাঁড়িয়ে রহিলেন কেন? ভয় নাই—কুকুর লেলিয়ে দেবো না।

বিকাশ বলিল—আমাদের বড় কি দেরী হ'য়ে গেছে শ্রীশবাবু?

মুনি। হ'লেও বাঙ্গালীর punctuality-র কথা মনে রেখে উনি তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

শ্রীশ তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া সকলের সহিত পরিচয় করিয়া দিল।

মুনি বিকাশকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—ওরে জীবনেটার হ'ল কি? কি ক'রে ওঁর দিকে stare ক'রে আছে দেখ্! বাঁদর! নাঃ, ওকে নিয়ে আর চল্‌ল না, ছি ছি—'

এবার ঘরের সকলেই লক্ষ্য করিলেন, জীবন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া আছে এবং মায়ার মুখখানি ক্রমেই আরক্ত হইয়া উঠিতেছে! দীপ্তি একবার সংশয়পূর্ণ চোখে জীবনকে দেখিয়া মায়ার মুখের দিকে তাকাইল। সকলের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া মায়া জোর করিয়া একটু সহজ স্বরে জীবনকে বলিল—আপনার মাথার ঘা আশা করি সেরে গেছে?

এতক্ষণে জীবনের জীবনীশক্তি যেন ফিরিয়া আসিল। মানুষ যেমন করিয়া প্রতিমাকে নমস্কার করে তেমনি ভাবে জীবন মায়াকে নমস্কার করিয়া বলিল—হাঁ, একেবারে সেরে গেছে কিন্তু এখানে আপনাকে যে দেখ্‌তে পাব তা জান্‌তাম না।

মুনি আবার বিকাশকে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—What a lucky dog!—কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল যে! তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর সব ক'টার নামে সিন্নি মান্‌তে রাজী আছি যদি—'

বিকাশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল—চুপ হতভাগা, কেউ শুন্‌তে পাবেন যে!

মুনি। তা কি করব আমার হিংসে হচ্ছে যে, ও পেয়ে গেল—'

মায়া তখন জীবনকে বলিতেছে—সেদিন আমরা সকলে শিবপুরের বাগানে যাচ্ছিলাম, College-এর Bus-এ ক'রে; দেখ্‌তে পেলাম শ্রীশ-দা আরো সব কারা একটা মটর লরিতে উঠ্‌ছে—চারিদিকে পুলিস পাহারা। কমল বল্‌ল—আজ আর কিছুতেই আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না—তারপরই দেখি, একদল লোকের মাথা লক্ষ্য ক'রে অনেক লাঠি উঁচু হয়েছে! আমরা তাড়াতাড়ি নেবে ভিড়ের মধ্যে এসে পড়্‌লাম—উঃ সে কথা মনে হ'লে এখনও আমার গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে!—সেই ছোট্ট ছেলেটি কে জীবনবাবু? তাকে ভয়ানক

দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। তার মাথাটা কোলে তুলে আমার পা ধরে 'মা—মা' বলে কেঁদে উঠ্‌ল! আপনি জানেন ?

জীবন। না। পথে চল্‌তে গেলে অমন কত শত মানুষকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কিন্তু তাদের চেন্‌বার ফুর্‌সৎ কোথায়?

মায়া। কি মিষ্টি তার মুখের কথা! বল্‌ল—তোমরা এখানে কেন মা? তোমাদের অপমান কর্‌লে যে আমাদের সইবে না—তার চেয়ে তোমরা ঘরের ভেতর থাক আমাদের দেখো না—করুক না কত নির্য্যাতন কর্‌তে পারে ওরা, আমরা ত কোন অন্যায় কর্‌ছি না—'

করুণা মায়াকে বলিলেন—এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে কিন্তু তুই ত আমায় একটি কথাও বলিস্‌ নি মায়া—'

মায়া। কি জানি কেন এই প্রথম তোমার কাছ থেকে একটা কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি, কিছুতে বল্‌তে ইচ্ছে করেনি—রাগ কর্‌লে ছোটমাসী?

বীরেন্দ্র বলিলেন—ছোটমাসীর চেয়ে ছোটমেসো রাগ করেছে বেশী, তোকে আমার একটা prize দিতে ইচ্ছে কর্‌ছে, কি চাস্‌ বল্‌—'

মায়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা একদিন চেয়ে নেবো কি চাইব তাই দিতে হবে।

বীরেন্দ্র। শুধু আকাশের চাঁদ ছাড়া, তবে এই সম্বন্ধে যদি কিছু information জান্‌তে চাস্‌ তা পাবি।

বিকাশ বীরেন্দ্রকে বলিল—ডাঃ মিত্র, এর পূর্ব্বে আপনাকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য না হ'লেও আপনার article, Royal Society-র Journal-এ অনেক দেখেছি আর তা নিয়ে আমরা কত সময় আলোচনা করেছি—'

কিন্তু আর বলিতে হইল না—মহা উৎসাহে বিকাশকে লইয়া বীরেন্দ্র কথায় মাতিয়া উঠিলেন।

আপনারা—আপনি পড়েছেন ও-গুলো সেই Radio activity সম্বন্ধে প্রবন্ধটা ?—'

বিকাশ। হাঁ খুব বিস্ময়কর বটে! গ্রহ-নক্ষত্রের আলো উত্তাপ দেবার শক্তি হারালেও পৃথিবীর নিজের ভাঁড়ারে যা সঞ্চিত আছে তাই দিয়েই সে কাজ চালাতে পারবে, তাতে তার কোন অসুবিধা হবে না—'

বীরেন্দ্রনাথ কথা বলিবার মানুষ পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—কিছু অসুবিধে হবে না, যদিও এ সম্বন্ধে Lord Kelvin প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মত আর কোন দেশের বৈজ্ঞানিক নিতে চান না—Science হ'ল মানুষের চোখ, ওকে না পেলে কিছুই হয় না—শুধু Philosophy নিয়ে জগৎ চলে না, একথা শুনলে আমাদের দেশের মানুষ লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে আসবে কিন্তু এটা খুব সত্যি কথা। পঞ্চাশটি বছরে জার্ম্মানী আর জাপান যা হ'য়ে উঠেছে তা দেখলেই বোঝা যায়, যদিও আমাদের দেশের মানুষ বলে—যা হয়েছে তা জানোয়ার।—ধ্যান কর, নিষ্কাম হও, বৈরাগ্য সাধন কর, এই সব হ'ল আমাদের দেশের মানুষের উপদেশ। আমাদের দেশের মানুষকে জন্ম থেকে জীবনকে অগ্রাহ্য করতে শেখান হয়, অথচ যারা জীবনকে শ্রদ্ধা করে তাহাদের হাতে লাঞ্ছিত হ'লে এরা নালিস করে। মুখে বলবে সংসারটা পদ্মপত্রে জলবিন্দু, কিন্তু যদি কেউ তার পাল্টা জবাবে বলে—ঐ জলবিন্দুটা ফেলে দিয়ে তুমি স'রে পড় না বাপু, তখন আবার 'আমাদের দেশের মাটি' ব'লে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না হয়! অথচ এই কথাটা সবাই বেশ জানে যে 'যার লাঠি তারই মাটি'—বৈজ্ঞানিক-লাঠির প্রতাপে মানুষ ত কোন্

ছার—আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রও ঢিট্‌ হ'য়ে আছে—আমাদের দেশের মত উর্ব্বরা মাটি আর কোথাও আছে কি? তবু দুর্ভিক্ষ কেন?—

খবরের কাগজে নালিস বেরুবে—রাজ-কর দিয়ে আমরা ফতুর হ'য়ে যাচ্ছি—তার পরই ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে বেরুবে—আজকাল আবার ভিক্ষার জন্যে একটা করে receipt দেওয়া হয়।

বেদনায় সমস্ত শরীরমন আড়ষ্ট হইয়া গেলেও [illegible] কোন কথা কহিল না। বীরেন্দ্রনাথ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—সেদিন ট্রামে দেখলাম, আপনাদের স্বরাজ-ফণ্ডের চাঁদা তোল্‌বার জন্য একটি লোক একজন সাহেবের কাছে তার তালা-চাবি-বন্ধ-করা বাক্সটা বাড়িয়ে একটা বোর্ডে লেখা notice তাঁকে পড়্‌তে দিল। সাহেব প'ড়ে হেসে একটি এক-আনি তার বাক্সে ফেলে দিল। সেই লোকটি তাকে একটা receipt দিতে গেলে সাহেব হেসে বল্‌লে—Receipt from a begger? ট্রামসুদ্ধ লোক তাকে মার্‌ মার্‌ ক'রে উঠ্‌ল! —সাহেব বল্‌ল—What have I done but?—

বিকাশের মুখে একটা শ্রান্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—ওঃ আপনাদের বড় tire কর্‌ছি?

বিকাশ এবং জীবনের পাশে বসিয়া মুনি কথা শুনিতেছিল। সে বলিল—কিছু ব্যস্ত হবেন না, আমরা বড় সহজে tired হই না, [illegible]লে চলে না। আপনাকে এখুনি ছাড়্‌ছি না ডাঃ মিত্র, আপনার কথাগুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে। এবার থেকে জীবন একটু সাবধান হ'য়ে কথা বল্‌বে আমার সঙ্গে। এ কথাগুলো ওকে যখন আমি বল্‌তাম তখন আমায় খুন কর্‌তে শুধু বাকি রাখ্‌ত; ওর motto হচ্ছে non-violence কিন্তু কাজের বেলায় উনি Violent No. 1.

আমি সেদিন খদ্দরের জামা-কাপড়কে national dress না ব'লে military dress বলেছিলাম ব'লে—'

জীবন বলিল—আচ্ছা ডাঃ মিত্র, এটা অন্যায় নয় কি—এই দলভারি করাটা? করুণা হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের দিনগুলো বেশ গোলমালে কাটে দেখ্ছি—'

মুনি। শুধু দিন নয় মিসেস্ মিত্র, রাতগুলিও। ঐ জীবনের জীবনী-শক্তি এত বেশী যে, তার ধাক্কা সামলাতে—'

মুনি দুষ্টামি করিয়া জীবনের দিকে চাহিয়া হাসিল।

জীবন তাহার চোখের ইঙ্গিতের সহিত হাতের গাঁট্টাটিকে একটু ঘুরাইয়া নীরবে জানাইল—ফিরে যেতে হবে মনে থাকে যেন রাস্কেল—'

এই সময়ে বাড়ীর ফটকের সামনে মোটর থামার আওয়াজ শুনিয়া মায়া ও দীপ্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী হইতে সকলে নামিতেই মায়া হাসিয়া বলিল—খুব যা-হোক সব—তবু হাতের ঘড়িগুলো এখনও চল্‌ছে—

কমলা। কি কর্‌ব ভাই, এদের সকলকে তুলে আন্‌তে হ'ল, আর উমাটা যা জ্বালিয়েছে কি বল্‌ব। ওর dress করা আর হয় না—'

উমা। আহা তা বৈকি, নিজে এলেন দেরি ক'রে—'

কমলা এবং শান্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়া বলিল—এই খুবরদার এখন ও-ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিস নি, ওপরে চল্ কথা আছে।

সকলে ওপরে আসিতেই মায়া গান ধরিল :—

মরি লো মরি
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?—

শান্তা মায়ার বুকে হাত দিয়া বলিল—সত্যি এত বড় বিপদ তোর উপস্থিত হয়েছে, এ্যা শুনে যে লোভ হচ্ছে রে?—

মায়া সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া গাহিতে লাগিল—

ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না—'

কল্যাণী দীপ্তিকে বলিল—হ্যাঁরে কবে থেকে ওর এমন দশা হয়েছে ?

আহা বেচারীর হৃদযন্ত্রটা দেখ্‌ছি একেবারে Out of order !

মায়া গাহিতে লাগিল ঃ—

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল্‌ কি করি ?
শুনেছি কোন্‌ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে
সাঁজের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে !
ওগো তোরা জানিস্‌ যদি পথ বলে দে,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ?

মায়া যখন গাহিতেছিল তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। শুধু আনন্দ করিবার জন্যই কি এ গান ! কিন্তু সুরের মধ্যে কোথাও লঘুতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং একটি গভীর আবেগের রেশ ছিল।

মায়া থামিতেই কমলা তাহার পাশে বসিয়া নারী-হৃদয়ের সমস্ত ঔৎসুক্য ঢালিয়া বলিল—কি হয়েছে সব খুলে বলবি না ভাই ?—

মায়া। তাহ'লে গান গাই ?—

কমলা না—না। কথা—কথা বল। সোজা কথায় শুন্‌তে চাই সব।

মায়া। পার্‌ব না—'

শান্তা। তা না হয় তুই গান গেয়েই জানা তোর হৃদয়-বেদনার কথা; আহা বেচারী কত কষ্টই পাচ্ছিস আর সে-ই বা কেমন হৃদয়হীন, দূর থেকে প্রাণ নিয়ে টানাটানি কর্‌ছে?

শান্তার মুখের কথা শুনিয়া মায়া মাটির দিকে তাকাইয়া মুখের ভাবটি এমনি করিয়া ফেলিল যে, আর কাহারও মনে কোন সন্দেহ রহিল না। উমা মায়ার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—কে ভাই তিনি, তাঁকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখ্‌তে? কবে, কোথায় আলাপ হ'ল—কি ক'রে হ'ল? তাঁর নাম কি ভাই?

মায়া গম্ভীর ভাবে একবার চারিদিকে তাকাইয়া গলার স্বর চাপিয়া বলিল—চুপ্, এখন সে-সব কিছুই বল্‌তে পার্‌ব না; পরে সব জান্‌বি।

উমা। পরে ত দোকানের মুদী মিন্‌সেটাও জান্‌তে পার্‌বে —না ভাই, আমাদের বল্‌তে হবে, বল্—'

মায়া একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল, সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত তাহার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে আর মাঝে মাঝে মিনতি করিয়া বলিতেছে—বল্ ভাই, বল—'

হঠাৎ পিয়ানোর প্রত্যেক পর্দ্দায় খুব তাড়াতাড়ি আঙ্গুল চালাইয়া দিলে যেমন একটা স্বর খেলিয়া যায় মায়ার মুখ দিয়া তেমনি তীব্র মিষ্ট হাসি বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিল।— ওঃ, তোরা কি নিরেট রে! কি নিরেট—নির্জ্জলা খাঁটি বোকা! তাহার পরেই আবার হাসি।

কল্যাণী অনেক প্রকারের প্রেমের কথা শুনিয়াছে এবং পড়িয়াছে;— সে ভাবিল, মায়ার এ হাসি তাহার প্রাণের অব্যক্ত প্রেমেরই একটা

expression, তা ছাড়া—when a woman is in love, you can tell by her talk, সে পরম বিজ্ঞের মত মায়ার গাল টিপিয়া বলিল ঃ—

এ ত খেলা নয়, খেলা নয় ;
এ যে হৃদয়-দহন জ্বালা সখি—'

মায়া আবার হাসিয়া উঠিল—there you are, ওঃ ! কি নিরেট রে বাবা ! আজ আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মারা যাব—'

দীপ্তি বলিল—ওকে আজ ভূতে পেয়েছে, সমস্ত সকালটা আমায় জ্বালিয়েছে, এখন তোদের নিয়ে আবার আরম্ভ করেছে ।

কল্যাণী অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলিল—সত্যি নয় ? ধোৎ, তবে কি হবে ?—What's life after all without any romance ?—Trash—

শান্তা। তাহ'লে আর এখানে অসূর্য্যম্পশ্যাদের মত ব'সে থাক্‌বার দরকার ? আমাদের Guest-রা কি ভাব্‌বেন ?

কল্যাণী। আচ্ছা তাঁরা সব্বাই এসেছেন ? সেই বদ্‌রাগী গুণ্ডা ছেলেটি ?—

কমলা। দেখ্‌ কল্যাণী, তুই বড় অসভ্য। কোথায় বদ্‌রাগী গুণ্ডা ছেলে দেখ্‌লি ?

কল্যাণী। বদ্‌রাগী নয়, গুণ্ডা নয় ? না হয় সেই পাহারাওয়ালাটা আমার হাত একটু ধরেছিল, তার jealous হবার কি আছে ? মাগো, তার মুখখানা যা ক'রে দিল, একেবারে আস্ত ডাকাত, প্রাণে যেন একটু ভয় নেই—আমার আত্মীয় হ'লে ওকে আর কখনও রাস্তায় বার হ'তে দিতাম না, সমস্ত ক্ষণ তালাচাবি দিয়ে রাখ্‌তাম ঘরে—নে ওঠ্‌, নীচে যাই—'

গিয়াছে। সে জানিতে পারে নাই, জানিলে হয় ত তাহার সঙ্গ ছাড়িত না!

ঐ ত দীপ্তি, বিকাশ, মুনি, কল্যাণী, শান্তা, সুপ্রকাশ, শ্রীশ, কমলা সকলেই কথা কহিতেছে কিন্তু কেহই ত তাহার মত ঘামিতেছে না!

জানালার নিকটে ঈষৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বিমল বসিয়াছিল একা এবং সবার অলক্ষ্যে, এক একবার তাহার চোখের ক্ষুধিত চাহনি সকলের উপর দিয়া আসিয়া জীবন এবং মায়ার মুখের উপর থামিয়া যাইতেছিল। সে চাহনির অর্থ—মায়া অত কি কথা বল্‌ছেন জীবনকে? কেন অত মিষ্টি ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌লেন?—আর ঐ যে গম্ভীর হ'য়ে কি বল্‌লেন মাথাটিকে একটু হেলিয়ে!...

হঠাৎ বিমলের ম্লান মুখের উপর জীবনের দৃষ্টি পড়িল। বিমলকে দেখিয়া তাহার একটু সাহসও হইল,—'আমারও দোসর আছে'!...

এই কথাটি মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা দুষ্টামি বুদ্ধি তাহার মাথায় আসিল।

মায়া তখন একটু বিপদে পড়িয়াছে। জীবন যেন একটু বেশী অন্যমনস্ক, ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না—হয় ত অভিমান করিয়াছে—করিবারই কথা—অমন করিয়া তাহাকে রাগাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল?

এই সব চিন্তা যখন মায়াকে একটু একটু করিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল, এমন সময় জীবন বলিল—আচ্ছা বিমলবাবুর লেখা আপনার কেমন লাগে?—'

মায়া এ-কথা শুনিবে আশা করে নাই। সে তাহার সাপের মত জলন্ত চোখ দুটি জীবনের মুখের উপর রাখিয়া তাহার মনের

ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিল, তাহার পর তাহার ঠোঁট দুটিতে অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল—এ সেই হাসি, পুরুষদের 'জবাই' করিবার প্রয়োজন হইলে নারী যাহা ব্যবহার [illegible] বলিল—বেশ লাগে। মতগুলো খুব শক্ত না হ'লেও বেশ sincerely বলেন, আর মনে হয় feel করেই বলেন, শোনা কথা নয়,—এই কথা কয়টি বলিয়া মায়া বিমলের দিকে তাকাইল।

বিমল এতক্ষণ নীরবে একান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে এই চাহনির প্রতীক্ষা করিয়া ছিল—সে চোখ দিয়া মায়াকে তাহার নিবেদন জানাইল—এ নিবেদন সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে নিবেদিত হইলেও যাহার উদ্দেশে নিবেদিত হইল সে-ছাড়া আর সকলের কাছে অপ্রকাশিতই থাকে। মায়া বুঝিল—ঐ চাহনি বলিতেছে—সেই তখন থেকে একা বসে আছি, তোমার সঙ্গে আমার এখনও একটিও কথা হয় নি—তুমি একটি বারও আমার দিকে তাকাও নি, যেন আমাকে তুমি চেন না—উঃ আজ চার বছর—'

মায়া তাহার মনের সমস্ত গর্ব্বটুকু হাসির আকারে বাহির করিয়া জীবনের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—তাই ওঁকে চিরদিন আমার বড় ভাল লাগে।—'

জীবনের জীবনে এত বড় আঘাত আর কেহ দেয় নাই! এক ঝলক রক্ত আসিয়া তাহার মুখখানিকে রাঙাইয়া দিল। কিন্তু সে গর্ব্ব ছাড়িল না। বলিল—হাঁ, বেশ ছেলেটি। উনি যখন আমাদের সঙ্গে 'স্কটিশ চার্চ্চ' কলেজে পড়্‌তেন, তখন ওঁর সঙ্গে বেশী আলাপ না থাক্‌লেও দু-একটা ঘটনায় ওঁকে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে আমার বেশ ভালই লেগেছিল। ইংরিজি বাঙলা দুটোতেই বেশ দখল আছে, তা ছাড়া 'পার্সিয়ান' আর 'ফ্রেঞ্চ'ও বেশ আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন।

মায়া। আপনার লেখাও আমার বেশ লাগে, তবে—'

জীবন হাসিয়া বলিল—প্রথমটা বাদ দিয়ে ঐ 'তবে'-টাই বলুন।

মায়া। সে ত আগেই বলেছি।

জীবন। 'সাবধানী পথিক'?

মায়া। হাঁ।

'হাঁ' কথাটি বলিয়াই মায়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—The earth is round, যেখান থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম ঠিক সেইখানেই এসে পৌঁচেছি।

জীবন। সেটা পৃথিবীর গুণে, কি আপনার steering-এর গুণে, তা যদিও বোঝা একটু শক্ত, তবে আমিও মান্‌ছি the earth is round.

মায়া বুঝিল, জীবন আহত হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঐ কথা চাপা দিবার জন্য একখানি গানের বই লইয়া তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া জীবনও তাহা জানে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

জীবন বলিল—না, কিন্তু আপনার সাহায্য পেলে হয় ত জান্‌তে পারি।

মায়া। পারেন, কিন্তু এখন আমায় অনুরোধ কর্‌বেন না, কেননা এখন আমি গাইব না। আর না গাইলে ত ভাব্‌বেন আমি দাম বাড়াচ্ছি?

মায়ার উপর জীবনের মনে যে অভিমান হইয়াছিল এই কথায় তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল—'কিন্তু আপনার এত কাছে ব'সে কথা কইবার সৌভাগ্য হয় ত জীবনে আর নাও হ'তে পারে!—'

মায়া হাসিয়া বলিল—আপনার একটা লেখায় পড়েছিলাম—'সৌভাগ্য, সুযোগ আস্‌বে ব'লে ব'সে থাকে শুধু আমাদের দেশের মানুষই, কেউ ওগুলোকে ক'রে নিতে চায় না'—তার কারণ কি জানেন?

জীবন হাসিয়া বলিল—না,—কি?

মায়া। ঝঞ্ঝাট পোহাতে চায় না কেউ, কুড়িয়ে পাওয়া যোল-আনা লাভ, হাতে ক'রে গ'ড়ে নিতে হ'লে যে অসুবিধেটা হয়, তা তারা ভোগ করতে চায় না।

জীবন লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিল।

*　　*　　*　　*

অন্যদিকে আর সকলেও নীরব হইয়া ছিল না—ঘরে ঢুকিয়াই মুনিকে দেখিয়া কল্যাণী শ্রীশের উপর রাগিয়া বলিল—[illegible] শ্রীশ-দা, তুমি ত একদিনও বল নি আমাদের যে, মুনিবাবুকে তুমি চেন-

তাহার পরই মুনির পাশে বসিয়া কথা স্বরু করিয়া দিল, [illegible]জনে যেন বহু পুরাতন বন্ধু!

বিকাশ দীপ্তিকে তাহার স্বাভাবিক কৌতুকভরা কথায় বলি[illegible]ছিল—উঃ কি ভয়টাই পেয়েছিলাম আপনাদের ঐ নেমন্তন্নর চিঠি [illegible]—কিছু মনে করবেন না, ব্রাহ্মদের ওপর আমার ভয় ছিল চির[illegible]'

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—তাদের অপরাধ?

বিকাশ। অপরাধটা হচ্ছে তাঁরা বড় চট্‌ পট্‌ উপরে উ[illegible] গেছেন, তাই তলায় দাঁড়িয়ে আ[illegible]—'

দীপ্তি। আপনারা যে তলায় দাঁড়িয়ে আ[illegible]ন তার প্রমাণ?

বিকাশ। বল্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু বলুন অপরাধ নেবেন না?—কারণ যখন একবার আপনাদের কাছে আস্‌বার সৌভাগ্য

হয়েছে আমার, তখন আর ফিরে যেতে চাই না।—আপনাদের ভয় করি চিরকাল কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে একটা মোহ আমার মনের মধ্যে চিরকালই আছে,—আপনাদের সব-কিছুই আমার ভাল লাগে।

দীপ্তি। কিন্তু এদিকে আপনি আপনার তর্কের point হারিয়ে ফেল্‌ছেন যে?—'

বিকাশ বুঝিল তাহার এতগুলি প্রশংসা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু ভাল লাগে বলিলেই যথেষ্ট হইত। বলিল—হাঁ, আমরা যে তলায় দাঁড়িয়ে আছি তার প্রমাণ পাই আপনাদের আচার্য্যদের বক্তৃতা থেকে—কিন্তু ক্ষমা কর্‌বেন মিস্ মিত্র, আমি ধর্ম্ম নিয়ে কিছু বল্‌ছি না।

হিন্দু-সমাজের কাছে ব্রাহ্মদের যে নিগ্রহ সইতে হয়েছে, তা আমি ভুলি নি। তাঁরা যে ভাবে তা গায়ে না মেখে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন একদিন, তার তুলনা জগতে খুব কম পাওয়া যায়। তাঁদের মত, বিশ্বাস—এ সমস্তের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে—'

দীপ্তি। কিন্তু এবারও আপনি অন্য কথা বল্‌ছেন—'

বিকাশ হাসিয়া বলিল—আমি যেন আমার মনটাকে analyse করতে বসেছি কিন্তু এত কথা বল্‌বার দরকারও একটু আছে, এই জন্যে মনে করি যে, আপনি আমায় ভুল না বোঝেন—মোটের ওপর আমি বল্‌তে চাই—প্রচারটাকে আমি বড় মনে করি না—তার দরকার আছে বলেও মনে হয় না।

দীপ্তি। কিন্তু আমার ত তা মনে হ'তে পারে?—'

বিকাশ। খুব পারে, কিন্তু একটি কথা ভুলে যাবেন না মিস্ মিত্র যে, ঐ প্রচারের ভিতর দিয়ে আপনার সমস্ত মত এবং বিশ্বাস আর এক জনের মনে বসিয়ে দেন।

দীপ্তি। এটা ত খুব স্বাভাবিক, কারণ ঐ প্রচারের ভিতর দিয়ে আমি তাকে আমার দিকে টেনে আন্‌তে চাই।

বিকাশ। অর্থাৎ ধর্ম্মের 'একতা' দিয়ে একটা বাঁধনের সৃষ্টি করতে চান, এই ত?—'

দীপ্তি। হাঁ, সেই ত শ্রেষ্ঠ বাঁধন হবে।

বিকাশ। হ'ত, যদি না মানুষ 'মানুষ' হ'ত।

দীপ্তি। বুঝ্‌লাম না আপনার কথা!—'

বিকাশ। বুদ্ধ, মহম্মদ, খৃষ্ট এঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন যদিও তাঁদের দেবতা বা অবতার বানিয়ে আমরা ছেড়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের মত এবং বিশ্বাস দেখুন আলাদা আলাদা—'

দীপ্তি। তা ত জানি। যেমন ক'রেই হোক নিজের দলভারি করাটা মানুষের পক্ষে ত স্বাভাবিক। সমগ্র ইউরোপ আজ—'

বিকাশ। একই ধর্ম্মের বাঁধনে বাঁধা—এই ত বল্‌তে চান? কিন্তু কি সার্থকতা হয়েছে তাতে ধর্ম্মের—রক্তের নদী ত থাম্‌ল না, সে ত সমানে ছুটে চলেছে—'

দীপ্তি এবার তাহার সমস্ত যুক্তিগুলিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল [illegible]ল, এমন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না যাহা দ্বারা সে বিকাশের ক[illegible] মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারে,—তাই সে অন্য দিক দিয়া বিকাশ[illegible] আক্রমণ করিল—আপনি তাহ'লে বল্‌তে চান, ধর্ম্মের বাঁধনই স[illegible] চেয়ে বড় বাঁধন নয়?—'

বিকাশ অত্যন্ত কোমল স্বরে বলিল—[illegible] ত ভুল করলেন মিস্ মিত্র—ধর্ম্ম জিনিষটার ভিত্তি আছে মনুষ্যত্বের ওপর, এই 'মনুষ্যত্বে' যেখানে গল্‌তি, সেখানে ধর্ম্মের বাঁধন টেঁকে না। তা ছাড়া ধর্ম্ম যে বাঁধন খোলবার জিনিষ, বাঁধন কাটাবার। ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে আমি

যখন আপনার পাশে এসে দাঁড়াব, তখন যে আমি মাটিতে থেকেও আমার মন থাকবে মাটির বাইরে, কিন্তু মাটিতে যখন আছি তখন মাটির বাঁধনকে অগ্রাহ্য করব কেন ?—

দীপ্তি। অর্থাৎ ?—'

বিকাশ। মাটির বাঁধন মানে আমি বলতে চাই—মনুষ্যত্বের বাঁধন, সামাজিকতার বাঁধন।—সমাজ কথাটাকে আপনারাই ত প্রথম এমন স্পষ্ট ক'রে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন,—কিন্তু তাকে এনে রেখেছেন মন্দিরের প্রাঙ্গণে, তাই অন্য দেশে যেমন ধর্ম্মের বাঁধন খুলে গেছে, আপনাদের তেমনি সমাজের বাঁধন পড়ে নি।

দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—আপনি বলতে চান—ব্রাহ্ম-সমাজের কোনও দরকার নেই ?—'

বিকাশ দীপ্তির কথা শেষ হইতেই হাত জোড় করিয়া বলিল—আমার অন্যায় হয়েছে মিস্ মিত্র, আমায় ক্ষমা করুন—'

বিকাশ এমনভাবে ঐ কথা কয়টি বলিল যে, দীপ্তি তাহার উপর আর অসন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে একবার বিকাশকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—আমি ব্রাহ্ম-সমাজকে ভালবাসি বিকাশবাবু।

বিকাশ। আমিও ত বলেছি ঐ কথা পূর্ব্বেই,—আর এত কথা যে বললাম তার কারণই হচ্ছে আমার সমস্ত মনটা পড়ে আছে ব্রাহ্ম-সমাজের ওপর।

দীপ্তি। তাহ'লে আপনার মত শুধু প্রচারের বিরুদ্ধেই ?

বিকাশ। হাঁ, when you pay a man to preach তখন সেই মানুষের অনেকখানি সদ্‌গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। ধর্ম্ম-প্রচারটা যাঁদের পেশা বা জীবিকা-উপার্জ্জনের উপায়, তাঁরা কি আর ধর্ম্মের মাধুর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন ? সেটা সম্ভব নয়।

দীপ্তি। আপনি এ সমস্ত পরিহাস ক'রে বল্‌ছেন না, বিকাশ বাবু?—

বিকাশ। না। বিশ্বাস করুন মিস্ মিত্র, কোন নীচ ভাব মনে নিয়ে এ সব বলি নি আমি। কিন্তু আর নয়, বলুন অপরাধ নেন নি?

দীপ্তি। না অপরাধ কেন নেব, আপনি আপনার মত বল্‌বেন, তাতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকারই আছে, কিন্তু কি জানি কেন আপনার কথায় ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি—' বলিতে বলিতে দীপ্তির মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বিকাশ বলিল—আপনি ভাবেন আমি বাইরে থেকে আপনাদের সমাজকে দেখেই তার বিচার করতে বসেছি?—'

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না।

বিকাশ বলিল—তাহ'লে এর চেয়ে বড় কষ্টের কারণ আমাদের দুজনের পক্ষেই আর কি হ'তে পারে?

বিকাশ তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পাশে দীপ্তি তাহারই কথায় আহত হইয়া বসিয়া আছে, অথচ এমন কিছুই পরিচয় হয় নাই যাহার উপর ভরসা রাখিয়া সে দীপ্তির নিকট আপনার মনের যথার্থ ভাবটিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া তাহার দোষ সারিয়া লইতে পারে। ক্ষমা চাহিবার মত সাহসও যেন তাহার মনে নাই। তাই দীপ্তির কাছে বসিয়া থাকিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল অথচ উঠিয়া যাইবারও উপায় নাই। অতি কষ্টে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া বিকাশ দীপ্তির পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর চোখ রাখিয়া বলিল—আমার অন্যায় হয়েছে মিস্ মিত্র, আমায় ক্ষমা করুন—'

দীপ্তি বলিল—আপনার কথা বলায় অন্যায় হয়েছে ভেবে কষ্ট পাই নি, ওকথাগুলো এমন কিছু নতুনও নয়, তবু কারো কাছেই শুনতে চাই না—এর কারণ আমি আপনাকে ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না—কিন্তু কি ক'রে আমাদের সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে—তার বিষয়ও ত আমরা ভাব্‌তে পারি, শুধু দোষ না ধ'রে—আপনার কি মনে হয় না এ কথা? আচ্ছা বিকাশবাবু, আমাদের সমাজের সমস্ত কিছুর জন্যেই কি প্রচারকরাই দায়ী?

বিকাশ। না। তা মনে হয় নি আমার কোন দিন, তবে এটা অনেক সময় ভেবেছি যে, এর অনেকখানি দায়িত্ব আমাদের ওপর আছে,—আমরা, যারা শরীর দিয়ে সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি—এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় সব চেয়ে বেশী দোষ হচ্ছে আমার মনে হয়, মিস্ মিত্র!

কথাগুলি অনেক ঘুরাইয়া বলিলেও সেদিনকার-পড়া বইখানির অনেক প্রশ্নের সমাধান যেন হইয়া গেল। দীপ্তি ভাবিল—সেদিন মায়ার সঙ্গে তাহার ঠিক এই কথাই হইয়াছিল।

বিকাশ বলিল—ভালবাসাকে আশ্রয় ক'রে মানুষ বেঁচে থাকে, আর মানুষকে আশ্রয় ক'রেই সমাজ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। ভালবাসার ভিতর দিয়েই তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। গতানুগতিক প্রথা অনুসারে বিয়ে বা স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক একটা সম্বন্ধের বন্ধনই সব নয় মানুষের পক্ষে। ওর ভিতর দিয়ে জীবনের বিকাশ হয় না। তবু ঐ বিয়েটাকেই প্রধান আর সব চেয়ে দরকারী বলে সমাজ মেনে নিয়েছে, কারণ তার পক্ষে Compromise-টাই সব চেয়ে মঙ্গলকর। সমাজ বলে—মানুষ ত 'মানুষ', সে ত আর জানোয়ার নয়? একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তাদের মনের সমস্ত বিশ্বস্ততা নিয়ে যদি পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় আর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়কে

আশ্রয় ক'রে নতুন মানব-প্রাণ জগতে বেড়ে ওঠে, তাহ'লে এই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধটা কেন স্থায়ী হবে না?—না হওয়াটাই সমাজের কাছে অন্যায়।—কিন্তু ঐ আকাশের তারাগুলি যাঁর চোখ, তিনি দেখ্‌ছেন গভীর রাত্রে কত মানব-প্রাণ তারই বন্ধনের নাগপাশের গ্লানির বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ফেল্‌ছে। যে বাতাস জগৎকে তার স্পর্শ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে যায়, কত দীর্ঘশ্বাসে সে অমন স্নিগ্ধ হয়েছে—'

দীপ্তি অবাক হইয়া বিকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই উন্মনা ভাবটি লক্ষ্য করিয়া বিকাশ বলিল—আবার কষ্ট দিলাম আপনার মনে?—'

দীপ্তি। কি আশ্চর্য্য মিল আছে আপনার আমার দিদির সঙ্গে। ঐ সমস্ত কথাই সে কতবার আমায় বলেছে!—আমি দিদিকে আপনার কাছে নিয়ে আসি?

বিকাশ। আমাকে যদি অসহ্য লাগে আপনি উঠে যান—কিছু মনে কর্‌ব না।

এই সময়ে নগেন্দ্র ঘরে আসিয়া বলিলেন—Another half an hour! Sufferer have patience—'

মায়া বলিল—ছোট মামা, ওটা কি auto-suggestion?—না সর্ব্বসাধারণের জন্যেই—'

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—প্রথমটাই বটে, তবে general ভাবে ওটার প্রয়োগ কর্‌লাম। মোট কথা হচ্ছে আরো আধ ঘণ্টা দেরী; তার আগে খাওয়া হবে না। যতই ভাব আর যতই ক্ষিদে পা'ক! Isn't it awful?—ডাক্তার-সাহেব নিশ্চয় এতক্ষণ বিছানা নিয়েছেন? ঃ মায়া, বুড়ো হ'লে যে কি ক্ষিদে পায় তা কি বল্‌ব!—'

নগেন্দ্র হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

বিমল তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এই ঘরে আছে অথচ কোন প্রকারেই কাহারও সহিত সহজ ভাবে মিশিতে পারে নাই। দীপ্তি চিরদিনই তাহার সহিত একটা ভদ্রতা এবং বিনয়ের আড়াল রাখিয়া চলে, সে আড়াল অত্যন্ত মার্জ্জিত তাই দীপ্তির সহিত তাহার তেমন মিল নাই। মায়াই কেবল সহজ ভাবে তাহার সহিত কথা বলে কিন্তু সেও আজ ব্যস্ত।

এই 'ব্যস্ত' কথাটি তাহাকে একটু বেদনা দিতেছিল। হঠাৎ তাহার পিছনে কে বলিয়া উঠিল—কি বিমল বাবু, কবিত্ব কর্‌ছেন? কিন্তু ওটা চাঁদের আলো নয়।

বিমল পিছনে ফিরিয়া দেখিল মায়া!—হাসিয়া বলিল—কবিত্ব? চাঁদের আলো? জানেনই ত আমি কবি নই, আমার মন একেবারে গন্ধে-ভরা!

মায়া। কবিত্ব মানে কি ছন্দ আর কথার মিল রাখাই—আপনার লেখাগুলো—'

বিমল। Rubbish, কিন্তু কি করব? আমার দোষ নেই। যা মনে আসে লিখি, কবে থেকেই ত বল্‌ছি আপনাকে, আমায় সাহায্য করুন। আমার মনে হয় আপনি যদি হাতে তুলে নেন এ কাজটা, আমার অনেকখানি ময়লা কেটে যাবে, হয় ত এমন জিনিষ রেখে যেতে পারব—'

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিল, সে চাহনির মধ্যে তাহার অন্তরের দৈন্য আজ মায়ার চোখের সামনে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিমল বলিল—আমার চাওয়াটা কি খুব বেশী? আমার জীবন যদি আপনার হাতে দিয়ে সুন্দর হ'য়ে ওঠে—স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর্‌লাম কি? অপমান কর্‌লাম আপনাকে, ঐ যে আপনার মুখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল!—আমি কি চলে যাব এখান থেকে—'

মায়া তাহার আঁচলের প্রান্ত দিয়া একবার তাহার মুখখানি মুছিল, তাহাতে তাহার গালে যেন আরো খানিকটা রঙ্ লাগিয়া গেল।

একটা কালো কি পোকা বিমলের জামায় বসিয়াছিল, তাহার উপর চোখ পড়াতে মায়া সেটাকে হাত দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—ওসব কেন ভাব্‌ছেন বিমল বাবু? মানুষ মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য হলেও আজ চার বছরে আপনার যা পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে ওসব কথা ত আমার মনে আস্‌ছে না।

বিমল আশ্বস্ত হইয়া বলিল—বাঁচ্‌লাম,—এমন ভয় হয়েছিল ঐ কথাগুলো আপনাকে বলে!—আপনি জানেন না—আপনাকে দেখে পর্য্যন্ত যেন একটা নতুন জগৎ আমার চোখে খুলে গেছে—নিন্ আমাকে ফুটিয়ে তুলুন—'

মায়া ভিতরে বাহিরে কাঁপিয়া উঠিল!

কল্যাণী তখন মুনিকে কি-একটা ইংরাজী সুর বাজাইয়া শুনাইতেছে। মাঝে মাঝে সুরের ঝড় তুলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছে, হিন্দু-সঙ্গীতের সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের পার্থক্য মুনিকে বুঝাইতেছে এবং মুনি নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিতেছে।

ঘরের অন্য দিকে শান্তা, উমা, শ্রীশ, সুপ্রকাশ এবং কমলা জটলা পাকাইয়া কি যেন পরামর্শ করিতেছে এবং জীবন দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতেছে।

মায়া আর একবার বিমলের কাতর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর অনুভব করিল। এই মুহূর্ত্তগুলির বর্ণনা কথা দিয়া হয় না—মায়া তাহার বুকের স্পন্দন যেন এত গোলমালেও শুনিতে পাইল! কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তাহার পরই আবার মায়া, মায়া হইয়াই বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—নিলাম বিমল বাবু, আপনার সমস্ত কাজের মধ্যেই আপনি আমায় পাবেন—শুধু কাজে, কেমন?—'

'শুধু কাজে'!…বিমল যেন কিছু বুঝিতে পারিল না! শুধু কাজের মধ্যে সে মায়াকে পাইতে চায়?—' তাহার সমস্ত বুকখানি হাহাকার করিয়া উঠিল—না না,—আরো চাই—সবখানে পেতে চাই, তোমায় আমার সকল শূন্যতা তোমার স্পর্শ দিয়ে ভরিয়ে নিতে চাই—'

বিমলের চিন্তায় বাধা দিয়া মায়া হাসিয়া বলিল—তা'হলে এবার থেকে সব কাজে আমার পরামর্শ নিতে হবে আপনাকে, কারণ, আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—'

কিন্তু মায়ার কথা বিমল যেন শুনিতে পাইল না—তাহার মন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধু ঐ কথাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—'শুধু কাজে', 'শুধু কাজে'…

মায়া বলিল—মেয়েরা চিরকালই একটু অকাল-পক্ক। আমি আপনার চেয়ে ছোট হ'য়েও আপনার দিদি হ'য়ে খুব আপনার ওপর সর্দ্দারি করতে পারব।—শ্রীশ-দা ছাড়া আমার আর একটাও ভাই নেই, আর ও ত Public property, ওকে ত পাবার জো নেই—ওর 'ওয়ারিসান' অনেক। আপনাকে আমার ভাই বানাতে পারলে খুব মজা হবে।

বিমল চুপ করিয়া মায়ার কথা শুনিয়া যাইতেছিল, সে শোনার মধ্যে তাহার একান্ত ধৈর্য্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে যেন

তাহার জীবন কি ভাবে কাটিবে তাহারই কথা মায়ার মুখে শুনিতেছিল। তাহার এত দিনের প্রিয় 'স্বপ্নের' সহিত ঐ কথার যে পার্থক্য ছিল তাহা ভাবিয়া বেদনায় তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

মায়া বিমলকে জানিত এবং বহুদিন হইতেই তাহার প্রতি বিমলের একটা পূজার ভাব সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এখন বিমলের এই অসহায় ভাবটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিল—তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য হাসিয়া বলিল—কি, মুখখানা যে অত গম্ভীর ক'রে রইলেন?—সাহস হচ্ছে না বুঝি—Nothing is too late to mend—এখনও আপনি ফিরিয়ে নিতে পারেন আপনার কথা—'

বিমল বলিল—না, ঐ ঢের, আমার আশার অতীতই পেলাম—শুধু কাজে—যেটুকু পাব আপনাকে—'

তাহার কথা শেষ হইল না, চোখ দুটি জ্বালা করিয়া আসিল; সে তাড়াতাড়ি বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

মায়া বলিল—কাল সকালেই ত আমি চলে যাব, আপনার লেখাগুলো তাহ'লে কি ক'রে পাব?

বিমল। আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু আপনার পরীক্ষাও যে এগিয়ে এল—'

মায়া হাসিয়া বলিল—আমি কোন কালেই ভাল মেয়ে নই জানেন ত? তাই পরীক্ষার পূর্ব্বের কয়েক মাস পড়বার জন্যে ফেলে রেখে বোকাদের মত সমস্ত বছরটা ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে কাটিয়েছি। আপনার লেখা পড়্‌লে আমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না।—এখন চলুন—আমার ছোট ভাইটিকে দেখিয়ে আনি।

বিমল। না—না—থাক্‌।

মায়া। এ্যাঁ আমার অবাধ্য হচ্ছেন—ছিঃ,—হ'তে নেই—সব সময় বড়দের কথা শুনতে হয়, আসুন—'

বিমল। না, এটা নিয়ে সকলের কাছে ঢাক পেটাতে চাই না। এ সম্বন্ধটা লুকানোই থাক আপনার আমার মধ্যে।

মায়া রাজী হইল।

করুণা আসিয়া বলিলেন—তোমরা এস—বড় দেরী হ'য়ে গেছে বোধ হয়—

সকলে উঠিয়া খাইবার ঘরের দিকে চলিল। মায়া বিমলকে বলিল—আপনার বড্ড 'এ খাই না ও খাই না' আছে, আজ থেকে আমার কাছে আর ওসব চল্‌বে না, যা দেবো তাই খেতে হবে, কেমন?—'

বিমল। আচ্ছা—কিন্তু—'

মায়া। চুপ, কোন 'কিন্তু' নেই এর মধ্যে,—যা দেবো চাঁদ-পানা মুখ ক'রে তাই খেতে হবে।

বিমল অনুযোগের স্বরে বলিল—what a tyrant you are!

মায়া জয়ের গর্ব্বে পুলকিত হইয়া বিমলের পাশে পাশে চলিল।

* * * *

বড় বড় দুইখানি টেবিল একসঙ্গে করিয়া সাদা চাদর বিছাইয়া তাহারই উপর সকলের খাবার সাজান রহিয়াছে—সমস্তই কাঁচের বাসন। গ্লাসে ছোট ছোট বরফের কুচি ভাসিতেছে, টেবিলের মাঝখানে একটা গোলাপদানে খুব বড় আধফোটা 'মার্শ্যাল নীল্' সাজান রহিয়াছে।

নগেন্দ্র বলিলেন—এও ত বড় মুশ্‌কিল ছোড়্-দি, কার কোন্‌টা—'যে দিকে ফিরাই আঁখি জুড়ায় নয়ন!'

করুণা। যেখানে খুশী ব'স, কোনটিতেই বেশী পক্ষপাত করা হয় নি, সুতরাং তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। অ শ্রীশ, নে ওঁদের বসা, সবাই দাঁড়িয়ে রইলেন যে!—

সকলে বসিলে শান্তা বলিল—দেখ করুণা-মাসি, তোমাকে কিছু করতে দেবো না, আমরা পরিবেষণ করব।

করুণা হাসিয়া বলিলেন—ওরে আমার কাজের মেয়ে, এতক্ষণ ত চুলের টিকি দেখা যায় নি কারো—'

শান্তা। তা ডাকলেই পারতে কিন্তু এঁদের দেখে ত মনে হচ্ছে না এঁরা পরিবেষণের বিশেষ পক্ষপাতী। যা দিয়েছ তাই শেষ করতে পারলে হয়।

সুবর্ণ এতক্ষণ উপরের একটি ঘরে কি কাজ লইয়া বসিয়াছিলেন, অল্পক্ষণ হইল তিনি নামিয়া আসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সকলের খাওয়া দেখিতেছিলেন। তিনি সকলে যাহাতে শুনিতে পায় এমন ভাবে বীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—আচ্ছা এঁদের এ-রকম ক'রে খেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?—

কথাগুলি সকলেই শুনিল, মুনি বলিল—না, অসুবিধে কিছুই হচ্ছে না, যদিও আমরা মাটিতে ব'সেই খাই সব দিন—'

সুবর্ণ তাহাদের খাওয়ার মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে তিনি ঘৃণা করিয়া মনে কিছু শান্তি পাইতে পারেন।

বিকাশ চিরকালই সাহেব মানুষ, এই কয়েক মাস মাত্র স্বদে[illegible] তাড়ায় সে বাঙালী হইয়াছে এবং আজও বাঙলা লিখিতে হইলে তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। সে এমনভাবে হাতের কয়টি আঙ্গুল দিয়া ভাত মাখিতে লাগিল যে, সুবর্ণও বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—মায়া, এঁরা তোমাদের guests, কিন্তু বাড়িটা আমার! এঁরা যে ভাবে খাচ্ছেন তাতে মনে হয় এখান থেকে বেরিয়েই দোকানে খাবার কিনে খাবেন।

মায়া, জীবন এবং বিমলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া নগেন্দ্র বলিলেন—মায়া দুটি অসভ্য দেশের সীমানার মত বিরাজ কর্‌ছে। ঐ দুটি অসভ্য বর্ব্বর দেশ যদি কোন দিন একতা-সূত্রে বাঁধা পড়ে তাহ'লে ওদের দিয়ে জগতের অনেক উপকার হবে। জীবন আর বিমল 'ভিটের মাটি' চ'ষে যে স্বর্ণ-শস্য ফলাবেন তাতে অনেকের পেট ভর্‌বার আশা আছে—'

মুনি তাহার জলের গ্লাসটা খালি করিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাইল। কল্যাণী হাসিয়া বলিল—কিন্তু ওটা এখন খালিই থাক্‌বে, ভর্‌বার আশা নেই—'

দীপ্তি বিকাশকে ধরিয়াছে—না ওটা খেতেই হবে, ফেলা হবে না,—রান্না কি ভাল হয় নি?—'

বিকাশ আর খেতে পারি না, বড় খাওয়া হয়েছে, বলিয়া দীপ্তির নিকট হইতে মিষ্টি রাগের চাহনি আদায় করিয়া লইতেছিল।

উমা এবং কমলা তাহাদের শ্রীশ-দা'কে লইয়া পড়িয়াছে। দুইজনে দুই পাশে দাঁড়াইয়া অনুযোগ তুলিতেছে, বকিতেছে, আর কথা ন কহিবার ভয় দেখাইতেছে—সব চেটে-পুটে না খেলে আমাদের হা আজ তোমার নিস্তার নেই শ্রীশ-দা—'

শ্রীশ ভয়ে ভয়ে একবগ্‌গা ঘোড়ার মত ঘাড় কাত করিয়া চলিয়াছে। নগেন্দ্র বলিলেন—কি শ্রীশ, তুমি জমি ভরা নাকি?—'

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—কতকটা তাই বটে, দেখ্‌ছেন ত দুপাশে দুই বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে—প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সাঁটছি!

কিন্তু সুপ্রকাশকে লইয়া শান্তার কোনই গোল হয় নাই। সে বেশ ধীরে-সুস্থে একটির পর একটি ডিস্ খালি করিয়া যাইতেছিল—দু-একটা চাহিয়াও লইল। রান্নার তারিফ করিল এবং তাহারই সঙ্গে শান্তার সহিত সহস্র বিষয়ে অজস্র বকিয়া যাইতে লাগিল।

মুনি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—বিকাশ, সাবধান, জীবন হাতের আস্তিন গুটিয়েছে।

বিকাশ। মজাবে দেখ্‌ছি, ওর বোধ হয় মুখ খুলে গেছে!

মায়া প্রতিবাদ করিল—কল্যাণী তোমার ward কেন আমার ward-এর বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌ছেন? বারণ ক'রে দাও—'

এইভাবে হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি অপরিচিত মানুষ এমন সুন্দর ভাবে পরস্পরের মনে রেখাপাত করিয়া দিল যাহা অনেক সময়ে বহু পুরাতন বন্ধুদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে যখন আবার বসিবার ঘরে চলিয়া গেল এবং চাকর টেবিল পরিষ্কার করিয়া দিলে করুণা, সুবর্ণ এবং মেয়েদের লইয়া খাইতে বসিলেন। সুবর্ণ মায়াকে বলিলেন—ওরই নাম সুপ্রকাশ? বেশ দেখ্‌তে ছেলেটিকে ত? কথাগুলিও মিষ্টি, সবগুলিই বেশ সভ্য-ভব্য, যাহা বল ঐ ছেলেটি, বাবা যেন নাক কথা কয়, চোখ কথা কয়—ওর মুনি না?

কল্যাণী বলিল—হাঁ।

তাড়ায়

মাথায়

দিয়া

গেলেন

—১০—

বিকাশ, মুনি, বিমল, জীবন প্রভৃতি আবার যখন জটলা পাকাইয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল, নগেন্দ্রনাথ বাহিরের একটা ক্যাম্প চেয়ারে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাহার পর বেশ নিরেট করিয়া পাইপটি সাজিয়া টানিতে টানিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ার রাজ্যে উধাও হইয়া গেলেন।

আহারের পর কথা বলা নগেন্দ্রনাথের মতে নিষিদ্ধ। যদিও তিনি ডাক্তার নন, তবু শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শরীরের উপর তাঁহার যথার্থ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে। রসনা দেবী এবং শ্রীজঠরের জন্য তিনি অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। বৈরাগীদের উপর তিনি হাড়ে-চটা। তাঁহাকে দার্শনিক মনে করিলে ভুল হইবে, তিনি একজন প্রচণ্ড 'মেটিরিয়ালিষ্ট'।

তিনি কবে 'স্বরসাধনা' করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার ত্রিধা-বিভক্ত স্বরে গান করেন :—

সংসারটা ফাঁকি রে
যেন ভোজের বাজী!
জীবাত্মাটা পাখীরে,
উড়ে পালায় পাজী!
জমিয়ে টাকা ব্যাঙ্ক' এ
ফেলে যাবে পিছে
সঙ্গে তাকে নেন কে?
তবেই ওসব মিছে,

man

অতএব ভোজনেই
ভাল ক'রে লাগ।
মেজাজখানার ওজনেই
ঘুমাও এবং জাগো।

তখন সে সুরলহরীর কাছে পরাস্ত মানে না এমন শব্দ বোধ হয় জগতে নাই।

আফিস হইতে ফিরিবার সময় গঙ্গার ইলিসের কান্‌কোয় আঙ্গুল দিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে তিনি বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কেহ দাম জিজ্ঞাসা করিলে উৎসাহের সহিত বলেন; এবং এটা যে খুব সস্তায় তিনি পাইয়াছেন তাহাও তিনি বলিতে ভুলেন না, এবং তাঁহার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি যে কত প্রবল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি ফুটপাথের ভিড় ঠেলিয়া প্রায় এক শত তপ্‌সে মাছের শুঁড় ধরিয়া লইয়া যান। সস্তায় কিছু কিনিবার জন্য যাওয়া-আসা করিতে তাঁহাকে যে গাড়ী-ভাড়া দিতে হয় তাহার হিসাব লইলে একটি ছোট-খাট গৃহস্থ-পরিবারের ভরণ-পোষণ হয়।

একদিন এক ডেঁপো ছেলে-মেয়েদের আড্ডায় খাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন—দেখ জিভ দিয়ে আমরা যে-সব জিনিষ খাই তাতে আমাদের পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। মন না ভর্‌লে, পেট ভরাটা একেবারেই বাজে হয়ে যায়। মন ভরাবার জন্যেও কিছু খাওয়ার দরকার। বহুদিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি আবিষ্কার করেছি, মন ভরাবার জন্যে আমাদের যা খেতে হবে, তা জিভ দিয়ে নয়। জিভের importance এখানে ততটা নেই, যতটা ঠোঁটের আছে। মন ভরাবার খাওয়ার জন্যে ঠোঁটই আমাদের এক মাত্র গতি। আমার আঠার বছর বয়েস থেকে পরীক্ষা আরম্ভ

এই বিয়াল্লিশ বছর বয়েসের মধ্যে মাত্র দুটি মন ভরাবার খাবার আমি আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছি। আমার progress অত্যন্ত slow হ'তে পারে কিন্তু আপামর সকলকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, চুমা আর চুরুট জীবন-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ দুটিই ঠোঁটের খাওয়া এবং উচ্চাঙ্গের খাওয়াও বটে।

—ও জিনিষ খাওয়ার সময় আমাদের পাকস্থলী ভারাক্রান্ত হয় না এবং মগজের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ব'লেই চুমা এবং চুরুট অমন মশ্‌গুল হয়ে খাওয়া যায়। এ আমার শোনা কথা নয়, আমার practical experience থেকেই বল্‌ছি।

ঐ দুটি খাওয়া সম্বন্ধে কেহ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। বিশেষ করিয়া তিনি চুরুটের নিন্দা একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। একদিন তাঁহার স্ত্রী নিরুপমা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—আচ্ছা, ঐ ছাই খেয়ে তোমার কি হয়?

নগেন্দ্র মুখ হইতে একরাশ ধোঁয়া বাহির করিয়া অত্যন্ত উদাস ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

Woman is a woman after all,
But a cigar is a smoke!

—দেখ নিরু, আমি দুটো জিনিষ young man-দের খেতে prescribe করি। প্রথমটা ত তুমি জানই, আর সেটা যে কত দরকারী, আর কত সুন্দর, আর কত মধুর আর তুমিও তা কত ভালবেসে খাও—'

নিরুপমা। আঃ থাম বল্‌ছি—তা থাক্ না তোমার young man-রা, কে তাদের বারণ করেছে?

নগেন্দ্র। সেই কথাই ত বল্‌ছি, সব সময় ত আর ওর-নাম-কি, তা জোটে না, চুরি ক'রে বা জোর ক'রে খেলে আবার damage দিতেও হয়—'

নিরুপমা। তাই ঐ ছাই খেতে হবে?

নগেন্দ্র। ছাই নয় নিরু,—ধোঁয়া, খুব nerve-soothing—যখন ওর-নাম-কি তা জোটে না তখন একটি টান্, ব্যস্! তবে আমি স্বীকার কর্‌ছি এর মধ্যে একটু স্বার্থপরতা আছে। সুখে সম্পদে ভোগে তোমাকে অতিক্রম কর্‌ব না ব'লে একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাই ব'লে তোমাকে যে পাইপ কিম্বা গুড়্‌গুড়ির নলটি এগিয়ে দেবো তা স্বপ্নেও ভেবো না।

নগেন্দ্রনাথ কবি কি না তাহা এতদিন কেহ ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তাঁহার বাহিরে অ-কবির মত অনেক কিছু ছিল। কিন্তু এক দিন তাঁহার আট বছরের ছোট ছেলে প্রসূন মা'র গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া একঘর লোকের সাম্‌নে বলিয়াছিলঃ—

আঁখি যদি আজ করে অপরাধ হে নিরুপমা, করিও ক্ষমা—'

সকলেই নিরুপমাকে চাপিয়া ধরিলেন—এর মানে কি?

নিরুপমা আরক্ত মুখে বলিলেন—কি ক'রে জান্‌ব? বোধ হয় কোথাও শুনেছে। আর কবিতা মুখস্থ করা ওর যেন একটা রোগ।'

প্রসূন মাতার ভ্রম-সংশোধন করিয়া বীরেন্দ্রনাথকে বলিল—না পিসেমশাই, বাবা মাকে রোজ রোজ বলে—'

বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিরুপমার দিকে তাকাইয়া দুষ্টামি করিয়া হাসিয়া বলিলেন—আর কি বলে, বল ত বাবা।

প্রসূন মহা উৎসাহে বলিল—আর একটা—

নিরুপমা বলিয়া উঠিলেন—থাম্ দুষ্টু ছেলে—'

কিন্তু দুষ্টু ছেলে তখন পিসেমশায়ের কোলে বসিয়া আছে কাহাকেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, সে বলিল—এই বাবা বল্‌ছিল ;—

একদা তুমি প্রিয়ে, আমারই এ তরুমূলে,
বসেছ ফুল-সাজে সে-কথা কি গেছ ভুলে ?

সকলে হাসিয়া উঠিল। বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—আর মা কি বলেন ?

নিরুপমার সকল ভয়-প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রসূন বলিল—মা কিছু বলে নি পিসেমশাই, খালি খালি কাঁদ্‌ছিল—'

নিরুপমা সকলের হাসির ধাক্কায় অস্থির হইয়া বলিলেন—উনিই ত ও-সব ওকে শেখান, যা ছেলে হচ্ছে দিন দিন—'

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—ছেলে ঠিকই হচ্ছে, তবে আমাদের একটু সমজে চল্‌তে হবে এবার থেকে—'

বাহিরের ক্যাম্প চেয়ার হইতে নগেন্দ্রনাথের বিপুল নাসিকা-ধ্বনি আসিতেই মুনি বলিল—ও বাবা, there must be a wind-mill near-by—

জীবন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—হুঁ।

মুনি। অমন ক'রে হুঁ বল্‌বার মানে ?

জীবন। কি মুশ্‌কিল! আমার কি কথা বল্‌বারও অধিকার নেই ?

মুনি। না, তোমার ঐ হুঁ-টায় কেমন একটা অর্থ লুকান আছে। যেন—'

জীবন। যেন কি ?

মুনি। যেন আমার কথা সত্যি নয়।

জীবন। হুঁ।

যে-কোন কারণেই হোক সকলের কথা কহিবার ইচ্ছা এবং উৎসাহ যেন কমিয়া আসিতেছিল। খাইবার ঘরে তখন সকলের উচ্চ হাসির সহিত গ্লাস বা কোন বাসন টেবিলে রাখার জন্য যে শব্দ শোনা যাইতেছিল তাহারই প্রতি সকলের মন যেন পড়িয়া রহিয়াছে।

জীবন এবং বিমল সকলের অপেক্ষা বেশী গম্ভীর, দুজনেরই মুখ একটু বেশী চিন্তা-ক্লিষ্ট এবং মধ্যে মধ্যে তাহারা পরস্পরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইতেছে, যেন কোন এক বিপুল রহস্যের সন্ধান তাহারা পরস্পরের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে!

সুপ্রকাশ একা বসিয়া একখানা Cinema Show লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতেছিল। মুনি এবং বিকাশ ফটো এলবাম লইয়া ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল।

বিকাশ একখানি ছবি লইয়া মুনিকে বলিল—আচ্ছা তুই ত Physiognomy-র student, বল্ ত এই মুখখানিতে কি আছে?

মুনি। যা আছে থাক, পাতা ওল্টাও।

বিকাশ। দেখ্ একবার ভাল করে!—'

মুনি। ছবিতে আর কি দেখ্‌ব, জল-জ্যান্ত মানুষকেই দেখ্‌লাম—কি disappointing!

বিকাশ। Disappointing! তার মানে?

মুনি। যার চোখের দৃষ্টির ছোঁয়া গায়ে লাগ্‌লে মনে হয় যেন জুড়িয়ে গেল, তারই ঐ ঠোঁট!

বিকাশ। কি, বিশ্রী বল্‌তে চাস্?

মুনি। দূর্, তা নয়; ওর চোখের মধ্যে আছে মরীচিকার স্বপ্ন-স্নিগ্ধতা কিন্তু ঠোঁটে আছে মরুভূমির নিদারুণ কঠোর শুষ্কতা, ওখানে অনেক জানোয়ার প্রাণ খোয়াবে ভাই!

বিকাশ। দেখ্‌লে কেমন একটা বিস্ময় লাগে না রে?

মুনি। বিস্ময়?—আমার ত আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায়। ও যে মায়া, সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। I am sorry for the person who falls under the clutches of this enchantress.

বিকাশ হাসিয়া পাতা উল্টাইয়া আর একখানি ছবি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মুনিকে বলিল—আর এটা—'

মুনি। ও তুই দেখ্।

মুনির এই উদাসীনতায় বিরক্ত হইয়া বিকাশ বলিল—আর একখানি এমন মুখ দেখেছিস্ জগতে?

মুনি। না, তা দেখি নি, কি ক'রে দেখ্‌ব? কিন্তু ও এ পৃথিবীর মেয়ে নয়।

বিকাশ। অর্থাৎ?

মুনি। তোর কি মনে হয় ও বেঁচে আছে? অন্তত ওর দেহ-মনের যে কোন একটা আজও ঘুমিয়ে আছে, আর তার ঘুম ভাঙ্গবে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে, কিন্তু যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন সর্ব্বনাশ।

বিকাশ। তার মানে?

মুনি। তোর সঙ্গে অত বক্‌তে পারি না। তবে ওর দীপ্তি নামটা একেবারে মিথ্যে হ'য়ে গেছে। স্বপ্নলেখা বা চিত্রলেখা হ'লে মানাত।

বিকাশ। তুই কিছু জানিস্ না মুনি, তুই একে বল্‌লি ঘুমিয়ে াছে? আমার কি মনে হয় জানিস্?

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি'
আপন চরণপ্রান্তে, তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে
স্তবে তব নাহি কান।...

মুনি হাসিয়া বলিল—তাই ত বল্‌লাম তুই দেখ্, sleeping eauty তোর ভাল লাগে। দে ওতে আর কি [illegible] আছে দখি।

মুনি বিকাশের হাত হইতে এলবামটি লইয়া পাতা উল্টাইতে ল্টাইতে একটি group হইতে একটি মুখ বাহির করিয়া বিকাশের চাখের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—দেখ্—আর কোন সন্দেহ থাক্‌বে না য় ও কল্যাণী। ইচ্ছে কর্‌ছে, তোর মত একটা কবিতা একে edicate করি। বলিয়া যে-স্বরে ছেলে-ভুলান ছড়া মানুষ বলে তমনি করিয়া মুনি বলিতে লাগিল:—

টেঁপো টোপাটি
তুমি দোপাটি
তোফা খোঁপাটি
বাঃ!

বাঁকান শুঁটি
বিনুনী দুটি
না হয় ঝুঁটি
হাঁ।

ও কি লাগালে!

টেবো দুগালে?

চাঁদাকপালে

চি—

পিপি ধ'র না

তুমি যে সোনা

কথা শোন না?

ছি!

ঘরের মধ্যে একটা বিপুল হাসির তরঙ্গ উঠিল! জীবন তাহার গাম্ভীর্য্য ফেলিয়া বলিল—কিরে, হঠাৎ তুই ছেলে-ভুলানো ছড়া আরম্ভ কর্‌লি যে?

মুনি। কি আর করি? যখন যাওয়া হয় নি তখন একটা উদ্দেশ্য ছিল থাক্‌বার। এখন ত তা চুকে-বুকে গেছে, ওঁরা এলেই বলা যাক, কি বলিস্—অনেক বিরক্ত কর্‌লাম আপনাদের এবার তাহ'লে—'

দরজার পর্দ্দার নীচে কতকগুলি পা দেখিতে পাইয়া মুনি অত্যন্ত শান্ত ছেলেটির মত চুপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

করুণা, মায়া প্রভৃতির সহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—থাক্ ওটা আর বল্‌তে হবে না। এখন তোমাদের যাওয়া হ'তেই পারে না। বাইরে ভয়ানক রোদ, যেন আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে! পাখাটা ভাল ক'রে খুলে দাও না—বলিয়া তিনি নিজেই 'রেগুলেটার' ঘুরাইয়া দিলেন। তাহার পর সকলের নিকট হইতে, তাহাদের প্রতিদিনের কাজের কথা, লেখা-পড়ার কথা প্রভৃতি সব জানিয়া লইলেন। তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই মুনি একা দিতেছিল।

জীবনের কথা উঠিলে মুনি বলিল—জানেন মিসেস্ মিত্র, জীবন হচ্ছে পদ্মা-পারের জমিদার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, আর থাক্‌বে না-ই বা কেন? জানেন ত কথায় আছে:—

পদ্মা-পার্য্যা রায়ত'গ
লাঠি হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরায়্যা
ভাত মাখেন পাতে!
মাখা ভাতটি না ফুরাতো
ভাইঙ্গা পরে গর;
সান্‌কির ভাত কোছে ভৈর্য্যা
খুজেন আর এক চর!

মুনি নিজে পদ্মা-পারের মানুষ নয় এবং তাহার কথাও পূর্ব্ববঙ্গীয়দের মত নয়, সেই জন্য তাহার কথাগুলি শুনিয়া সকলের বেশী হাসি পাইতেছিল। কল্যাণী কিছু অধিক হাসে। তাহার একবার হাসি পাইলে আর যেন থামে না, মুনির কথা বলিবার ভঙ্গিতে সে কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না!

জীবনও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—আর জানেন মিসেস্ মিত্র, আমরা মুনিদের কি বলি?

কল্যাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—একটু থামুন, আমার এখনও সব হাসিটা হাসা হয় নি—'

কিন্তু জীবন থামিল না। সে তাহার খাস বিক্রমপুরীতে বলিতে লাগিল:—

টান-দেশী গিরস্তগ ?
বাপকাল্যান্থা ঘাটি,
আটুজলে ডুব দেন আর
বুকে ঠেকে মাটি।

আপনি পাও মেইলা বৈস্যা
উক্কায় মারেন টান,
এক পহরের পথ ভাইঙ্গা বউ
জল আন্‌বার যান !

করুণা দুই জনকেই সমান ক্ষমতাশালী বলিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিলেন। তাহার পর বিকাশের কথা উঠিলে মুনি বলিল—এমন আশ্চর্য্য কথা শুনেছেন মিসেস্ মিত্র ? ওদের দেশ হ'ল কলকাতা ! আর ওর বাবা ছাড়া ওদের বংশের সবাই এইখানেই বাস ক'রে গেছেন ! আর এই নিয়ে আবার ও গর্ব্ব করে ! কিন্তু ওটা লজ্জার কথা নয় মিসেস্ মিত্র ? আমি হ'লে অন্তত গঙ্গার ওপারে একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে বল্‌তাম, ওটা আমার দেশ।

বিকাশকে আমরা বলি 'মিস্ বোস'। ভিখিরী দেখ্‌লে ওর দুঃখ হয় ! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান যদি গরুকে মারে, ও কেঁদে ফেলে ! চাকরে চুরি ক'রে ওকে ফতুর ক'রে দিলেও তাদের একটা কথা বল্‌তে ওর লজ্জা করে। তারপর অসুখ হ'লে মাথার চুলে আমাদের 'বিলি' কাটা, ওষুধ না খেলে বকা, রাতে জেগে সেবা করা, আর একটুতে অভিমান করা—'

বিকাশ বলিল—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, এবার তোমার পরিচয়টাও এই সঙ্গে দিয়ে ফেল।

মুনি বলিল—এত কথা বল্‌বার পর আমার পরিচয় ওঁর কাছে লুকান নেই। মিসেস্ মিত্র, আমি মায়ের দস্যি-ছেলে।

করুণা হাসিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—এই দস্যি-ছেলের মা-টিকে দেখ্‌বার আমার বিশেষ আগ্রহ রইল।

মুনি বলিল—বাবার কোর্ট বন্ধ হলেই মা সম্বলপুর থেকে এখানে চলে আস্‌বেন, কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি পেয়ে আমি এমন ভয় পেয়েছি মিসেস্ মিত্র, কি বল্‌ব! তিনি লিখেছেন—আমাদের খালপার রোডের বাড়ীর ভাড়াটেদের উঠে যাবার জন্যে নোটিস দেওয়া হয়েছে, তারা গেলেই আমরা সবাই সেখানে গিয়ে থাক্‌ব। আর তুই কত কাল একা একা থাক্‌বি? আমার আর মোটেই ইচ্ছে নয় যে, তুই একা থাকিস্—' এই সব কথা মিসেস্ মিত্র!

করুণা। তা এতে ভয়ের কথা কি আছে?

মুনি। ভয় নয়?—আমি আজ প্রায় ছ'বছর ত এমনি রয়েছি বিকাশ আর জীবনের সঙ্গে, আজ হঠাৎ আমার জন্যে বাড়ীর ভাড়াটে ওঠান হ'ল! নিশ্চয় কিছু মৎলব আছে।

ঝাল চাট্‌নি দেখিলে যেমন একটা লোভের চাহনি স্বভাবতই মেয়েদের চোখে ফুটিয়া উঠে ঠিক সেই ভাবে কল্যাণী মুনিকে এতক্ষণ দেখিতেছিল। সে উমার কানে কানে বলিল—উঃ কি দুষ্টু ছেলে রে, না ভাই?—

* * * *

সকলের সমবেত কোলাহল হইতে দূরে চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বিমলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মায়া তাহার পাশে বসিয়া বলিল—আপনাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে বিমলবাবু, শরীর কি ভাল নেই?

কত রকমের plan হ'ল কিন্তু একটাও টি'কল না—village propaganda works-এর মত। যত দিন শুধু একটা হুজুক বা enthusiasm মনে থাকে ততদিনই চেষ্টা, তারপর সেটা কেটে গেলে সব পরিষ্কার। ছেলেরা দেখি আজকাল অনবরত সুর ক'রে কান্না তুল্ছে—'মেয়েদের চাই, তাদের নইলে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হবে না'—ঐ কথাটার মধ্যে বেশ একটা নেশা আছে তা স্বীকার করি, কিন্তু নেশাটা নেশাই—প্রেরণা নয়, কারণ তার সম্বন্ধটা হচ্ছে মাদকতাকে নিয়ে। কাজেই এখানে সত্যি যেটা, সেটাই থাকে, অর্থাৎ মেয়েদের তারা পায়।

সুপ্রকাশ বিবর্ণ মুখে বলিল—তাহ'লে বল্তে চান, ছেলেদের এই আহ্বানের মধ্যে শুধু একটা স্বার্থই আছে, শুধু কামনা ?—

শান্তা হাসিয়া বলিল—কিন্তু সুপ্রকাশবাবু, ঐ স্বার্থ, ঐ কামনা জিনিষটাকে এত ছোট ক'রে দেখ্ছেন কেন ? এটা ত খুব স্বাভাবিক, তা ছাড়া এই যে আপনি আমাকে ডাক্ছেন—আমার কাজে সাহায্য করুন ব'লে, এর মধ্যে কি শুধু আপনি কাজকে পেতে চান, আমাকে নয় ?—তাহ'লে ত একজন চীনে মিস্ত্রী আমার জায়গায় বসালে আপনার কাজ বেশী পাবার সম্ভাবনা। সে আমার চেয়ে বেশী খাট্বে।—আমাদের সঙ্গটা ভাল লাগে বা ভাল বাসেন এই খাঁটি সত্যি কথাটাকে বেনামী ক'রে চালাতে চান কেন ?

সুপ্রকাশ। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়ে পুরুষ এবং নারীর যে সম্বন্ধটা গ'ড়ে ওঠে—

শান্তা। সেটা ভালবাসার চেয়ে সত্যিকার, এই ত ?—

সুপ্রকাশ। না, আমি বল্তে চাই, তার মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, অবস্থার বিভিন্নতাও এ সম্বন্ধটির পথ আগ্লে এসে দাঁড়াতে

পারে না। আর কাজের নেশা যতক্ষণ মনটাকে ছেয়ে থাকে ততক্ষ ছোট বড় ঐ রকমের কিছু ভাব্‌বার ফুর্‌সৎ থাকে না।

শান্তা। তা হ'লে কয়লার খনিতে নেবে ছেলেদের কাজ কর্‌ে বল্‌বেন—সেখানে তারা তাদের 'আইডিয়াল মেট্‌'-এর দেখা পে পারেন—সেখানকার মেয়েরা কেবল কাজকে নিয়েই আছে।

সুপ্রকাশ বড় বিপদে পড়িল—কি করা যায় এই মেয়েটিকে লইয়া তাহার ধারাল মনের কাছে যাহা আসে তাহাই টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া কাটিয়া যায়!

মুনি, কমলা ও উমা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই তর্ক শুনিতেছিল। শান্তার কথায় সুপ্রকাশের এই বিব্রত ভাবটি কল্যাণীর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া তুলিল এবং তাহা সুপ্রকাশের দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাহার সমস্ত বুদ্ধিকে জড়ো করিয়া লইয়া বলিল—কি জানেন মিস্‌ ব্যানার্জ্জী, আমি বল্‌তে চাই—পথ চল্‌বার সময় পথিক যখন জান্‌তে পারে, তার পাশে পাশে আর একটি মানুষ যে চলেছে, তার চল যেখানে গিয়ে থাম্‌বে সে নিজেও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পথে নেমেছে, তখন হ'তেই ঐ মানুষটি তার কাছে 'পথিক' মাত্রই থাকে না—সে হয় তার সহযাত্রী। কাজের মিলের মধ্যে যে সত্যটি লুকান থাকে, তাকেই বলি—প্রাণের মিল।

শান্তা। কিন্তু সামাজিক জীবনে এই ধরণের মিলটা যদি বড় ব'লে মনে না করি, দরকারী না ভাবি?—

সুপ্রকাশ। সমাজের চেয়ে এখানে মানুষ-বিশেষের দরকারটাই বড় নয় কি?—

শান্তা। আমি যদি পুরুষ হতাম তা হ'লে তাই ভাব্‌তাম, কিন্তু নারী ব'লেই বল্‌ছি—না; পুরুষের কাছে সমাজ থাকাও যা, না-থাকাও

তাই, ওতে তাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজটা হয়, আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

সুপ্রকাশ। তা হ'লে মানুষ-বিশেষের ওপর আপনার শ্রদ্ধা নেই?—

শান্তা। কিন্তু এতে আঘাত পেলেন কেন সুপ্রকাশবাবু? সমস্ত জগৎটা ত আর আপনার ছাঁচেই ঢালাই করা হয় নি। তাছাড়া আজ যে কাজকে আশ্রয় ক'রে একজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াব, কাল যদি দেখি সেই কাজেই সে শ্রান্ত, আমার ঠাঁই কোথায় থাকবে তখন?—

হঠাৎ একটা অশ্রদ্ধা-মিশান বিদ্রূপের হাসি সুপ্রকাশের মুখের সমস্ত শান্ত কোমল ভাবটিকে সরাইয়া খানিকটা জ্বালাভরা নিষ্ঠুরতা আনিয়া দিল! বলিল—আশ্রয়?—যে মানুষ-বিশেষকে অবিশ্বাস ক'রে আপনারা ঐ আশ্রয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন, সেই আশ্রয়ের ভিত্তির ওপর—তার নিয়মের বজ্র-কঠিন বেড়াগুলির ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসের দিকে তাকিয়ে কাঁদেন কেন?—ঐ মানুষ-বিশেষকে উদ্দেশ ক'রে আবার ব্যথার গান গা'ন কেন?—কাকে বলতে চান আশ্রয়?—কোথায় আশ্রয়?—জানেন আপনারা কি চান?—

অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত পাইলে মানুষের যেমন বুদ্ধি লোপ পায় ঠিক সেই ভাবে শান্তা কোন কথা না বলিয়া সুপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুপ্রকাশ বলিতে লাগিল—আপনাদের আশ্রয় নেই। তার কারণ, আপনাদের মধ্যে 'তৃপ্তি' ব'লে কিছু নেই। কিছুতেই তৃপ্তি হয় না আপনাদের। যখন বাইরে থাকেন তখন ঘরের জন্যে আপনাদের

পারেন্‌কাঁদে, যখন ঘরে থাকেন, তখন সমস্ত বাইরেটাকে ঘরে এনে পুরে ফেল্‌তে চান—তাই ঘরে আপনাদের মন বসে না।—বাইরে আপনাদের আশ্রয় নেই।

শান্তা চুপ করিয়া রহিল। তাহার কপালের এক পাশে একটুখানি রেখায় তাহার অন্তরের মধ্যে যে সংশয়ের আন্দোলন হইতেছে তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। সুপ্রকাশ তাহার স্বর অত্যন্ত কোমল করিয়া শান্তার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল—আমি দেখেছি দুটো জিনিস রাখা চলে না মিস্ ব্যানার্জ্জী, একটাকে ছাড়্‌তেই হবে।—তবে নিজের নিজের ড্রইং রুমগুলোকে বহির্জ্জগতের এক অংশ মনে ক'রে নির্ব্বাচিত কয়েকটি মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান ক'রে, স্বাধীনতার ছবি মনে এঁকে, একরকম ক'রে নির্ব্বিবাদে দিন কাটান যায়।

এতক্ষণ পরে শান্তার কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে বলিল—আপনার ঐ কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে সুপ্রকাশবাবু, আপনার আগেকার কথার সুরের থেকে এটা একটু আলাদা আর এ সুর আমার ভাল লাগ্‌ল না।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—না লাগ্‌বারই কথা। আমি সত্যিই ব্রাহ্ম-সমাজের স্বাধীনতার কথা মনে ক'রেই বলেছি। কিছুদিন থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের স্বাধীনতাটাকে একটা ভারি হাসির ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে আমার।

কমলা। মাফ্ করবেন এইখান থেকে আমি তর্কের মুখ একটু ঘুরিয়ে দিতে চাই—আমরা উপস্থিত মানুষ-বিশেষদের ... এই কথা বল্‌তে চাই, সাধারণ এখন থাক্।—আমি শান্তার কথাটাই আবার বল্‌ছি—আজ যে কাজকে আশ্রয় ক'রে একজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াব, কাল যদি দেখি সেই কাজেই সে শ্রান্ত?—

সুপ্রকাশ। ওটা ভালবাসাতেও হ'তে পারে। আর বোধাহয়, সব চেয়ে বেশী ক'রেই হয়।

কমলা। সেটাকে ভালবাসা বলে মানি না। ভালবাসা চিরদিন থেকে যায়।

সুপ্রকাশ। মনে হয় তাই বটে কিন্তু সত্যি তা নয়, ভালবাসার একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ু আছে এবং তা হচ্ছে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন মাত্র, তার এক মুহূর্ত্ত বেশী নয় বরং কম হ'তে পারে। কিন্তু যতদিন থাকে ততদিন নূতনই থাকে, পুরাতনের বাতাস ওর গায়ে লাগ্‌লেই একটি ম'রে যায়, আর বাকি যেটা থাকে সেটা মরে তার শোকে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—আপনার হেঁয়ালিটা একটু পরিষ্কার ক'রে দিতে পারেন না?

সুপ্রকাশ। হেঁয়ালি আমি করি নি মিস্ মজুমদার। আমি বল্‌ছি, তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ওর পরমায়ু। তার মানে এক নাগাড়ে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ভোগ করা যায় না।

কমলা। সারাজীবন ধ'রে ভালবাসার কথা তা হ'লে মিথ্যে?—

সুপ্রকাশ। না, কিন্তু মনে রাখ্‌বেন ও-ভালবাসার মধ্যে 'ভোগ' বা 'দেনা-পাওনা' নেই।—ব্যবসাদারী ভালবাসা, যেটার ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, তার কথাই আমি বল্‌ছি। Dante এবং Beatrice-কে দেখিয়ে যদি প্রমাণ দিতে চান, তা হ'লে বল্‌ব হিসেব ক'রে দেখুন—তাদের ভোগের দিনগুলো তিনশ পঁয়ষট্টিকে ছাড়িয়ে যায় নি। যেখানে বিচ্ছেদটা যত বেশী, ভালবাসা তত গভীর সেখানে। ব্যবসাটা বা ভোগটা যখন বড় হ'য়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই আমার মন থাকে আমার সুবিধের দিকে, এই আমার সুবিধের দিকে তাকিয়ে আপনার অসুবিধে দেখি না। ভালবাসাটা ভয়ানক sensitive, সে এ অপমান

সইতে পারে না—ম'রে যায়, কিন্তু ব্যবসাটা বজায় থাকে, কারণ, তার মান অপমান নেই।

সুপ্রকাশের এই তিক্ততা-ভরা কথার সুরে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শান্তা বলিল—আপনি কেন এত **morbid** ? মানুষের ওপর আপনার শ্রদ্ধা এত কম দেখে আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে—

সুপ্রকাশ সহজ সুরে হাসিয়া বলিল—ও কিছু নয়, আমি শুধু কথার উত্তরে কথা বল্‌ছি মাত্র, বিশ্বাস করুন।

কিন্তু শান্তার সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি বলিয়া দিল, সে সুপ্রকাশের এই কথা বিশ্বাস করিল না।

উমা পরম বিজ্ঞের মত কতকটা আপনার মনেই বলিল—আমি অত-শত বুঝি না বাপু—আমি বুঝি সততা।—যে যার কাছেই থাক্, বিশ্বস্ততা নিয়ে যেন আসে, আর সেটাই চিরকাল যেন বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা করে।

সুপ্রকাশ। আর ঐ বিশ্বস্ততা যদি একতরফা হয়?

উমা। সে দুঃখ এবং লজ্জা তার দেহ-মনের ভূষণ হ'য়ে থাক্‌বে।

কল্যাণী। বাবা বাবা! এরা সব বলে কি! সব এক সঙ্গে পাগল হ'য়ে গেল নাকি?—বাপু, তোমাদের ও হৃদ্‌রোগটা আমার কাছে চিরদিনই একটা হাসির ব্যাপার।

শান্তা। আমি যদিও ঠিক্ অতটা বল্‌তে চাই না, অতখানি আশা করাটা যে অন্যায় তা মানি।

সুপ্রকাশ। আপনার দিন বোধ হয় ভালই যাবে।

শান্তা। তা জানি না, তবে আমি যা পাব তা অশ্রদ্ধা করব না, সেটাই হয় ত আমার সব অশান্তির হাত এড়াবার সহায়তা করবে।

সুপ্রকাশ আবার সেই তিক্ত সুরে বলিল—কিন্তু এই অশান্তির হাত এড়ানোর কথা সম্বন্ধে আমার মনে হয়,—এই ধরণের জীবনকে শ্রদ্ধা ক'রেই নিন আর তাচ্ছিল্যই করুন—কান্নার হাত এড়ানো সহজ নয়—বুকের তলা থেকে গুম্‌রে উঠ্‌বে—'মাল্য যে দংশিছে হায়, তব শয্যা যে কণ্টক শয্যা—'

কল্যাণী অস্থির হইয়া বলিল—উঃ ছেলেদের মুখে এই রকম morbid sentiment সত্যি বল্‌ছি অসহ্য!

সুপ্রকাশ। হ'তে পারে। কিন্তু যে দৈন্যটাকে রং চং দিয়ে সাজিয়ে অন্যকে ফাঁকি দিতে চান আপনারা, আর নিজেদেরও দেন, আমরা সেই দৈন্য নিয়েই থাকৃতে ভালবাসি, তাতে আমাদের লজ্জা নেই।

কল্যাণী। রং চং! মানে আমাদের জীবনটা সবই এই?—

সুপ্রকাশ। আমি তাই বিশ্বাস কর্‌তে বাধ্য হয়েছি মিস মজুমদার—সবই এই। কেবল ফাঁকি আর ভণ্ডামি। তা ছাড়া ওটা একটা সভ্যতারই অঙ্গ। সমাজটা তখনই সভ্য হয়েছে ব'লে স্বীকার করি, যখন সব বিষয়ে ভণ্ডামি আর ফাঁকিতে সে নিজের যথার্থ ভাবটিকে চাপা দিতে শিখেছে।

কল্যাণী। আর সভ্যতা ব'লে যখন কিছুই ছিল না, তখন?—

সুপ্রকাশ। তখন আর যাই থাক্‌ মিস মজুমদার, ও দুটো ছিল না, যে অভাব মেটাবার উপায়গুলোকে আমরা পশুত্ব বলে ঠাট্টা করি, তা আধুনিক কালের তথাকথিত প্রেমের চেয়ে ঢের ভাল।

—তখন ছিল শক্তি বা প্রাণ বড়, এখন হয়েছে শব্দ বা কথা বড়; যে যত রকম ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে পারে, তারই জয়। এই বিনিয়ে বিনিয়ে কথার জাল-বোনার মধ্যেই নাকি মনুষ্যত্বের বিকাশ আছে।

ঠিক এই কথাগুলি ছেলেদের আড্ডায় ...াশ যদি বলিত তাহা হইলে তাহারা সুপ্রকাশের নামের সহিত bitter এই বিশেষণটি যোগ করিয়াই হয় ত ক্ষান্ত হইত, কিন্তু কল্যাণী হয় ত নারী বলিয়াই আরো কিছু ধরিয়া ফেলিল। তাহার ঠোঁট কামড়াইয়া হাসির অর্থ যদি সুপ্রকাশ পড়িতে পারিত তাহা হইলে দেখিত, উহাতে লেখা রহিয়াছে—Now I know where the shoe pinches! সে মুখে বলিল—কিন্তু এ-ভাবে ত তর্ক চল্‌তে পারে না। আমাদের তর্কটা ব্যক্তি-বিশেষ বা সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে কিছু অসাধারণ প্রমাণ কর্‌তে চাইছে।—তা ছাড়া এর মধ্যে personal experience-এর ঝাঁজ্‌টাও বেশী ব'লে মনে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেউ একজন umpire হওয়া চাই—শ্রীশ-দা, লক্ষ্মীটি ভাই, একটি কথা বল।—এ ত আচ্ছা ছেলে! রাগে না, তর্ক করে না!—না ভাই, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে খেল্‌ব না, তুমি উঠে যাও। দেখ্‌ছ না এখানে আমরা সবাই মিলে প্রমাণ কর্‌ছি—when unmarried people meet they talk of nothing else but love or marriage—তুমি এখানে অকালপক্কদের মত চুপ ক'রে থাক্‌বে কেন? Do talk some sort of nonsense please.—

মায়া এবং দীপ্তির দাদা হওয়ার অপরাধে শ্রীশকে ...ক মেয়েরই দাদা হইতে হইয়াছে, কিম্বা দাদা হইবার বিশেষত্বগুলা তাহার মধ্যে অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়াই সকলে তাহাকে দাদা ডাকিত এবং তাহারা শ্রীশের নিকট হইতে ছোট বোনের সমস্ত রকম প্রাপ্য আদায় করিয়া লইত। শ্রীশেরও এ বিষয়ে কার্পণ্য ছিল না। তাহার ছাত্র অবস্থায় এই সকল বোনদের সাবান, এসেন্স, চুলের কাঁটা, ব্রোচ, সুরমা প্রভৃতির জোগান দিতে অনেক সময় তাহাকে ট্রাম ভাড়া এবং টিফিনের পয়সা

বাঁচাইতে হইত। এবং ইহারই ভিতর দিয়া সে সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং আপনার হইয়া উঠিয়াছিল। কল্যাণীর কথা শুনিয়া শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি এমন 'হকচকিয়ে' গেছি যে, মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ…' কিন্তু প্রকাশ, তোমার কথাগুলোই একটু বেশী বেয়াড়া ব'লে মনে হচ্ছে। বড়বাজারে জিনিষ খরিদ কর্‌বার সময় আমার পকেট থেকে যদি টাকার থলিটা চুরি যায় তা হ'লে কি বুঝ্‌তে হবে যে, জগৎটা চোরের আড্ডা?—আমার ক্ষতিটা আমার কাছেই সত্যি হ'তে পারে কিন্তু সাধারণের কাছেও যে তাই হবে তার কি মানে আছে?—আর ঐ যে কথার ওপর তুমি 'শব্দ' বলে টিপ্পনি কাট্‌লে প্রকাশ, তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বল্‌তে চাই যে, তুমি কথা শোন নি। কথা যে কি, তা যদি বুঝ্‌তে, তা হ'লে ঐ-সব মত প্রকাশ কর্‌বার সময় বুক কেঁপে উঠ্‌ত। অত সহজে বিচার কর্‌তে পার্‌তে না। বিচারকের উঁচু আসন থেকে নেমে এসে দাঁড়াও,—সব সহজ হ'য়ে যাবে। যাকে ভাব্‌ছ ফাঁকি আর ভণ্ডামিতে ভরা, সেই ফাঁকি আর ভণ্ডামির আড়ালে আমাদের জন্যে কতখানি মঙ্গল যে সঞ্চিত আছে, তা একটু দরদ দিয়ে তোমার আসেপাশের মানুষদের দিকে তাকালেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

তাহাকে আর বলিতে হইল না। কমলা এবং উমা শ্রীশের দুপাশে বসিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—কে শীগ্‌গির বল—আমাদের আর দেরী সইছে না,—বল লক্ষ্মীটি—

শ্রীশ অবাক্ হইয়া বলিল—আরে কি হ'ল তোমাদের?—কি বল্‌ব?

কমলা। কেবা সেই জন? কার কথা শুনেছ তুমি? কেমন কথা তার?—খুব মিষ্টি?—

শ্রীশ দেখিল মহা বিপদ! কোথা হইতে ইহারা তাহাকে কোথায় লইয়া আসিল। পরের ঝগড়া থামাইতে গিয়া নিজের জন্য উকিল ডাকিতে হইবে নাকি?

এই সময়ে মুনি শ্রীশকে রক্ষা করিল। সে কল্যাণীর দিকে একবার তাকাইয়া মুখখানি অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট করিয়া বলিল—কথা বা শব্দ যে-রকমেরই হোক চুরি যে গেল সেটা ত ঠিক?—

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই ঠিক। যার চুরি যায়, তার চুরি যাওয়াই ঠিক।

মুনি। এ যুক্তিটা কেমন হ'ল?

কল্যাণী। বুঝলেন না? যার চুরি গেল সে বোকা, এটা প্রমাণ না হ'লেও যে চুরি করল, সে তার চেয়ে চালাক এটা প্রমাণ হয় ত?

মুনি মাথা চুলকাইয়া বলিল—কথাটা এখনও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না মিস্ মজুমদার,—ধরুন, আমি বোকা নই তবু আমার চুরি যাবে?—

কল্যাণী দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বলিল—তা যাবে বৈ কি।

মুনি। কিন্তু ওটা তা হ'লে যুক্তি নয়?—

কল্যাণী। না, ওটা সত্যি।

উকিল হারিলে মকদ্দমা চলে না। কমলা এবং উমা শ্রীশকে লইয়া আবার টানাটানি আরম্ভ করিল—কাকে ভালবাস আমাদের বল। কাকেও ব'লে দেবো না, শুধু তাকে চুরি ক'রে একবার দেখে আসব।—মানে তোমার taste-টা আমরা দেখ্‌তে চাই—

শ্রীশ হতাশভাবে বলিল—To argue with a girl and to pour water on a goose is just the same—

কল্যাণী রাগের স্বরে বলিল—You slanderer ! তোমাকে umpire করা হ'ল কি মেয়েদের গালাগাল শোনাবার জন্যে ?—শীগ্‌গির withdraw কর কথাটা, নইলে—'

এই সময়ে ঘরের অন্য দিক হইতে মায়ার কৌতুক-মিশান কথার মিষ্ট স্বর বহিয়া আসিল—A 'pice' for your thoughts, Mr. Ghose—' এবং সকলেই দেখিল জীবন কি যেন এক গভীর চিন্তার ভার মন হইতে নামাইয়া শরীরটাকে ঝাঁকানি দিয়া আপনাকে সজাগ করিয়া লইতেছে ; তাহার মুখ ঈষৎ আরক্ত !

কল্যাণী বলিল—উঃ তুমি কি স্বার্থপর ভাই ! ওঁকে একলা ফেলে নিজেরা দিব্যি জটলা পাকাচ্ছ !—'

মায়া। তোমরা কি কর্‌ছ ?—

কল্যাণী। আমরা কথা বলাবলি খেল্‌ছি। এই দেখ না, আমরা প্রথম আরম্ভ করেছিলাম 'কাজ'। তারপর হ'ল 'প্রেম'। তারপর হ'ল 'ভোগ'। তারপর হ'ল 'অজীর্ণ', বা 'প্রেমে অরুচি'। তারপর 'প্রেমের মরণ', তারপর 'ব্যবসা', অর্থাৎ তুমি একদিন যা বুঝ্‌বে। তারপর এখন হচ্ছিল—নারীর মন হাঁসের পালকের মত কি না অর্থাৎ ওতে কোন দাগ লাগে কি না। কিন্তু এ আর ভাল লাগ্‌ছে না, অনেক হ'য়ে গেছে, একটা নতুন কিছু কর—'

মায়া। আমি খুব রাজি।

দীপ্তি এতক্ষণ ছবির বই লইয়া বিকাশের সহিত অতি নিবিষ্টমনে কি সব বলিতেছিল তাহা শোনা না গেলেও তাহারা পরস্পরের মনে ইহারই মধ্যে যে একটু শ্রদ্ধার ভাব আনিয়া দিয়াছে তাহা তাহাদের শান্ত হাসি ও চাহনির ভিতর দিয়া বুঝা যাইতেছিল। একটা 'নতুন

কিছু' করিবার প্রস্তাবে তাহার মুখে বেশ একটু বিব্রত ভাব ফুটিয়া উঠিল, বলিল—কি করতে চাও ?—'

অনেক রকমেরই কথা উঠিল কিন্তু কোনটাই এমন নয় যাহার ভিতর দিয়া সকলে এক সঙ্গে আনন্দ করিতে পারে।

উমা বলিল—আচ্ছা মুনিবাবু, আপনি নিশ্চয় গান বা বাজনা এ দুটোর একটা জানেন। তখন কল্যাণীর সঙ্গে যে-ভাবে সঙ্গীতসম্বন্ধে কথা বলছিলেন তাতে ত আমার আরো বিশ্বাস হয়েছে—'

মুনি হাসিয়া বলিল—একটা নতুন কিছু করা হিসেবে আমি আপনাদের entertain করতে পারি, কিন্তু—'

জীবন অত্যন্ত ভীত ভাবে বলিল—'কিন্তু' কি রে ? তুই গাইবি নাকি ?—'

মুনি। আপনারা সকলেই দেখলেন এবং শুনলেন, এই নির্জীব মানুষটি আমার বিষয়ে কি রকম সজীব ?—আমার কোন কিছুই ও সইতে পারে না।—'

জীবন। তা কি করব ? তোমার ঐ—'কালী, কুল দাও মা নুন দিয়ে খাই—' 'আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে, ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে—' 'খাঁচার পাখী গেল উড়ে থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং—' 'পার ত জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা—' এই সব গাইবে ত ?

মুনি। তা কি করব ?—আমি যদি এখন তোমার মত—'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিয়ো—' 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো—' এ-সব না ..রি, অমন ডাহা মিথ্যে কথা যদি আমার জীভ্ দিয়ে না বেরোয়—'

এ-দিকে কলরব একটু চড়িয়া উঠিতেই দীপ্তি বিকাশকে বলিল—আপনি কিছু গান করুন না।

বিকাশ বলিল—আমি ত গান গাইতে পারি না, তবে কিছু বাজাতে পারি, সুরবাহারটা কিছুদিন ধরে বাজাচ্ছি।

দীপ্তি। তা হ'লে এস্রাজও নিশ্চয়ই জানেন ?

বিকাশ কোন প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা না করিয়াই বলিল—বোধ হয় পারব।

ঠিক এই সময় জীবন কাতরভাবে বিকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—শুন্‌লে বিকাশ, মুনিটা আমায় কি ভাবে অপমান কর্‌লে। তুমি আমার মান রাখ।

মায়া। উনি গান-বাজনা করেন নাকি ? কি আশ্চর্য্য ! আমার একবারও তা মনে হয় নি, আমি ভাব্‌ছিলাম বই-এর নেশা ওঁর চোখে এখনও লেগে আছে।

দীপ্তি উঠিয়া অর্গ্যানের পিছন হইতে একটি এস্রাজ লইয়া বিকাশের হাতে দিল।

মায়া হাসিয়া বলিল—তুই কি ক'রে জান্‌লি ?—

দীপ্তি। উনি বল্‌লেন সুরবাহার বাজাতে পারেন, তাই ভাব্‌লাম এটাও পার্‌বেন।

জীবন। আর বোধ হয়, ভালই পার্‌বে।

বিকাশ। আচ্ছা থাম, তোমায় আর সর্দ্দারি কর্‌তে হবে না।

জীবন চুপ করিল এবং সেই সঙ্গে সকলেই বেশ শান্ত শিশুদের মত চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের আসনে বসিয়া আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে তাহারা যে-ভাবে বসিয়াছিল তাহার বদল হয় নাই। শান্তা সুপ্রকাশ, মুনি কল্যাণী, মায়া বিমল, উমা এবং কমলার মাঝখানে শ্রীশ, সকলের নিকট হইতে কিছুদূরে এককোণে

জীবন যেমন একা বসিয়াছিল তেমনিই আ   মাঝে মাঝে বিমল এবং মায়াকে দেখিতেছে।

বিকাশ দীপ্তিকে বলিল—কিন্তু আমি ত বাংলা গান বাজাতে জানি না, সব হিন্দী সুর, সে কি ভাল লাগ্‌বে?

দীপ্তি। না শুনে কি ক'রে মত বল্‌ব?

বিকাশ হাসিয়া সুর বাঁধিতে লাগিল। একটির পর একটি চাবি আঁটিয়া বা আল্‌গা করিয়া তারের উপর আঙুল দিয়া শব্দ করিয়া নিবিষ্ট মনে শব্দ শুনিতে শুনিতে বিকাশ দীপ্তিকে বলিল—যদি কিছু না মনে করেন, ছড়্‌টায় একটু রজন মাখিয়ে দিন না।—'

সুর বাঁধা হইল। দীপ্তির হাত হইতে ছড়্‌টি লইয়া, এস্রাজ কাঁধে ফেলিয়া এক সঙ্গে সঙ্গীতের সমস্তগুলি সুরের রেশ তুলিয়া চোখ বন্ধ করিয়া একবার যেটি বাজাইবে তাহা ঠিক করিয়া লইল।

তাহার ক্ষিপ্রগতি আঙুল ক'টির দিকে তাকাইয়া দীপ্তি মুগ্ধ হইয়া গেল! তাহার চোখে বিস্ময়ের যেন সীমা নাই! বিকাশ অল্প একটু হাসিয়া বলিল—বাজাই?—

তাহার পর সুর উঠিল! দীপ্তি ভাবিতে   , অযত্নে রক্ষিত ধূলামাখা মরিচা-ধরা এস্রাজটায় এত সুর কোথা হই   াসিতেছে?—মূর্চ্ছনা মীড় তানে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ   পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকের মনে একটা   ব্র সুরের ঝড় উঠিয়া বুকের কপাটগুলিকে যেন নাড়া দিয়া যাইতে   !

মায়া তাহার অত্যন্ত নিকটে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সুপ্রকাশের আরক্ত দুই চোখের দিকে তাকাইয়া শান্তার মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কল্যাণী মুনির মুখের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিল—কি চমৎকার, না?—' শ্রীশ চোখ বন্ধ করিয়া

চেয়ারে মাথা রাখিয়া শ্রান্তভাবে পড়িয়াছিল, উমা ও কমলা দুজনে তাহার দুই হাত তাহাদের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল। এবং দীপ্তির চোখের পলক পড়ে না—তাহার যেন জ্ঞান নাই! . . .

সুর থামিয়া গিয়াছে। বিকাশ এস্রাজটিকে কোলের উপর রাখিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘরের সকলেরই কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর শোনা গেল নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—সঙ্গীতে যে জানোয়ার বশ মানে, তা বোধ হয় ঠিক, না ছোড়্-দি?

সকলে দেখিল ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র এবং করুণা!

তাঁহারা ভিতরে আসিয়া বসিলেন। করুণা বলিলেন—কি মিষ্টি তোমার হাত! আরো শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে—'

বীরেন্দ্রনাথ। আর আশা করি প্রত্যেকের ভোট দেবার দরকার নেই!

বিকাশ হাসিয়া বলিল—মুনি বলে, আমার হাতটাকে রোজ একটু ক'রে রোদে দিতে, নইলে নাকি পিঁপ্‌ড়ে ধর্‌বে।

সকলের ফরমাস মত বিকাশ আবার বাজাইতে লাগিল।

মায়া, বিমল, শান্তা, সুপ্রকাশ প্রভৃতি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া বা কথার নেশায় মাতিয়া যে সকল বিষয় লইয়া পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়াছে; যে তিক্ততা, অবিশ্বাস, সংশয়, লঘুতা প্রভৃতির আভাস তাহারা প্রকাশ করিয়াছে, যে বিদ্রোহী ভাবগুলি হয় ত পরস্পরকে বিশেষ করিয়া আঘাত দিবার জন্যই তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল কথা এবং চিন্তার স্রোত লজ্জাবনত

বধূর মত শান্ত পদবিক্ষেপে আপন আপন হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছিল। বিকাশের যন্ত্রের সুর সকলের মন হইতে যেন অশান্তির বোঝা নামাইয়া লইতেছিল।

মাথাটিকে অল্প একটু ফিরাইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে শান্তা সুপ্রকাশকে বলিল—জগতের কাছ থেকে এমন কি কিছুই পান নি, যা মনে ক'রে মনে শান্তি পেতে পারেন ?—'

সুপ্রকাশ। কত সময় মনে হয়েছে—পেয়েছি, কিন্তু পাই নি, তার কারণ আজকের শান্তি কালকের ঘটনা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সব চেয়ে বড় অশান্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। সে বিষের জ্বালা সমস্ত শ্রদ্ধার ভাবটিকে গলা টিপে মেরে ফেলে মিস্ ব্যানার্জ্জী!

শান্তা কোন উত্তর না দিয়া সুপ্রকাশের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া মাথা নীচু করিল।

বিমল ঈষৎ আনত হইয়া মায়াকে বলিতেছিল—আমার জন্যে কিছু ভাব্‌বেন না আপনি, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী যত বেশীই হোক, ওদের বশে রাখ্‌তে পার্‌ব। তা ছাড়া কাজের অভাব কি?—এক রকম ক'রে চালিয়ে নেবো; উপস্থিত কিন্তু এর বেশী আর কিছুই বল্‌তে পার্‌ব না। আপনি আমার আজকের পাগলামিটা ভুলে যান। চার বছরের সংযম একদিনের একটি দুর্ব্বলতায় এমন মলিন হ'য়ে গেল মনে ক'রে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আমার, আর কিছু না।

এই ধরণের কথা, কান্নার অপেক্ষা বেশী মনকে অভিভূত করে এবং এই রকম কথার সাহায্যে একজন আর একজনকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তের মধ্যে অনেক সময় পায়। জগতের অধিকাংশ নারীই এই ভাবের কথা শুনিয়া আপনাদের আর একজনের হাতে বিলাইয়া দেয়। 'আমাকে ও চায়'—'আমাকে না হ'লে ওর আর শান্তি নেই' এই কথাই

শুধু ভাবিয়া তাহারা আপনার সুখ-শান্তিকে তুচ্ছ করিয়া বলে—'আমায় নাও',—এবং এই আত্ম-দানের যজ্ঞে আপনাদের আহুতি দিয়া তাহারা কি পায়?—

মায়া ম্লান হাসিয়া বিমলকে বলিল—শুধু এই জন্যেই কি আপনাকে হারাতে হবে? আপনার কাছ থেকে বন্ধুত্বের দাবীও করতে পারব না?—

বিকাশ তখন একটা পূরবী সুর বাজাইতেছে। প্রতি পদে তার অবসাদ আর নিরাশার বেদনা যেন জড়ান! হঠাৎ একটি তার ছেঁড়ার শব্দে সকলে চম্‌কাইয়া উঠিল। এ যেন সুরের স্বর্গ হইতে জোর করিয়া সকলকে আছাড় মারিয়া কোলাহলের জগতে ফেলিয়া দিল! বিকাশ হাসিয়া যন্ত্রটি দীপ্তির হাতে দিয়া বলিল—সুরে-বাঁধা বাজনার তার যখন ছেঁড়ে, তখন ভয়ানক কষ্ট হয়, না?—

নগেন্দ্র জবাব দিলেন—ঠিক বলেছেন বিকাশবাবু, ওটার মত কষ্টকর আর কিছুই নেই। আমাদের জীবনের সঙ্গেও এর যথেষ্ট মিল আছে। But you are too young for that. Now boys, you are looking shabby, and girls, nothing to say about you.—

এই কথা কয়টি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সকলের দৃষ্টিই আপন আপন ঘড়ির উপর পড়িল—পাঁচটা দশ! কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ তাহারা এখানে আছে এবং এই পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম অনেকে ঘড়ি দেখিল। বিকাশ দাঁড়াইয়া বলিল—এবার আমরা—সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত আপনাদের—আপনাদের হয়ত অনেক বিরক্ত করলাম—'

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—থামুন থামুন, এখনও সময় হয় নি। কথাগুলি একটু 'বে-টাইমি' হচ্ছে, না ছোড়্-দি ?

করুণা। হাঁ, এত তাড়াতাড়ির কি আছে ? আমি চায়ের জোগাড় ক'রে দিয়ে এসেছি আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই হবে।

ইহার পর মায়া মেয়েদের লইয়া উপরে চলিয়া গেল এবং শ্রীশ তাহার বন্ধুদের লইয়া তাহার ঘরে আনিয়া স্নানের ঘরের দরজা খুলিয়া দিল।

মুনি বলিল—If there be twenty-six men and one bath room—কি করা উচিত ? কে আগে যাবে ?

বিকাশ একটা কৌচে শুইয়া পড়িয়া বলিল—আগে জীবন, তারপর তুমি, তারপর প্রকাশ, তারপর শ্রীশবাবু, তারপর আমি।

—১২—

বাড়ীর পিছনের যে 'লন'টিতে 'টেনিস্ কোর্ট' ছিল সেইখানে ছোট ছোট বেতের টেবিলের উপর [illegible]দা চাদর বিছাইয়া তাহার উপর কেক, স্যাণ্ডউইচেস্, ডালপুরী, মাং[illegible] গুলিকাবাব, সন্দেশ প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী জলপান সাজান রহিয়াছে। প্রতি টেবিলে তিনটি করিয়া চেয়ার এবং প্রতি টেবিলে একটি করিয়া মাঝারি গোছের চা-এর কেট্‌লি কোজি-ঢাকা রহিয়াছে। কিছু দূরে দুই[illegible] বাবুর্চি 'সার্ভ' করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। করুণা সমস্ত টেবিলগুলি ভাল করিয়া দেখিতেছেন, কিছু দিতে ভুল হইল কি না। বীরেন্দ্র এবং নগেন্দ্র লনের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীশের ঘর হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরী, হল, রিসেপ্‌সান রুম, করিডোর প্রভৃতির ভিতর দিয়া যখন বিকাশ প্রভৃতি সকলে গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, মুনি বিকাশের জামার আস্তিনে একটু টান দিয়া ঈষৎ ভীত স্বরে বলিল—ও ভাই তিনি।—'

মুনির দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বিকাশ দেখিল, সকলের পিছনের টেবিলে স্বর্ণ বসিয়া আছেন।

বিকাশ। তা কি হয়েছে ?

মুনি। এমন কিছু নয়, তবে জীব্‌নেটাকে ব'লে দে, ও যেন অমন গো-গ্রাসে না খায়—

সকলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া করুণা ডাকিয়া বলিলেন—এস তোমরা—'

তাহারা 'লনে' আসিতেই বীরেন্দ্রনাথ বিকাশকে গ্রেপ্তার করিয়া একটি টেবিলে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। তাহার পর সকাল বেলাকার অসমাপ্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনাটুকু সারিয়া লইবার জন্য কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হাত বেচারী চিরদিনই অন্ধ এবং তাহার স্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তিও নাই। সে সন্দেশ গুলিকাবাব কেক ও ডালপুরীর একাকার করিয়া মুখের মধ্যে তুলিয়া দিতেছিল, কিন্তু জিহ্বা অন্ধ হইলেও এবং কথা বলার 'বেগার' খাটিয়া মরিলেও ঐ সমস্ত বস্তু তাহাতে স্পর্শমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। বীরেন্দ্রনাথের এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়া বিকাশ খাইবার দ্রব্যগুলির নির্ব্বাচন এবং সংমিশ্রণ বিষয়ে সাহায্য করিতেছিল।

জীবন এবং বিমলকে লইয়া নগেন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রপাগেণ্ডা ওয়ার্ক্‌স্' সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন কিন্তু খাইবার দ্রব্যগুলির প্রতি

তাঁহার বিশেষভাবে দৃষ্টি আছে। তিনি কথা বলিবার সময় প্লেট হইতে কখনও চোখ তুলেন না এবং কেমন করিয়া গুলিকাবাবের সহিত অ একটুখানি ডালপুরী ছিঁড়িয়া মুখে দিতে হয়, প্রথমে একটু চা খাই স্যাণ্ডউইচেসে কামড় দিলে সর্ব্ব শরীরে কেমন 'ওঁ মধু ওঁ মধু' করি উঠে, কেক্ জিনিষটা অখাদ্য, কারণ বড় সহজে পেট ভরে ইত্যাদি বিষ জীবনকে বুঝাইতেছিলেন, এবং জীবন প্রায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এই সম কথা শুনিতেছিল। কিন্তু বিমল ইহাঁতে যোগ দিতে পারিতেছিল না দূরে—বহুদূরে মুনি এবং শ্রীশকে লইয়া শান্তা উমা কমলা কল্যাণী যেখানে দুটি টেবিল এক করিয়া মহা কলরবে কথার স্রোত বহাইতেছিল সেইখানে মায়ার মাথার এলো-খোঁপার আড়াল দিয়া যে কয়টি রজনীগন্ধা উঁকি দিতেছিল, সে তাহারই দিকে চাহিয়াছিল এবং তাহার মোটা কাঁচওয়ালা 'টরটইজ শেল' চশমার পিছনে চোখ দুটিতে তখনও লাল ভাব কাটে নাই!

কিন্তু সুপ্রকাশ কোন্ সাহসে যে সুবর্ণের পাশে বসিয়া তাঁহার চায়ের কাপে চিনি দিতেছিল, চা ঢালিয়া দিতেছিল, খাবারের ডিস্ তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া—এটা খান বড় সুন্দর হয়েছে, আর একটি 'স্যাণ্ডউইচেস' মিসেস্ রায়—না, তা হবে না, নিতেই হবে মিসেস রায়—নইলে আমি খাব না! . . . এই সব বলিতেছিল তাহা সেই জানে এবং কি করিয়া সুবর্ণ তাঁহার গাম্ভীর্য্য ফেলিয়া একটি ভঙ্গি করিয়া কথা বলিতেছিলেন তাহা তিনিও জানেন না।

সুবর্ণ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এখানেই কোথাও থাকেন?—

সুপ্রকাশ। আমাকে 'আপনি' ব'লে কেন লজ্জা দেন? আমি শ্রীশের চেয়েও ছোট।—হাঁ আমি থাকি ব্যাণ্ডেল রোডে, এখান থেকে

বেশী দূর নয়—শুরকিগঞ্জ সারকুলার রোড দিয়েই আমাদের যাওয়া-আসা কর্‌তে হয়।—আর একটি সন্দেশ মিসেস্ রায়, শুধু একটি—

পোষমানা বাঘের মত ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া স্বর্ণ বলিলেন—তুমি বড় জেদি ছেলে।

সুপ্রকাশ তাঁহার ডিসে সন্দেশ রাখিয়া বলিল—কেন জেদ্ থাক্‌বে না? ছেলেদের বুঝি জেদ্ থাকতে নেই?—যত জেদ্ সব মা'র থাক্‌বে? ঠিক এমনি ক'রে আমি আমার মা'র সঙ্গেও ঝগড়া করি।

স্বর্ণ একেবারে গলিয়া গেলেন, বলিলেন—আচ্ছা, এত কাছে থাক তবু একদিনও ত তোমায় দেখি নি! শ্রীশের কাছেও ত আস না?—

সুপ্রকাশ। আমার কাছে সবাই আসে কি না। তাই আমাকে কোথাও বিশেষ আস্‌তে হয় না। তা ছাড়া একদিন যদি বিনা নোটিশে কোথাও যাই, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।—কিন্তু চায়ের পরই আইসক্রীম্‌টা খাবেন, মিসেস্ রায়? আর একটু দেরী হ'লে ভাল হ'ত। এটা বোধ হয় আমণ্ডের, না? বেশ 'ফ্লেভার' বেরিয়েছে। কখন এসব কর্‌লেন?

স্বর্ণ। না, আমাদের কিছুই কর্‌তে হয় না, মহম্মদই সব করে, ওকে শুধু একবার ব'লে দিলেই হ'ল, কিছু দেখ্‌তে হয় না কিন্তু তুমি যে কিছু খেলে না?

দূর হইতে স্বর্ণ এবং সুপ্রকাশকে অত্যন্ত সহজভাবে কথা কহিতে দেখিয়া মায়া আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া উভয়ের মধ্যে বসিয়া এক হাতে স্বর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—একলা পেয়ে আমার মা'তে কেন আপনি ভাগ বসাচ্ছেন? ভারি অন্যায় আপনার! এ আমার মা—

সুপ্রকাশও ঠিক মায়ার সুরেরই প্রতিধ্বনি করিল—যদি মনে করি কেড়ে নেবো, আপনি ঠেকাতে পারেন?

সুবর্ণ মনে মনে এই যুবকটির নিকট পরাস্ত মানিয়া বলিলেন—
দুপুরে তোমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলে শুন্‌লাম,
কিন্তু আমার বড় মাথা ধরেছিল তাই নামতে পারি নি, তোমরা বস,
আমি ঐ ছেলেগুলির সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে আসি—' বলিয়া তিনি
উঠিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ মায়াকে বলিল—দেখুন, আপনাকে আমি একটা কথা
বল্‌তে পারি কি? মানে, বল্‌তেই হবে আমায়, নইলে—

মায়া কৌতুক-মিশান উৎকণ্ঠার স্বরে বলিল—ওকি, আজই
propose কর্‌বেন?—না না, আর দিন দুই যাক্। এই মাত্র ত
পরশু আপনি আমায় দেখেছেন!—

মায়া হাসিয়া ফেলিল। সুপ্রকাশও হাসিয়া বলিল—তা নয়।
আমি আজ মিস্ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া করেছি। আমার
কোন দরকার ছিল না ও-সব কথা তাঁকে বলা। কিন্তু কথার উত্তরে
কথা বল্‌তে গিয়ে তাঁর মনে আঘাত দিয়েছি।

মায়া কৃত্রিম আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওঃ এই?—তা
বেশ ত ভালই করেছেন। এবার ঐ অপরাধটা স্বীকার ক'রে ক্ষমা
চেয়ে নিতে গেলে দেখ্‌বেন ও গাইবে:—

আরো কি বাণ আছে তোমার তূণে,—ও নিঠুর?—

সুপ্রকাশ। আঃ তা নয়, আপনি মানুষকে বিপদে
ফেল্‌তে পারেন। আমি বল্‌তে চাই, তিনি যেন আমায় ক্ষমা
করেন।

মায়া। আর যদি না করে?—

সুপ্রকাশ। আমার মনে ভারি একটা অশান্তি থেকে যাবে।

মায়া হাসিয়া বলিল :—

চিরদিন অর্দ্ধাশনে কেটে গেছে যার
আজো তার অনশন হ'ল না অভ্যাস—

সুপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল—কি জানেন আপনি আমাকে ?—আমি—

মায়া নিজের মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়া বলিল—চুপ। তাহার পর সমস্ত শরীরে সৌন্দর্য্যের হিল্লোল তুলিয়া দাঁড়াইয়া মাথা একটু বামদিকে হেলাইয়া বলিল—ওকে আমি নিয়ে আস্‌ছি—

সুপ্রকাশ প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বেই দেখিল, মায়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে !

*　　*　　*

কল্যাণী মুনিকে বলিতেছিল—কি আশ্চর্য্য ! আপনার address —One five one Sandhurst Street ?—আর আমাদের বাড়ী হচ্ছে Ninety-nine Alison Road ! যেখানে এই দুটো রাস্তা cut করেছে, মোড়ের তিনখানা বাড়ীর পর ডানদিক্‌কার ফুট্‌পাথের ওপর যে ছোট একতলা flat-টা আছে—সেইটেই আমাদের বাড়ী।

মুনি পুলকিত হইয়া বলিল—ওঃ ! ওটা আপনাদের বাড়ী ?—খুব ফুলগাছ লাগানো আছে—আর সিঁড়ির দুপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো জুঁই গাছের ঝাড় প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে ? আর বারান্দায় একটা Zambazi Parrot থাকে—খুব কথা বলে ?—'

কল্যাণী। হাঁ, ঐ ত আমাদের বাড়ী।

কল্যাণীর কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুনি হাসিয়া উঠিল !

কল্যাণী। এর মানে ?—'

মুনি। মাপ্ করবেন, একটা কথা মনে হ'ল তাই—মানে এটা আমার একান্ত personal—আর একটা cream roll দিই আপনাকে ?—নেবেন না ?

কল্যাণী। না। আমি তখন একখানা স্যাণ্ডউইচেস্ দিলাম, আপনি তা খেয়েছেন ?—'

মুনির তখন সন্দেশ খাওয়া হইয়া গিয়াছে। সে পাতের পরিত্যক্ত স্যাণ্ডউইচেস্-এর দিকে তাকাইয়া সেটি তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিল।

কল্যাণী। Just like a good boy. এবার এই সন্দেশ দুটি।—

মুনি। কিন্তু ও দুটো কোন রকমে আমার পকেটে ফেলে দিতে পারেন ? বাড়ীতে গিয়ে খাব, পেটে আর জায়গা নেই।

কল্যাণী। তা দিতে পারি, কিন্তু you must pay for that—কেন হাসলেন বলুন ?

মুনি। কিন্তু সে আপনার ভাল লাগবে না। আপনি হাসবেন—'

কল্যাণী। ভাল লাগবে না, অথচ হাসব ?—বলুন চট্‌পট্।

মুনি একবার চারিদিকে তাকাইয়া, হাতদুটি ঘসিতে ঘসিতে ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—আপনি এত কাছে থাকেন জানতাম না—আপনাকে দেখবার জন্যে—' বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া হঠাৎ সে প্রায় ছুটিয়া আসিয়া করুণার পাশে বসিয়া বলিল—আমি আপনাকে ছোট-মাসী ডাকব ?—

করুণা হাসিয়া বলিলেন—ওমা, কি ছেলে ! তা আর জিগ্‌গেস করছ কি ?—আর এই তোমার বড়-মাসী,—বলিয়া সুবর্ণের দিকে দেখাইয়া দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুনির অন্তরাত্মা 'ও বাবা !' বলিয়া উঠিল। সে 'বুক্ টিপ্ টিপ্ চোখ মিট্ মিট্, কিন্তু-কিন্তু' ভাবে

অল্প একটু দাঁতের হাসি বা হাসির দাঁত বাহির করিয়া স্বর্ণকে বলিল—আমি—আমি আপনাকে প্রণাম করতে পারি ?—অনেক পরে বলছি যদিও—কিন্তু—'

ত্রিশ বৎসর বয়সের পর কোন কোন মেয়ের মুখে যেমন গোঁফের রেখা অত্যন্ত বেয়াড়া রকমে দেখা দেয়, তেমনি কাহারো মনে প্রণাম পাইবার আগ্রহ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। স্বর্ণের ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি খুশী হইয়া মুনির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

মুনি একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল—মা এখানে এলেই কিন্তু আপনাদের টেনে নিয়ে যাবো—কোন আপত্তি শুনব না। বড়-মাসী, অবশ্য আপনি যদি এটা পছন্দ না করেন তাহ'লে—'

স্বর্ণ বলিয়া উঠিলেন—ও মা! পছন্দ না করার কি আছে এতে ?

আজিকার ঘটনা লইয়া জীবনে এই প্রথম দুটি বাহিরের মানুষের সহিত স্বর্ণের চির-বিদ্রোহী মন সন্ধি-সূত্রে বাঁধা পড়িল। শুধু তাহাই নয়, এই দুঃসাহসী যুবক দুটির সহিত কথা কহিবার পর হইতে তাঁহার মনের মধ্যে অনেক বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইতে স্বরু হইয়াছিল। তিনি যখন বাবুর্চিকে ডাকিয়া বলিলেন—মহম্মদ, আউর এক প্লেট আইস্‌ক্রীম লেয়াও বাবুকো ওয়াস্তে—' তখন চারি পাশের সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

মহম্মদ আইস্‌ক্রীম দিয়া গেলে চামচে করিয়া অল্প একটু মুখে দিয়া মুনি বলিল—আচ্ছা বড়-মাসী, মায়া-দি কি বড্ড গম্ভীর ? ওঁকে কি খুব ভয় করব ?—'

স্বর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। মায়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে মা ?—

সুবর্ণ আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—ও তোকে কি বল্‌ছে শোন্—'

মায়া চোক পাকাইয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া মুনিকে বলিল—শীগ্‌গির বলুন—আমার নামে কি বলেছেন—'

মুনি আইসক্রীমের প্লেটে প্রায় মুখ লাগাইয়া গম্ভীরভাবে খাইয়া যাইতে লাগিল। সুবর্ণ বলিলেন—ও বল্‌ছিল—মায়া-দি কি খুব গম্ভীর?—ওঁকে কি ভয় করব?—

মায়া। বটে? এখুনি withdraw করুন কথাটা, নইলে defamation-এর দায়ে পড়্‌বেন।

মুনি স্বীকার করিল এমন কথা মুখে আনা তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, ইহার জন্য সে অত্যন্ত দুঃখিত, এবং এমন ভুল আর কোন দিন হইবে না!

এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ও করুণা, নগেন, শীগ্‌গির এস এখানে—বড়-দি আসুন—'

তাঁহার কথার স্বর আবেগ-কম্পিত। কোন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার কিম্বা অঙ্কশাস্ত্রের কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলে তিনি যেমন করিয়া পেন্সিলের দাগে ভরা খাতাটিকে হাতে করিয়া ছুটিয়া নিজের study হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতেন তাহাকেই বুঝাইতেন, তেমনি ভাবে তিনি বিকাশের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিতে টানিতে সকলের কাছে আনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! ইনি—বিকাশ—দ্বিজেশের ভাগ্নে!—দ্বিজেশ সেন—ধানবাদের দ্বিজেশ, করুণা!

নগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বিকাশের হাত ধরিয়া বলিলেন—তুমি সুচারুর ছেলে?

করুণা এতক্ষণ পলকহীন চোখে বিকাশের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার মুখে ম্লান হাসির রেখার সহিত চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া গেল। তিনি সরিয়া আসিয়া বিকাশের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ?—আপনি—আমাকে—আমাদের—'

তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই করুণা, বিকাশের মাথাটি টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—বিমলা, তোমার মামী-মা আমাদের যে কতখানি ছিল তা বল্‌তে গেলে কথা খুঁজে পাই না।—তোমার মা বাবা—' কিন্তু থাক্ সে-সব কথা—এ বাড়ী তোমারই মনে কর বিকাশ—আমরা তোমার পর নই।

বীরেন্দ্র। মোটেই পর নই খুব আপনার—এটা মনে কর্‌তে চেষ্টা ক'র।

নগেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! সুচারুর ছেলেকে আমরা চিন্‌তাম না—'

বিকাশকে ঘিরিয়া বসিয়া করুণা, সুবর্ণ, বীরেন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতি কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিকাশ এই নবলব্ধ বন্ধুদিগকে পাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। তাহার সাত বৎসর বয়স হইতে সে জানে তাহার মামা ছাড়া জগতে আপনার বলিতে আর কেহ নাই। এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া কলিকাতায় বাস করিলেও তাহার জীবনের ষোলটি বৎসর বাহিরে কাটিয়াছে। তাই এই স্থানটিতে সে সম্পূর্ণ বিদেশীর মতই থাকিত। মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের সন্ধান সে পাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। করুণার এই সকরুণ কথার সুরে তাহার মন স্নেহের স্পর্শ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বলিল—আবার কবে আমায় আস্‌তে বল্‌বেন ?—

করুণার ইচ্ছা হইল ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত সুধা ঢালিয়া দেন। বলিলেন—বল্‌লামই ত—যখন খুশী তোমার, যে দিন খুশী এস—তোমায় দেখ্‌লে আমাদের বড় ভাল লাগ্‌বে।

আকাশের গায়ের শেষ আলোটুকু ধীরে ধীরে মুছিয়া গিয়াছে। মাঠে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের আর স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না।

জীবন এতক্ষণ একা একা বসিয়াছিল। তাহারই মত অসহায়-ভাবে বিমলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে তাহার কাছে আসিয়া বলিল—আপনি কি খুব solitude-এর পক্ষপাতী ?—

বিমল ম্লান হাসিয়া বলিল—solitude-টা খুব ভাল লাগে কিন্তু উপভোগ কর্‌তে হ'লে একা হয় না ত, আর এক জনকে চাই।

জীবন। খুব সত্যি কথা ওটা বিমলবাবু, আর একটি মানুষ তার মনের সমস্ত অনুভূতি নিয়ে আমারই মত নিঃশব্দে আমারই পাশে না থাক্‌লে solitude-এর মাধুর্য্য মনেই লাগে না—না ?

বিমল। হাঁ, একটুখানি নিশ্বাসের শব্দ, একটুখানি আঁচলের স্পর্শ, হাতের চুড়ির অতি মৃদু একটু স্বর···তখনই বোধ হয় solitude-কে বুক ভ'রে অনুভব করি।

জীবন কোন কথা বলিল না। উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহারা কথা বলিবার কিছুই আর খুঁজিয়া পাইল না। দুই জনেই আপন আপন চিন্তার জাল দিয়া যেন জগৎকে ঢাকা দিয়া ফেলিতেছিল, এমন সময় উমা এবং কল্যাণী আসিয়া বলিল—আপনারা যে এমন উদাসভাবে এখানে ?—

জীবন তাড়াতাড়ি উঠিয়া কয়েকখানা চেয়ার আনিয়া দিল।

কল্যাণী বলিল—বিমলবাবু, আপনার 'ভিটের মাটি'তে—যে সব ঘুঘু চ'রে বেড়ায় তাদের মধ্যে কাকে খুব promising ব'লে মনে হয় ?

বিমল একটু ভাবিয়া বলিল—অনেকেই বেশ ভাল লেখেন—তবে শ্রীজীবনময় ঘোষ এবং শ্রীকল্যাণী দেবী বোধ হয় সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছেন।

কল্যাণী দুষ্টামি করিয়া উমাকে ঠেলা দিয়া বলিল—শোন্ শোন্, বিমলবাবু কি বল্‌ছেন।

উমা। দেখিস্ ফেটে ম'রে যাস্ নি যেন—'

ইহার পর দেশ-বিদেশের লেখক-লেখিকার রচনা লইয়া আলোচনা করিয়া, আপনাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা বলিয়া পরস্পরকে ঘিরিয়া এমন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদেরই পিছনে একজন মানুষ দাঁড়াইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং ইহাদের তর্ক-স্রোত সহজে থামিবে সে আশা নাই দেখিয়া সে বলিল—মাফ্ করবেন। কিন্তু উনি সেই তখন থেকে একা ব'সে আছেন। বলিয়া দূরে দেখাইয়া দিল।

উমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বাবাঃ কি মেয়ে! এই কল্যাণী, আয় ওর কাছে একবার—'

উমা এবং কল্যাণী চলিয়া যাইতেই মুনি গলায় রুমাল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মাফ্ করবেন বিমলবাবু, কিন্তু আপনাদের চেয়ে আমার [illegible] হচ্ছে বেশী—আমার কপালই এম্‌নি—'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুখায়ে যায়।'

বিমল হাসিয়া বলিল—কিছু মনে করবেন না ও সব—আজ বেশ লাগ্‌ল, না ?

মুনি জীবনকে একটু ঠেলিয়া বলিল—তা বল্‌তে হবে বৈকি, নইলে অকৃতজ্ঞতা হবে যে, না জীবন ?

কল্যাণীর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া মুনি কিছুক্ষণ কথা কহিবার এবং হাসিবার চেষ্টা করিয়া শেষে সে-ও বিমল এবং জীবনের মত ঝিমাইয়া পড়িল।

অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। সুপ্রকাশ এবং শান্তা 'লনে' বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে একটি দুটি কথা কহিয়া যেন নিজেদের ভিতরকার স্তব্ধতাকে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু 'এক দিনের পরিচয়' জিনিষটার চার পাশ এমন লজ্জা, সঙ্কোচ এবং ভয়ের বেড়া দিয়া ঘেরা থাকে যাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ কিছুতেই পরস্পরের কাছে আসিতে পারে না ; এই সমস্ত প্রাচীরের পিছনে থাকিয়া মানুষ নবপরিচিত বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া 'সময়ের' জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। এ প্রাচীর সরাইবার ক্ষমতা শুধু তাহারই আছে।

শান্তা এক সময়ে বলিল—আপনার যদি কোন দিন সময় হয়, আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন, আমার বৌ-দিও একজন আর্টিষ্ট,—মানে যতদিন বিয়ে হয় নি ততদিন ছবি আঁকতেন। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ক'রে দেব—পনেরো নম্বর পলিন্ ষ্ট্রীট্।

শান্তার এই সাদাসিধা কথা কয়টির সহজ স্বরে আশ্বস্ত হইয়া সুপ্রকাশ তাহার সম্মতি জানাইল।

ক

নিবিড় নীল মেঘের চূড়ায় চূড়ায় রূপার পাতের মত চাঁদের আলো লাগিয়াছে। তাহাতেই পৃথিবীর অনেকখানি অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে। 'লনে' যাহারা বসিয়াছিল তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—কমলার

গলা জড়াইয়া উমা বলিতেছিল—নিশ্চয়ই তোর মন খারাপ হয়েছে ?—'

কমলা চোখের কোণ হইতে জল মুছিয়া বলিল—সেটা কি অস্বাভাবিক ?—সমস্ত দিনটা এক রকম ছিলাম কিন্তু এখন এমন dull feel কর্‌ছি···প্রায় এক মাস হ'তে চল্‌ল সে জেলে গেছে।—আমি তখন শ্রীশ-দাকে জিগ্‌গেস কর্‌ছিলাম hard labour মানে কি ?—ও সে সম্বন্ধে যা বল্‌ল তাই শুনে—'

উমার গলার স্বরও ভারী হইয়া আসিল। বলিল—তোকে যে এটা সইতেই হবে ভাই—'

কমলা হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই সইব।—চল্ রে কল্যাণী, ওদের সঙ্গে একটু হট্টগোল ক'রে আসি—'

উমা। কিন্তু তোর গলার স্বর যে কাঁপ্‌ছে !—তোর চোখের পাতা যে ভিজে ?—'

কমলা। ও সেরে যাবে'খন, আয়।

কিন্তু আর হট্টগোল করা হইল না। ফটকের কাছে একটি মটর-কারের পরিচিত 'হর্ণ' শুনিয়া কমলা ডাকিয়া বলিল—করুণা-মাসী, শুনেছ ?—

করুণা হাসিয়া বলিলেন—ইচ্ছে না থাক্‌লেও শুন্‌তে হ'ল বৈকি।

তাহার পর নমস্কার, প্রতি-নমস্কার, সলজ্জ শেষ চাহনি, বিদায় বেলাকার করুণ হাসির পালা আসিল। বিকাশ করুণাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুবর্ণ বলিলেন—তুমি এস এখানে সময় পেলেই।

মায়া বলিল—কিন্তু শনি আর রবি ছাড়া এলে আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে।

দীপ্তি বলিল—আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন ? অনেক কাজ আছে আপনার ?—'

এই সময়ে আর একবার হর্ণ্ বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমলা ডাকিয়া বলিল—কল্যাণী, তোর কথা বলা হ'ল ?—তোকে পৌছে দিতে হবে আমায়, তা বুঝি মনে নেই ?—

কল্যাণী দাঁত চাপিয়া বলিল—রাক্কুসী ! চেঁচাচ্ছে দেখুন না . . . আসি মুনিবাবু—'

মুনি। নাইন্‌টি-নাইন্ এলিসন্ রোড,—না ?

কল্যাণী হাসিয়া বলিল,—আপনার memory ত বেশ ধারালো দেখ্‌ছি ?—

আকাশের সমস্ত লুকানো জ্যোৎস্না মেঘের আবরণ সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে সকলে 'লন' হইতে, লাল কাঁকর-বিছানো সরু পথ ধরিয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরেন্দ্র, বিকাশের কাঁধে হাত দিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—তোমাকে যে এমন ক'রে আমরা পাব তা ভাবি নি ! দ্বিজেশ প্রায় কুড়ি বছর আমাদের কোন খবর দেয় নি। আমরাও তাকে বিরক্ত করতে সাহস করি নি—সে এখন কি ধানবাদেই আছে বিকাশ ?—'

বিকাশ। না, জব্বলপুরে থাকেন। সেই খানেই তিনি বাড়ী ক'রে নিয়েছেন, বিশেষ দরকার থাকলে ধানবাদে আসেন তাঁর mine-এর কাজ এখন একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার দেখেন আর কলকাতার আফিসে আমি আজ প্রায় দেড় বছর আছি।

ফটকের কাছে পৌছিয়া আবার ছোট ছোট দল পাকাইয়া উঠিল ! বিদায়ের ব্যাপার মাত্রেরই এই ব্যবস্থা। কিন্তু সর্ব্বরসে বঞ্চিত মটর-চালক তাহা সহ্য করিবে কেন ? সে আবার 'হর্ণ' টিপিল। তাহার

পর উমা কমলা কল্যাণী শান্তা গাড়ীতে উঠিতেই মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া 'ষ্টার্ট' দিল।

সে রাত্রে মিত্র-পরিবারের ডিনার টেবিল সজ্জিতই রহিল। সকলেরই মন্দাগ্নি অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। খানিকটা করিয়া বরফ জল বা সোডা খাইয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন।

* * *

তখন রাত্রি কিছু অধিক হইয়াছে, দীপ্তি মায়াকে ঠেলিয়া বলিল—দিদি, তুই নিশ্চয়ই ঘুমোস্ নি—

মায়া। তা কি হবে ?—

দীপ্তি। একটি কথা বল্‌বি ভাই ? কাকে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল ?—

মায়া। সব কটা'কে।—একেবারে ভালবেসে ফেলেছি।

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই বিমলের মনে হইল, আজ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নব-জীবনের সূত্রপাত···তাহার যাহা কিছু পুরাতন, সে সমস্তরই সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে।—নূতন—নূতন, সমস্ত নূতন··· পিছনের দিকে তাকাইবারও তাহার অধিকার নাই ; কারণ, 'ওটা অন্যায় হবে বিমলবাবু, বেদনাকে চোখ বুঁজে বুকে চেপে থাক্‌লে নিজের ওপর অত্যাচার করা হবে···'এই কথার সুর এখনও তাহার মনের মধ্যে লাগিয়া আছে।

'—তাই হোক্—ছ'তেই হবে—ছাড়্‌তেই হবে—'

কিন্তু কি ছাড়িতে হইবে তাহা যেন সে ভাবিয়া পাইল না! কোথায় আছে সেই পুরাতন, যাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার

স্থানে নূতনকে আনিয়া বসাইতে হইবে?—কোথায় লুকাইয়া আছে সেই পুরাতন—বহু পুরাতন? চোখে ত দেখা যায় না! তবু সে যে আছে খুব বেশী করিয়াই আছে, এবং তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় ত নাই! তাহার প্রত্যেকটি নিশ্বাসপতনের সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব যে অনুভূত হইতেছে! সে আছে যে তাহার রক্তের প্রবাহের মধ্যে, তাহার চিন্তায়, তাহার যাহা-কিছু-সমস্তের মধ্যে মিশাইয়া—স্বপ্নমায়া বিছাইয়া!…

চার বৎসর কি কম কথা?—এই সময়ের মধ্যে একটা কিছু কতখানি যে পুরাতন হইয়া যাইতে পারে, কেমন করিয়া সমস্তকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা যেন এই প্রথম বিমল অনুভব করিল।

মায়াকে সে যখন বলিয়াছিল, 'পারব', তখন সে যে একটা জিদের উপরই বলিয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিল। 'পারব' বলিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন বা কিছু করিতে পারাটা যে অনেক সময় মানুষের ক্ষমতার বাহিরের জিনিষ তাহা তখন সে জানিত না; আরও বুঝিল তাহার ঐ কথার মধ্যে একটা অভিমান ছিল।—একটা গর্ব্ব, পুরুষত্বের গর্ব্ব।

জানালার ভিতর দিয়া সরু সূতার মত আলো তাহার চোখে লাগিতেই সে মাথার বালিসটিকে মুখের উপর চাপা দিয়া ধরিয়া রাখিল। আলো তাহার চোখে যেন সহ্য হইতেছিল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতেই তাহার মনে পড়িল—চার বৎসর পূর্ব্বের কথা—প্রথম যেদিন সে বীরেন্দ্রনাথের দ্বারা আহূত হইয়া তাহার বাড়ীতে আসে।

মায়া তখন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে কি একখানি বই পড়িতেছিল। বেগুনী রঙের চুলপাড় সাদা সাড়ী, (ধুতি বলিলেও ভুল

হয় না) অত্যন্ত আঁট-সাঁট্ ভাবে পরা, চুড়িদার পাঞ্জাবীর মত বোতাম-আঁটা আস্তিনওয়ালা জ্যাকেট্ তাহার গলার কাছের ছাঁট্ কতকটা 'শেক্সপীয়র কলারের' মত, বাম হাতে বোতাম-আঁটা আস্তিনের উপর একগাছি সোনার রুলী, ডান হাতে কিছুই নাই। সিঁথি না কাটিয়া মাথার চুল টানিয়া পিছনের দিকে প্রকাণ্ড একখানি বেণী ঝুলিতেছে। হাতের আঙ্গুল এবং পা দুটি এত সুন্দর এবং ছোট যে দেখিলে বিস্ময় লাগে।

বিমলের পায়ের শব্দে ঈষৎ চকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গলাটিকে উঁচু করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে সোজাসুঝি বিমলের চোখের দিকে তাকাইতেই তাহার মাথাটি নত হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া সে বলিল—Dr. Mitra আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, প্রেস-সংক্রান্ত কাজের জন্যে, তাই—'

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ছোট্ট একটি 'ও' শব্দ শুনিয়া থামিয়া গিয়া বিস্মিত ভাবে মায়ার মুখের দিকে তাকাইতেই সে বলিল—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনি আসুন—'

বিমল মায়ার সহিত প্রথমে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী রুমের ভিতর দিয়া গিয়া যে ঘরখানিতে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে কেবল মোটা গদিওয়ালা চেয়ার, সোফা, টেবিল, ফুলদানি এবং ছোট ছোট water-colour sketch দিয়া ভরা। প্রত্যেকটি জিনিষ এমন পরিপাটি করিয়া সাজান যে, ঘরখানিকেই একটি ছবি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। ঘরের মেঝে বোখারা গালিচা দিয়া মোড়া। বিমলের মন কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত আসবাবপত্রের যিনি মালিক তাঁহার কথা ভাবিয়াও বিমল বেশ একটু দমিয়া আসিতেছিল—এমন সময় মায়া বলিল—আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

সে ঘরের অপর দিকে একটি ভিনিসিয়ান কাঁচের হাফ্ স্ক্রীনে একটু চোকা দিয়া বলিল—মেশো-মশাই, বিমলবাবু এসেছেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন—'

তাহার পরই ভিতর হইতে ব্যস্ততা-ভরা কথা শোনা গেল—কি আশ্চর্য্য! উনি বাইরে কেন? ভিতরে আসুন—' বলিতে বলিতে বীরেন্দ্রনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একপ্রকার প্রায় ছুটিয়া গিয়া বিমলের দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া তাহাকে বিপুল বলে একবার ঝাঁকানি দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—আপনি বিমল-বাবু? বিশ্বাস হচ্ছে না, এত ছোট আপনি!— I mean, লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছিল আপনি একটা—giant—' তাহার পরই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিমল লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—যদিও আপনাকে আবিষ্কার করার patent-টা মায়া কিম্বা শ্রীশের মধ্যে কার পাওয়া উচিত তা আমি এখনও ঠিক করতে পারি নি—আপনি শ্রীশের সঙ্গে পড়তেন, আর মায়া আপনাকে পড়ে—' তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন।

মায়া মনে মনে ভাবিল 'মেশো-মশাই-এর কিছু কাণ্ডজ্ঞান নেই'। মুখে বলিল—মেশো-মশাই, আপনার টেবিলে আজ ফুল দিয়ে যায় নি? আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র বিমলকে বলিলেন—আসুন আমার study-তে সেই খানেই সব কথা হবে।

সেই দিন হইতে বীরেন্দ্রনাথের study-তে বিমলকে প্রায় প্রতিদিন যাইতে হইয়াছে। কতবার মায়াকে দেখিয়াছে, কত কাজে দুজনে বসিয়া কথা কহিয়াছে, কত ভাবের আদান প্রদান করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রথম দিনের দেখাকে সে কিছু দিয়াই ভুলিতে পারে নাই

এবং প্রতিটি দিনের কথা-বলা, প্রতিটি দিনের সঙ্গ পাওয়াকে সে ঐ প্রথম দিনের স্মৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিত, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার নাগাল পাইত না।

কতবার সে মনের আবেগে কথা কহিতে গিয়া মায়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং পূজার ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ার প্রতি তাহার উচ্চ আশার কথা বীরেন্দ্রনাথকে সে বলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে কবে যে আপনার মনের নিভৃত কোণটিতে একটি বাসনার ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছে —যাহার গন্ধে সে আপনি বিভোর হইয়া ছিল এত কাল, আজ যেন প্রথম সেই খবর তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিল!

কিন্তু ও-ধূপ নিভাইতে হইবে—ও-বাসনার সমাপ্তি তাহারই সঙ্গে হওয়া চাই! মায়া বলিয়াছে—আপনার সমস্ত কাজে আমায় পাবেন বিমলবাবু, শুধু কাজে, কেমন?—'

কথাগুলি বড় করুণ, বড় সদয়, কিন্তু কি যেন নাই! কি নাই?—বোধ হয় প্রাণ। ঐ কথাগুলি যেন শিল্পীর হাতে-গড়া মূর্ত্তি! সবই আছে, কিছুরই অভাব নাই; তবু 'তাকে নিয়ে কি কর্‌ব?' এ প্রশ্ন মনে জাগে। বাঁচিবার পক্ষে, অবলম্বন বলিয়া ধরিবার পক্ষে উহাই কি যথেষ্ট?—কিন্তু কোন নালিশ চলিবে না। মায়া বলিয়াছে,—'স্থাবর কোন জিনিষের ওপর আমাদের জোর খাটে কিন্তু মানুষের বেলায় নয় বিমলবাবু, তার নিজের ইচ্ছে বলে একটা জিনিষও আছে—'

বিমল তাহার মাথার চুলগুলি একবার শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার ঐ বেদনার মধ্যে কেমন একটা লজ্জা তীব্রভাবে আঘাত করিতে ছিল—পরাজয়ের বা প্রত্যাখ্যানের লজ্জা। তাহার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেই তাহার মনে পড়িল—'আমি বুক ভ'রে এ সত্যকে অনুভব করেছি ব'লেই আপনাকে বল্‌তে পারলাম বিমলবাবু—'

মায়ার ঐ কথার মধ্যে কি এমন কিছুই ছিল না যাহা সমস্ত বেদনার উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারে !

—পারে, নিশ্চয়ই পারে—

বিমল বিছানা ছাড়িয়া একেবারে তাহার টেবিলে আসিয়া একখানি কাগজ লইয়া লিখিল—

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে কোন যোগ্যতার দরকার হয় না। যত বড়ই অপদার্থ হই, ওখানে আমার জন্যে একটা বাঁধা আসন যে রইল, এই কথা ভেবে খুব শান্তি পাচ্ছি মনে।—পাওয়ার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ঠাঁইটুকুর দাম নেই। আর আমার চাওয়াটা যে কোন স্বার্থ দিয়ে ভরিয়ে রাখি নি তা জেনেও মনে আনন্দ হচ্ছে। আজ বিছানা থেকে উঠেই আপনাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি !

আমার লেখাগুলো আর এখন পাঠালাম না। আপনার পরীক্ষা হ'য়ে গেলে দেবো। এ ক'মাস আপনার অন্য কিছুর ওপর মন দেওয়া ঠিক হবে না ! আমার মনের শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

বিনী-
শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য

চিঠিখানি শেষ করিয়া খামে বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হাতে পাঠাইয়া দিয়া তাহার মন যেন অনেকখানি হাল্কা হইল। তাহার পর স্নান

ইত্যাদি সারিয়া প্রতিদিনের মত তাহার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সংবাদ-সমালোচনা, প্রতিবাদ প্রভৃতির মধ্যে ডুবিয়া গেল।

কোন কাজেরই ত্রুটি হইল না। কেহ জানিল না, তাহার জীবনে কত বড় একটা বিপর্য্যয় হইয়া গেল। তাহার মুকুলিত আশাতরু এক জনের একটি কথার ইঙ্গিতে কেমন করিয়া এক পলকের মধ্যে শুখাইয়া গেল কেহ তাহার খবর পাইল না।

বিমলের ইহাই ছিল বিশেষত্ব। দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কেহ কোন দিন তাহাকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। সমস্ত বিষয়ে এবং সমস্ত সময়ে তাহাকে অত্যন্ত শান্ত এবং সংযত দেখা যাইত। তাহার জীবনের ধারা যে-পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহার অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, তাহার বাল্যজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা হইয়াছে পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে এবং নবদ্বীপের একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে। সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় পিতার এক বন্ধুর গৃহে থাকিয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়; তাহার পর একটি নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া সে যে-দিন পয়ত্রিশটি টাকা হাতে পাইল, সেদিন পিতৃবন্ধুর নিকট জানাইল—'এবার আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি নিজের ভার নিজেই নিতে পারব মনে হচ্ছে', এবং তাহার মত লইয়া একটি মেসে আসিয়া সিট্ লইল। তাহার পর সেইখান হইতেই বি-এ এবং এম্-এ পরীক্ষা দিয়াছে।

স্বভাবতই বাল্যকাল হইতে সাহিত্যের উপর তাহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল এবং বি-এ ক্লাসে উঠিয়া তাহা অত্যধিক ভাবে বাড়িয়া উঠে, ফলে সে আপনার একাগ্র চেষ্টায় ফরাসী ভাষা এবং এক মুসলমান বন্ধুর সাহায্যে উদ্দু ভাষা নিজের আয়ত্তের মধ্যে করিয়া লয়।

এই সময়েই শ্রীশ, জীবন প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় হয়। তাহা ছাড়া, বাংলা মাসিক-সাহিত্যে 'শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য' এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় B. B. চিহ্নিত রচনা বিশেষ আগ্রহের সহিত সকলে পাঠ করিত।

এম্‌-এ পরীক্ষা দিয়া কোন অধ্যাপনার কাজের জন্য দরখাস্ত করিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে লইয়া যান।

ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, চ ড়া কপাল, বাঁকানো পাত্‌লা নাক, ঈষৎ কুঞ্চিত নিখুঁত এক জোড়া গোঁফ্ এবং পুরুষোচিত পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য লইয়া সে যখন বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে একখান চেয়ারে বুক উঁচু করিয়া বসিল তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন—শ্রীশ সেদিন বল্‌ছিল—'He is well informed', কিছু মনে কর্‌বেন না, ঐটুকু বল্‌লে আপনার সম্বন্ধে হয় ত কিছুই বলা হ'ল না। কিন্তু শ্রীশটা ঐরকম বেশী কিছুই বলে না মানুষের সম্বন্ধে, আর অনেকখানি বিশ্বাস হ'লে তবে ঐটুকু কথাও খরচ করে। তবে মায়ার কাছ থেকে আপনার অনেক 'সার্টিফিকেট' পেয়েছি।

—দেখুন আমার একটা পৈতৃক প্রেস আছে। আমি নিজে ওর কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, শ্রীশও যে কোন দিন জান্‌বে তা বলে আমার বিশ্বাস হয় না। লোকে ওটাকে যে ভাবে চালাচ্ছে সেই ভাবেই চল্‌ছে। কিছু দিন থেকে আমার মনে একটা ভাল ক   ্ বের কর্‌বার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু কিসে যে ভাল হবে তা আমার জানা নেই। আপনি এই ভারটা নিতে পারেন কি? কিন্তু আপনাকে কোন দায়িত্ব নিতে হবে না, আপনি শুধু কাগজখানা যাতে সুন্দর হয়, সাধারণের কাজে আসে, তার চেষ্টা কর্‌বেন।

তাহার পর অনেক কথা এবং আলোচনার পর ঠিক হইল, মায়ার দেওয়া নামটাই কাগজে থাকিবে—এবং 'ভিটের মাটি' পনেরো দিন অন্তর প্রকাশিত হইবে।

প্রায় চার মাস ধরিয়া আয়োজন চলিল। তাহার পর নববর্ষের প্রথম দিনে 'ভিটের মাটি' সাধারণের চোখের সাম্নে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর এক বৎসর বিমলের বিশ্রাম ছিল না। কাগজখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য তাহাকে দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত।

বিমলের মন যখন সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন তখন তাহার অজ্ঞাতসারে একটি পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়া তাহার কাজ এবং চিন্তার ধারাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে লইয়া চলিয়াছিল। এবং এ পরিবর্ত্তনে তাহার পিতা ধূর্জ্জটিপ্রসাদ যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেও ঠিক সেইরূপ হইয়া ছিলেন।

নবদ্বীপ হইতে আসিয়া ধূর্জ্জটিপ্রসাদ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এই ঠিক করেছ বিমল ?—'

বিমল বলিল—আমার মনে হয়েছে এটা করা আমার উচিত বাবা।

ধূর্জ্জটি। আর কিছু দিন ত সময় নিতে পার ?

বিমল। তার দরকার নেই, কারণ এটা করব আমি ঠিক করেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদের চোখ দুটি আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করব বৈকি—যেখানে থাক যেমন খুশী থাক তাতে আমি কোন দিন বাধা দেবো না বিমল। তা'হলে তোমার মাকেও এই কথা গিয়ে বল্ব ?—

বিমল। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে জানাতে চাই।

ধূর্জ্জটি। না, সেটা ঠিক হবে না। অত্যন্ত হৃদয়হীন ব'লে ভাব্‌তে পারেন তিনি। জানই ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা।

বিমলের বুকের মধ্যে একটা করুণ ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

ধূর্জ্জটি বলিলেন—আর বোধ হয় এরই ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের বাইরের যোগের সূত্রটাও ছিঁড়ে গেল বিমল।

বিমল তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল—ধর্ম্মকে অস্বীকার করার মধ্যে আপনাদের অস্বীকার করার কোন সম্বন্ধ নেই বাবা—'

ধূর্জ্জটি হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—পাগল ছেলে, তা আর হয় না।

বীরেন্দ্রনাথের গৃহেই পিতা-পুত্রের এই কথা হয় এবং সে সময়ে তাঁহারা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তেজোজ্জ্বল গৌরতনু, খড়্গনাশা, দীর্ঘকায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদকে দেখিয়া সকলে যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে আরও বিস্মিত হইলেন। কি শান্ত ধীর আবেগহীন কথা, মনের প্রবল স্নেহের উপর একটা কেমন উদাসীনতার আড়াল দেওয়া আছে। এতখানি একটি ব্যাপারে একটিমাত্র রাগ বা অভিমানের উচ্ছ্বাস তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না! এবং তাঁহার প্রাণের তীব্র বেদনাটা অল্প একটু হাসির আড়ালে এমন করিয়া ঢাকিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন যেন কিছুই হয় নাই।

তিনি চলিয়া যাইতেই মায়া বিমলকে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বিমলবাবু, দীক্ষা নেবার বিশেষ কোন দরকার আছে কি? আপনার মত এবং বিশ্বাসটাই কি যথেষ্ট নয়? আজকাল দীক্ষা নেওয়া সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ এসেছে।

বিমল বলিল—আমার মনে হয় দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

ইহার উপর কোন যুক্তিই চলে না। তখন মায়ার পিতা চন্দ্রকুমার রায় কলিকাতায় ছিলেন। বিমলের অনুরোধে তিনিই আচার্য্য হইয়াছিলেন।

দীক্ষার দিন ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরের মানুষ যেমন তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিল—সমাজের ভিতরের মানুষও মুচ্‌কি হাসির আড়াল দিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—'Some spider must have said'—'Come into my parlour'—poor fly !—'

ইহার পর তিন বৎসর সে প্রাণ দিয়া সমাজের কাজ করিয়াছে। এবং বীরেন্দ্রনাথের পত্রিকার জন্য খাটিয়াছে—তাহাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে।

সেদিনকার মেলামেশার প্রায় একমাস পরে একদিন বিমল বীরেন্দ্রনাথকে আসিয়া বলিল—আমি একা একা আর পারছি না। শ্রীশকে আমার কাজের আধখানা নিতে বলুন না। ক্রমেই কাজের মাত্রা বেড়ে উঠ্‌ছে!

শ্রীশ বলিল—ও বাবা, সে আমি পারব না। নিয়মিত ভাবে কিছু করা-টরা আমার দ্বারা পোষাবে না। তবে যদি বল, তোমার লেখকদের মধ্যে permanent ভাবে জায়গা নিতে পারি, তারই কিছু দায়িত্ব আমায় দিতে পার। কিন্তু টাকাকড়ির হিসেব, ছাপাখানার মালমসলা কেনা—ওসব আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না।

বিমল হাসিয়া বলিল—তাহ'লে একজন substitute দাও।

শ্রীশ বলিল—আমার মনে হয় জীবন তোমার খুব সাহায্য করতে পারবে।

বীরেন্দ্রনাথও কথাটি খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং সেই দিনই জীবনকে ডাকাইয়া তাহার অভিপ্রায় জানাইলেন।

জীবন বেচারী এতদিন একটু মুশকিলে পড়িয়াছিল, কারণ, মুনির মা বাবা ভাই-বোন প্রভৃতি সকলে সম্বলপুর হইতে আসার দরুণ তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছে। সে এখন তাহাদের সহিতই আছে এবং বিকাশ যেন দিন দিন বীরেন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার 'কাজ ইত্যাদির অবহেলা হইতেছে' এই কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াও কোনও ফল হয় নাই।

সুপ্রকাশও আর তাহার ঘরে বেশীক্ষণ থাকে না, তাহার কি যেন 'মেলাই কাজ' ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছে তাহার অবসর নাই! এবং শ্রীশকে কোন্ সময়ে যে বাড়ীতে পাওয়া যায় তাহা এ পর্য্যন্ত কোন গুণী জ্ঞানী বলিতে পারেন নাই। কাজেই জীবনের প্রাণটা 'মায়াময়' হইয়া থাকিলেও কিছুতেই তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছিল না। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিল—আমি এটাকে একটা সৌভাগ্য ব'লে মনে করি, আমাদের দেশে কাজ বল্‌তে 'চাকরী' বোঝায়, কিন্তু ওটার ওপর আমার কোন দিন শ্রদ্ধা নেই, তাই আমি দিন দিন 'অকেজো' হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম, আপনার 'ভিটের মাটিতে' খেটে খুটে যদি ভাল জিনিষ বা'র কর্‌তে পারি সেটাই আমার মস্ত লাভ হবে ডাঃ মিত্র।

সমস্তই ঠিক হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে বাসায় ফিরিয়া জীবন বিকাশকে বলিল—দেখ আমায় এখন থেকে অনেকখানি সময় বিমল-বাবুর সঙ্গে হীরাতলায় 'ভিটের মাটি' প্রেসে থাকতে হবে।

বিকাশ এ সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। কিন্তু এমন বিস্ময়ের ভান করিয়া কিছুক্ষণ জীবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কিছুই সে

বুঝিতে পারে নাই। জীবনও পাছে বিকাশ মনে আঘাত পায় এই আশঙ্কা করিয়া তাহার উদ্দেশ্য ইত্যাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বিকাশ কিন্তু অত সহজে বুঝিতে চাহিল না—অভিমানের সুরে বলিতে লাগিল—তা ত যাবেই, এখন আমি আর কে বল? জানা গেছে সক্কলকে! মুনিটা একবার আমার সঙ্গে দেখা করবারও আর সময় পায় না। এই এক মাসে বড়জোর চার দিন এসেছিল, তাও পালাই পালাই। সাড়ে পাঁচটা বাজলেই দম-দেওয়া পুতুলের মত লাফিয়ে ওঠে।

জীবনও উল্টা চাপ দিল—আর তুমিই বা কি কম? এই এক মাসের মধ্যে একদিনও বলেছ বায়স্কোপে চল? ম্যাচ দেখা, মার্কেট বেড়ান! সে সব কথা আর মনে আছে তোমার? আমি বেচারী একটা কাজ পেয়ে খাটতে যাচ্ছি তাতেও রাগ?—

বিকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুন-গুন করিয়া গান ধরিল—

সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও—'

জীবন চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর দুই বন্ধুতে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অনেক বিষয়ে কথা কহিল, অনেক ছবি আঁকিল; কিন্তু সে সমস্ত কথা, সে সমস্ত ছবির অন্তরালে, একটা জমাট অন্ধকারের অস্তিত্ব উভয়েই অনুভব করিতেছিল এবং তাহা সমস্ত আশা-ভরসার উপর যেন একটা ভার হইয়া চাপিয়া বসিতেছিল, তাহাকে সরাইবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

—১৪—

পরের দিন হইতে জীবন বিমলের কাজের অংশ লইয়া প্রাণপণে খাটিয়া যাইতে লাগিল। সাহিত্যানুরাগী মানুষ সাধারণতই অকর্ম্মণ্য হয় এবং অনেক বিষয়ে তাহারা এমন অসহায়ভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে যে, দেখিলে দুঃখ হয়—ভুলত্রুটি তাহাদের হইবেই, স্মরণশক্তি তাহাদের মোটেই প্রখর নয়, মানুষের কথা, মানুষের মুখ বা সমস্ত মানুষটাকে বেমালুম ভুলিয়া যাওয়াটা তাহাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর্টিষ্ট বা বেহালাবাদক হইলেই যেমন লম্বা চুল থাকিবে, সাহিত্যিক হইলেই তেমনি স্মরণশক্তির অল্পতা হওয়া চাই। বিশেষত উড্ডীয়মান, অর্থাৎ—উদীয়মান সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে সাহিত্যরথিগণকেও হার মানান্। কিন্তু জীবনের এ সমস্ত বালাই ছিল না। মেয়েলি ছাঁদের ন্যাকামী চালিয়া টানিয়া টানিয়া কথা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাও সে কোন দিন মক্স করে নাই। তাহার মাথার চুল কিছু লম্বা হইলেও ক্যাষ্টর অয়েল সংযোগে কাবুল্ করিবার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও না। অথচ এ সমস্ত অবহেলা করিয়াও সে লিখিতে পারে এবং যাহা লেখে তাহা মানুষের বুকে গিয়া ধাক্কা দেয়, কিন্তু তাহার কোন বিশেষত্ব ছিল না এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে। সবুজ কালিভরা প্রকাণ্ড একটি ফাউনটেন পেন ক্যালেনডারযুক্ত গান্‌মেটলের ক্লিপ্ দ্বারা বদ্ধ হইয়া তাহার জামার পকেটে থাকিত এবং ইহার বিরহ সে কোন দিন সহিতে পারিত না।

জীবনকে সহকারিরূপে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি জিনিষ বিমল লাভ করিল। সে এত দিন যেমন একটানা ভাবে দিন কাটাইত

এখন আর তেমন হইল না। জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আফিস-কামরাখানি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল।

কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না থাকিলেও হাসি, গান, টিপ্পনী সমানভাবেই চলিত, কাজের অবসাদ মনে জমা হইয়া উঠিতে পারিত না। জীবনের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বিমল ভাবিত—মানুষটা সত্যি চমৎকার।

কিছু দিন হইতে বিমল বীরেন্দ্রনাথের বাড়ী যাওয়া প্রায় এক-রকম ছাড়িয়া দিয়াছে, বিশেষ করিয়া গত এক মাসের মধ্যে শনি বা রবিবার সে ওখানে কোন দিন যায় নাই। ইহার জন্য সে শতবার আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে, যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া ট্রামে চাপিয়া শুরকিগঞ্জ যাইতে হইলে যেখানে নামিতে হয় সেখানে না নামিয়া বরাবর ট্রাম-ডিপো পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। শেষে—'আমি কাপুরুষ' বলিয়া সে হাল ছাড়িয়া দিল।

যখন কাজের ভার অসহ্য লাগে সে মাঝে মাঝে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়া যায়, খুব খানিক ঘুরিয়া আবার কাজ করিতে বসে।

জীবনই এখন বীরেন্দ্রনাথের কাছে যায় এবং প্রেস সম্বন্ধে সমস্ত কথা তাঁহাকে বলে, রচনা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করে এবং রবি-বারের 'ব্রেকফাষ্টটা' তাহার এখন ঐখানেই হয়।

যে চেয়ারটিতে বিমল প্রায় চার বছর বসিয়া গিয়াছে সেইখানেই জীবন এখন বসে। সেদিন মায়া বলিয়া ফেলিল—মেশোমশাই, প্রায় দুমাস বিমলবাবু আসেন নি—তাঁর শরীর অসুস্থ নয় ত?

জীবন উত্তর দিল—ঐ এক অদ্ভুত ছেলে, শুধু নিজের খুশীটা নিয়ে আছে। আর তার খুশীর উপর কারো হাত দেবার অধিকার নেই। সেদিন ও যখন বেড়াতে বেরুল তখন বেলা আড়াইটে, ফিরে এল রাত

আটটায়, বল্‌ল—আজ কতকগুলো লেখা মনে ঠিক [illegible] নিয়েছি, এবার কালি কলমে বেঁধে রাখি, ব'লে তখুনি [illegible] বস্‌ল—তার পর আমি বাসায় ফিরে গেছি। সকালে গিয়ে দেখি টেবিল-ল্যাম্পটা তখনও জ্বল্‌ছে আর টেবিলে মাথা রেখে ও ঘুমিয়ে আছে।

মায়ার মন বেদনায় ভরিয়া গেল কিন্তু তাহার মুখের হাসি ম্লান হইল না, বলিল—এবার উনি কবি হ'য়ে তবে ছাড়বেন দেখ্‌ছি, কিন্তু আমাদের কাছে মধ্যে মধ্যে এলেও তিনি তা হ'তে পার্‌তেন।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—সত্যি এ কিন্তু বিমলের ভয়ানক অন্যায়। তুমি তাকে ব'ল জীবন—আমি তার ওপর ভয়ানক রাগ করেছি।

করুণা এতদিন বিকাশকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও আজ বিশেষ করিয়া বিমলের অনুপস্থিতি তাহার মনে পীড়া দিতেছিল। তিনি বলিলেন—সপ্তায় একটা দিন বিশ্রাম নেওয়া খুব উচিত, এটা বিমল ভারী অন্যায় কর্‌ছে।

কিন্তু বিমল অন্যায় করিতেই থাকিল, বিশেষ কা[illegible] মায়ার কাছে। সে কিছুতেই মায়ার কাছে আসিবার বা তাহার সহিত কথা কহিবার সাহস পাইত না। মায়ার কথা মনে হইবামাত্র তাহার মধ্যে যেন একটা বিপ্লবের সূত্রপাত হইত।

একদিন কাজ করিতে করিতে বিনা আড়ম্বরে জীবন [illegible]—দেখ বিমল, আমি মায়াকে ভালবাসি—'

খানিকটা রক্ত ছলাৎ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলে মানুষ যেমন হইয়া যায় তেমনি বিবর্ণমুখে বিমল জীবনের দিকে চাহিয়া রহিল।

জীবন বলিল—*But I am going to treat this like a man*—যা হয় একটা ঠিক্ ক'রে ফেল্‌তে চাই, দিনের পর দিন শূন্যে

ঝোলা-টোলা আমার দ্বারা বেশী দিন হ'য়ে উঠবে না—I must know the ground on which I am going to land.

বিমল শুষ্ককণ্ঠে বলিল—কি করবে ?—

জীবন সহজ স্বরে বলিল—তাঁকে বল্‌ব।

তাহার পর জীবন তাহার কাজে মন দিল, কিন্তু বিমল কিছুতেই আপনার মনকে সংযত করিতে পারিতেছিল না, সে এক সময়ে নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই বলিল—দেখ, আর কিছু দিন গেলে হ'ত না ? তাঁর এখন পরীক্ষার সময়—'

জীবন হাসিয়া উঠিল। বলিল—You are a baby—No woman is sorry or upset because she is loved ; এই ক'মাসের মেলামেশায় তিনি আমাকে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমিও হয় ত বুঝ্‌তে দিয়েছি বেশী গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে। এবার সেইটা পরিষ্কার ক'রে দিতে চাই।

আরও কিছুদিন কাটিল ; বিমল জীবনকে আর কোন প্রশ্ন ইহার মধ্যে করে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। ঐ দেখার ভিতর দিয়া সে জীবনের মনের ভাবটি পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কেন যে করিত তাহার কারণ সে নিজেকেও বলিতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জীবন বিমলের ঘরে আসিয়া শিস্‌ দিতে দিতে পায়চারি করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইল। তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বিমলের পাশে বসিয়া জীবন বলিল—তোমার মনে আছে বিমল, শ্রীশের সেইদিনকার কথাটা ? 'মাল খরিদ কর্‌বার সময় যদি তোমার টাকার থলিটা চুরি যায়, তাহ'লে কি বুঝ্‌তে হবে জগৎটা গাঁটকাটার আড্ডা ?' মনে নেই ?—

বিমল। আছে, তাতে কি ?—

জীবন। আমি সেদিন চুপ করেছিলাম, ওকে কিছুই বলি নি—আজ তোমাকে বল্‌ছি—সত্যি জগৎটা গাঁট্‌কাটার আড্ডা !— What a vegetable we look when we see our purse stolen !

বিমলের নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল !

জীবন বলিল—আজ তাঁকে সব বলেছিলাম।

বিমল। তিনি কি বল্‌লেন ?—

জীবন। সে শুনে কি লাভ হবে ? সে কথা যত দামীই হোক্, যত বেশী করুণাই থাক্ তার মধ্যে, তাতে আমার কি এল গেল ?—কিছু না। শুধু সে আমায় নিল না—এটাই কি ঢের নয় ?

বিমল বলিল—আমাকে সব কথা বল্‌তে তোমার আপত্তি আছে ?

জীবন একবার তাহার কপালটাকে একটু কুঞ্চিত করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল,—আমি বেশ সোজাসুঝি ভাবেই তাঁকে বল্‌লাম—আপনাকে ভালবাসি একথা বল্‌লে কি আপনার অপমান করা হবে ?—কিন্তু ওটা সত্যি। এতগুলো মাস আমি আপনার ভাবনা ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তেই পারি নি কিন্তু আর কিছু বল্‌বার পূর্ব্বে শুন্‌তে চাই এতে আপনার অপমান হ'ল কি ?—

তিনি বল্‌লেন—আপনি আমার নারীত্বের মর্য্যাদা [illegible]লেন জীবনবাবু, ধন্যবাদ !—

'নারীত্বের মর্য্যাদা', অর্থাৎ—the devil's due বিমল ! but don't take it seriously. তারপর তিনি করুণা ক'রে বল্‌লেন—আপনাকে আমার বন্ধু ভাবে পেলে বড় সুখী হ'ব—' এমন হাসি পেয়েছিল শুনে—

বিমল। তুমি কি বল্‌লে ?—

জীবন। আমি বল্‌লাম—আর কেউ হ'লে ... ভাবে সুখী করতে পারত, কিন্তু আমি পারব না। আমার ভালবাসাটা এই খানেই শেষ ক'রে ফেল্‌তে চাই।—তুমি আমায় ভালবাসবে না অথচ আমি তোমার জন্যে রাত জেগে কবিতা লিখব, ছট্‌-ফট্‌ করব, সে মানুষ আমি নই। তুমি আমার চোখের সাম্‌নে আর একজনকে ভালবাস্‌বে বা দশ জনকে খুশী করবে আর আমি কাঙ্গালের মত তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ব, সে মানুষও আমি নই। আমাকে অবহেলা ক'রে চলে যাবে, তবু আমি কাদার মত তোমার পায়ে লেগে থাক্‌ব, সে মানুষও আমি নই।—আমি চেয়েছিলাম তোমাকে, আমি দিতে চেয়েছিলাম আমাকে, দিলে না নিলে না।—ব্যস্‌ চুকে গেল, সামাজিকতার সৌখিন এবং ভদ্র আলাপ ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ রইল না মায়া। এই প্রথম আমি তোমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌লাম আর এই শেষ।

বিমল। তিনি কি বল্‌লেন ?

জীবন। বল্‌লেন—মানুষের নেবার শক্তির সীমা নেই কিন্তু দেবার শক্তির সীমা আছে, তাই তার এত অশান্তি।

আমি বল্‌লাম—ওটাকে উল্টেও বলা যেতে পারে।

তিনি বল্‌লেন—সে যাই হোক, আমি আপনার কাছে যা পেলাম তা ভুল্‌ব না কোন দিন, কিন্তু কিছু যে দিতে পার্‌লাম না, তার জন্য যে দুঃখ রইল আমার মনে, তাও মুছ্‌বে না কোন দিন।

ঐ কথার মধ্যে বিমল যে কি পাইল—তাহা সে-ই জানে—তাহার চোখ দুটি ভরিয়া আসিল ! সে উঠিয়া জীবনের কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিতেই সে বলিয়া উঠিল—না, ওটা আমি চাই না বিমল,

বিমল। আছে, তাতে কি? বলেছি আমার ... সব চেয়ে বি

জীবন। আমি সেটা আমার ধাতে নেই—Now to work.

—কাজ—কাজ—ব্যস্। আর কিছুই না। দেখ বিমল, আমার আজ একটা কথা মনে হ'ল—মানুষের চেয়ে কাজগুলোর একটু বেশি দয়া আছে, যতক্ষণ চাও ততক্ষণ ওকে পাবে! ... পাবার জন্যে 'হত্যে' দিয়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয় না ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এই কথার পর হইতে দুজনের মধ্যে কেমন একটা সহানুভূতির বন্ধন পড়িয়া গেল। কিন্তু দুজনেই যত দূর সম্ভব তাহাদের সমস্ত রকমের আলোচনার মধ্যে মায়াকে দূরে রাখিয়া চলিত, কিছুতেই তাহার নাম করিত না।

একদিন কিন্তু বিমল কথায় কথায় বলিল—আচ্ছা জীবন, মায়ার ওপর তোমার রাগ হয়?

জীবন হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ পাগ্‌লা, তার অপরাধ?—She is the most decent girl that I have ever come across. এমন সহজ সুর একটা ওর মধ্যে আছে যেটাকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকা যায় না।—ওর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়েছি যে বলে এলাম, তার মানে ও যেন না এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার সম্বন্ধে ভেবে কষ্ট পায়। তাই ব'লে শ্রদ্ধা হারাব কেন? I adore her,—এ শ্রদ্ধা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। তার আঁচল-ছেঁড়া কাপড়টা আজও আমার কাছে আছে কিন্তু তাকে বলি নি সে-কথা, আর বল্‌ব নাও কোন দিন।

তাহার পর তাহারা কাজে মাতিয়া উঠিল; কাহারও হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ নাই কিন্তু 'ভিটের মাটি'তে স্বর্ণ শস্য ফলিতে লাগিল।

—১৫—

হাঁরে খুকি, তুই যে অমন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে রইলি? মনে ভেবেছিস্ কি?—

কি আবার ভাব্ব?

কি আবার ভাব্ব? ভাবনার ত শেষ দেখ্তে পাচ্ছি না। যখনই দেখি, এই চেয়ারে শুয়ে হাঁ ক'রে কড়িকাঠ গুণ্ছিস্! পড়্তে শুন্তে হবে না?—

না।

আ ম'লো যা! না বল্তে তোর লজ্জা করছে না?—

একটুও না!

মরণ আর কি!—

তা যাই বল—আমার দ্বারা আর ফেল্ করা পোষাবে না। একটা মানুষের জীবনে দুবারই যথেষ্ট।

দুবারেও যদি না তোমার মুখ পুড়ে থাকে তিনবারেও পুড়্বে না ও পোড়ামুখ; ন্যাকামী ছেড়ে একটু মন দিয়ে আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্।—আর গল্প লেখা একটু কামাই দে।

আমাকে কেটে ফেল্লেও তা হবে না।

হবে না কি, হ'তেই হবে।

ইহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না কিন্তু খুকি হাত তুলিয়া একটু আড়া-মোড়া খাইয়া ইজিচেয়ারে দিব্য আরামে পড়িয়া রহিল; এবং তাহার পাশেই যে আর একটি মানুষ হাজার যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে

পড়িতে অনুরোধ করিতেছিলেন তাহা যেন সে শুনিনেই পাইতেছিল না!

ঘরের ভিতরে যখন এই ব্যাপারটি চলিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে একটি ভদ্র যুবক বাহিরে ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া দুই পাশের দুই ট্যাব্‌লেটের দিকে তাকাইয়া পড়িতেছিল—নাইন্‌টি নাইন্, মিষ্টার পি, কে, মজুমদার—সলিসিটর। তার পর একবার ঘড়ির দিকে চাহিল—সাড়ে চারটে! Too early—সে ফটকের সাম্‌নে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিল—Better early than late—সে ফটকটিকে অল্প একটু ঠেলিয়া তাহার শরীরটিকে ভিতরে চালান্ করিবার মত ফাঁক্ করিয়া নিল—তাহার পর অত্যন্ত ধীরে ধীরে বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার কাছে শব্দ হইল—কে ও—অ খোকা—খোকা—খোকা।—

কি সর্ব্বনাশ! যুবকটি ঘামিয়া উঠিল। সে পাখীটির কাছে আসিয়া শিস্ দিতেই সে খাঁচার তারের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিল হ্যালো স্যালাম।—

যুবক হাসিয়া বলিল—স্যালাম।—

পাখী হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর খক্ খক্ করিয়া কাশির ধূম পড়িয়া গেল, থুতু ফেলার শব্দ করিল এবং শেষে প্রশ্ন করিল—তুই কলা খাবি?—আঁ খাবি?—খাবি?

বারান্দার ডান দিকে একটি ঘরের জানালা হইতে একটি আট দশ বছরের বালক যুবকটিকে দেখিতেছিল। সে বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল—কাকে চান্?

যুবকটি তখন পাখী দেখিতে এবং তাহার সহিত কথা কহিতে ব্যস্ত; হঠাৎ এই প্রশ্নে তাহার মনে পড়িল—সে চিড়িয়াখানায় আসে

নাই এবং এখানে আসিতে হইলে কাহাকেও প্রয়োজন থাকা চাই বা কোন প্রয়োজনে এখানে আসিতে হয়। বালকটি তখনও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া কি যে বলিতে হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

আবার প্রশ্ন হইল—আপনি কোত্থেকে আস্ছেন ?—

যুবক এতক্ষণ পরে বলিল—কল্যাণী দেবী আছেন কি ?—

বালক অবাক্ হইয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন ঐ নামটা সে তাহার দিদির বই এবং খাতায় লেখা দেখিয়াছে, সে আবার প্রশ্ন করিল—খুকি-দি'কে চান ?

যুবক বলিল—মিস্ মজুমদারকে চাই,—তোমার নাম খোকা ?—

বালকটি গম্ভীরভাবে বলিল—ও নাম আর কাকেও বল্‌তে দিই না, শুধু ঐ পলিটা এখনও ডাকে। আমার নাম রণজিৎ। খুকি-দি'কে কি বল্‌ব ? আপনার নাম ?

যুবক বলিলব—বসন্তকুমার দে।

'খুকি-দি' তখন তাহার চেয়ারে তেমনি ভাবে বসিয়াছিল, বালক আসিয়া খবর দিল—বসন্তবাবু তোমায় ডাক্‌ছেন।

খুকি-দি অবাক্ হইয়া বলিল—বসন্তবাবু!—আমাকে ?

রণজিৎ। হাঁ। বল্‌লেন—কল্যাণী দেবী, মিস্ মজুমদার আছেন ? তিনি পলির সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। বাঁদর পলিটা ওঁকে কি বলেছে জান খুকি-দি ? বল্‌লে—তুই কলা খাবি ?

খুকি-দি বলিল—বেশ করেছে, পলি মানুষ চেনে। কে আবার জ্বালাতে এল ! চল তোমার বসন্তবাহার বাবুকে দেখে আসি। মনে মনে বলিল—আমার কাছে কেন বাবা, এ রিজার্ভ কম্পার্ট্‌মেণ্ট, নো

রুম্‌স্‌, অন্যত্র চেষ্টা দেখ্‌তে পার। কিন্তু হলে আসিয়াই দরজার ফাঁক দিয়া যুবকটিকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, এ যে মুনিবাবু! আসুন ভিতরে। খোকা বল্‌ল—বসন্তবাবু এসেছেন, আমি ত বুঝ্‌তেই পারি নি বসন্তবাবু কে?—আপনার নাম বসন্তবাবু নাকি?—

মুনি। ওটা পোষাকী নাম। কিন্তু আপনারটা ... দেখ্‌ছি তাই।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—জান্‌তে পেরেছেন নাকি ... চয় খোকা বলেছে।

মুনি। ওর ঠিক্‌ দোষ নাই, কল্যাণী দেবী শুনে ও ...বাক্‌ হ'য়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বল্‌ল—খুকি-দি'কে চান? আর রণজিতের নামটা পলিই আমায় বলে দিয়েছে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—পলিটা নাকি খুব আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করেছে?—

মুনি হাসিয়া বলিল—হাঁ, চমৎকার কথা বলে, আর এত স্পষ্ট!

কল্যাণী বলিল—আপনি এক মিনিট বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।

সে একটি ঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ পরে যাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং ইনি আমার মা, মুনিবাবু,—বলিয়া পরিচয় করি... দিল, মুনি তাঁহাকে 'মা' বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পা...তছিল না।

কল্যাণীর অপেক্ষা তিনি মাথায় বড় নন্‌, বরং আরো রোগা এবং বয়স খুব বেশী হইলেও কল্যাণীর অপেক্ষা পাচ বছরের বেশী দেখায় না, যদিও ঠিক তাহা নয়। তামাটে রং মুখখানি যেন খোদাই করা! টানা টানা দুটি চোখ, ছোট কপালটি দেখিলে ছবি বলিয়া মনে হয়।

কল্যাণীকেও অত্যন্ত সুন্দর দেখিতে কিন্তু দুজনের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। দুই জনে যেন দুটি বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি! কিন্তু মা'র সঙ্গে রণজিতের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মুনি রণজিৎকে একবার দেখিয়া মা'র মুখের দিকে চাহিতেই কল্যাণী হাসিয়া বলিল—ছাঁচ্ মেলাচ্ছেন? সত্যিই এটা ওরই মা, আমার নয়। আমার এটা ডাইনী-মা, সৎমা—' কল্যাণী মাকে আর একটু জড়াইয়া ধরিল।

মিসেস্ মজুমদার মুনিকে বলিলেন—আপনার কাছে ত আমরা ঋণী আছি এক বিষয়ে, আপনার কথা কল্যাণীর কাছে অনেক শুনেছি—'

এই সময়ে রণজিৎ হঠাৎ মুনির পাঞ্জাবীর আস্তিন উঠাইয়া তাহার হাতের কব্জি টিপিয়া দেখিতে লাগিল।

মুনি হাসিয়া বলিল—কত শক্ত করতে পারি দেখ্বে?

রণজিৎ মুনির হাত টিপিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—আপনি এক ঘুঁসিতে একটা লোকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন? ডগ্লাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্'-এর চেয়েও আপনার গায়ের জোর? এডি পোলো?

মিসেস মজুমদার বলিলেন—ও আপনার সেদিনকার মারামারির কথা শুনেছিল কল্যাণীর কাছে। সেই থেকে ও কেবলই নিজের হাতের গুল্ টিপ্ছে আর গাঁট্টা পাকাচ্ছে। বালিশের ওপর বক্সিঙ্ লড়ছে।

মুনি রণজিৎকে বলিল—আমি তোমায় বক্সিঙ্ লড়তে শেখাব।

রণজিৎ এত সহজে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে রাজী হইল না, বলিল—রমাপতি পণ্ডিত মশায়ের চেয়েও আপনার গাঁট্টা শক্ত? তাঁর হাতে 'গুলাপী গাণ্ডেরী' খেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন?

মুনি বলিল—সে কি জিনিষ?

রণজিৎ বলিল—পড়া না হ'লে মাথার চাঁদিতে এমনি ক'রে চাঁটি ক'রে লাগিয়ে দেন, তার নাম হ'ল 'গুলাপী গাঙেরী', তার পর 'চাঁটি তেলাঙ্' 'চটা বাঁশতলা' 'মধমোড়া' এ সব বড় কম নয়।

মিসেস্ মজুমদার বলিলেন—ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠ্‌বেন না। কল্যাণী, তুই বস্, আমি কিছু চায়ের জোগাড় দেখি।

কল্যাণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বস, আমি চা কর্‌ব।

মিসেস্ মজুমদার কল্যাণীকে জোর করিয়া বসাইয়া বলিলেন—ছোট ছোটর মত থাক—তিনি হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কল্যাণী মুনিকে বলিল—এমন মা কোথাও দেখেছেন?

মুনি বলিল—চমৎকার!

বাস্তবিকই মিসেস্ মজুমদারের মত মা বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না, এবং তাঁহার যখন বিবাহ হয় তখন কল্যাণীর বয়স ছিল ছয় বৎসর। তখন হইতেই মাতৃত্বের অধিকারকে তিনি এমন ভাবে কল্যাণীর উপর দিয়া খাটাইয়া আসিয়াছেন যেন কল্যাণী তাঁহারই কন্যা।

তিনি নিজে গরীবের ঘরের মেয়ে ছিলেন। লেখাপড়া বেশীদূর করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুবিধা হয় নাই। প্রবোধ মজুমদারের স্ত্রী-বিয়োগের দুই বৎসর পরে এবং একটি ছয় বছরের মেয়ে থাকিতেও যখন তিনি একদিন বলিলেন—মনীষা, আমার বাড়ীটা দিন দিন যা লক্ষ্মী-ছাড়ার মত হ'য়ে যাচ্ছে, ওটাকে নিজের ক'রে নিয়ে আমাকে একটু শান্তি দিতে পার না? কল্যাণীটার অযত্ন আমি সইতে পার্‌ছি না আর—

মনীষা বিনা দ্বিধায় সম্মত হইলেন। তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন—প্রবোধবাবু তোর চেয়ে প্রায় দশবছরের যে বড়! মনীষা বলিলেন—

—তা কি করব! কিন্তু উনিই প্রথম আমায় বিয়ে করতে চেয়েছেন। আমার বয়স আঠার পার হ'য়ে গেছে, 'ওল্ড মেড্' হয়ে মরবার ইচ্ছে আমার নেই।

বিবাহ হয়ে গেল! শুধু তাই নয়, তখন প্রবোধের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইলেও একদিন মনীষার মুখখানি তুই হাতে ধরিয়া বলিলেন—তোমাকে আমার ভগবানের আশীর্বাদ ব'লে মনে হচ্ছে মনীষা—

মনীষা তাহার অশ্রুধৌত মুখখানি প্রবোধের বুকের উপর রাখিয়া ভাবিয়াছিল—মেয়ে-মানুষের এর চেয়ে আর কি চাই? তাহার পর প্রায় বার বৎসর বিবাহিত জীবন-যাপনের পরও তাঁহার শরীরের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। এবং পুরুষ-সুলভ লম্বা চওড়া কল্যাণীর শরীরের পাশে দিনে দিনে তাঁহাকে যতই ছোট দেখাইতেছিল ততই যেন তাঁহার মাতৃত্বের অভিমান এবং মর্য্যাদা বাড়িয়া যাইতেছিল! তিনি যে কল্যাণীর মা তাহা সকলকে এবং বিশেষ করিয়া কল্যাণীকে বুঝাইয়া দিতেন এবং এই স্নেহময়ী জননী বা বন্ধুর বুকে কল্যাণী অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান পাইয়া জগৎকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, তাহার চোখে সমস্তই সহজ সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল, ছলনা চাতুরী গোপন করিবার চেষ্টা—এসব তাহার মনে ঠাঁই পায় নাই।

মুনি এবং কল্যাণীকে গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রণজিৎ কখন উঠিয়া গিয়াছে। কেন যে তাহারা আজ কথা বলিতে পারিতেছিল না তাহা তাহারা জানে না, কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধে চিন্তা যে তাহাদের মনে অনবরত জাগিতেছিল তাহা বুঝা যায়।

এক সময়ে কল্যাণী বলিয়া ফেলিল—এতদিনে আপনার আস্‌বার সময় হ'ল?

কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কান দুটি যে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল।

মুনি বলিল—আপনাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে অনেকবার বেড়িয়ে গেছি কিন্তু কি জানি কেন ঢুকতে সাহস হয় নি।

কল্যাণী। আজ কি ক'রে হ'ল—?

মুনি হাসিয়া বলিল—আজ প্রায় এক রকম মরিয়া হ'য়ে গিয়েছিলাম।

কল্যাণী। এই রকম 'মরিয়া'টা আরও দু দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল আপনার।

মুনি। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিটা অনেক সময় পরে আসে। এলে আপনি খুশী হতেন?—

কল্যাণীর ভিতরটা রাগে ফুলিতেছিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলে—আপনি এলে আমি কৃতার্থ হতাম, কিন্তু মুনির করুণ চোখদুটির দিকে তাকাইয়া তাহার অভিমান চলিয়া গেল, বলিল—তা জান্‌তেই হবে?—আমার দুর্ব্বলতাটুকুর ওপরই কি সব নির্ভর করছে?

মুনি। ওটাকে দুর্ব্বলতা ভাব্‌ছেন কেন? আপনি খুশী হ'লে তবেই ত আমি আস্‌তে পাব, বিরক্ত হ'লে আমি চলে যেতে বাধ্য হব কল্যাণী দেবী, মাফ্‌ করবেন, আপনার নাম ধরে ডাক্‌লাম।

একটা অজ্ঞাত পুলকের শিহরণ কল্যাণীর শরীরটিকে যেন পাগল করিয়া দিতেছিল। সে পা দিয়া কার্পেটের উপর দাগ কাটিতে কাটিতে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—না আর বেরিয়ে যেতে হবে না আপনাকে—

এবার সুখের ভারে মুনির মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—তাহার ইচ্ছা করিতেছিল কল্যাণীর মুখটিকে তুলিয়া তাহার চোখদুটি নিজের চোখের উপর রাখিয়া দেখে উহার মধ্যে আরো কি লুকান আছে তাহার জন্য।

এই সময় মনীষা ডাকিয়া বলিলেন—ওরে কল্যাণী, মুনিবাবুকে নিয়ে আয়, চা তৈরী—'

কল্যাণী হাসিয়া মুনিকে বলিল—চলুন—

তাহারা সবে টেবিলে বসিয়াছে এমন সময় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জন মানুষ ডাইনিং রুমের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমার যেন ক্ষিদে পায় না।—

কল্যাণী এবং রণজিৎ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—ওমা—বাবা!—

মনীষা বলিলেন—তুমি আজ দেরী করেছ। ব'সে পড়, উনি মুনি-বাবু—

মুনি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। নমস্কার করিয়া বলিল—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি—'

প্রবোধ হাসিয়া বলিলেন—গুণ্ডামির পর কোর্টে। আমি উকিল নিয়ে আপনাদের জন্যে লড়্‌তে গিয়েছিলাম, তা আপনারা যে ভাবে আমাদের snub ক'রে দিলেন—'

মুনি লজ্জিত হইয়া বলিল—সে সময়ে আমরা যা করেছি, তার জন্যে—'

প্রবোধ হাসিয়া বলিলেন—কিছু না—কিছু না—তারপর? আপনার আর সব বন্ধুরা এখন কোথায়? ভাল আছেন সবাই?—শ্রীশটার হ'ল কি? তার আর টিকি দেখ্‌বার জো নেই?

কল্যাণী বলিল—সে বোধ হয় 'সেভ্‌ন্‌টি থ্রি' নিয়ে ব্যস্ত আছে।

প্রবোধ। মানুষকে বাহাত্তুরে পায় ঐ ছেলেটাকে তিয়াত্তুরে পেয়েছে। এখনও চর্‌কা ঘোরাচ্ছে ত?—

কল্যাণী। প্রকাণ্ড একটা শেড তৈরী ক'রে প্রায় পঞ্চাশ জন তাঁতী এনে দিনরাত সেখানে খাটছে!

প্রবোধ। তা যাই করুক, প্রত্নতত্ত্বের মত এটাও ওর টিঁক্‌বে না।

এই ভাবের নানা কথার ভিতর দিয়া মুনি দেখিল, সে যে এই পরিবারে প্রথম আসিয়াছে তাহা আর মনে হয় না। সকলকেই তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। এই পরিবারটি যেমন ছোট, বাড়ীখানিও তেমনি ছোট, কিন্তু কোন অসুবিধা হইবার উপায় নাই এবং কিছুরই অভাব নাই।

প্রবোধ বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে গেলে এবং মনীষা তাঁহার জিনিষ-পত্র যথাস্থানে রাখিবার জন্য উঠিয়া গেলে কল্যাণী মুনিকে বলিল—ছাদে চলুন—'

ছাদে আসিয়া মুনি অবাক্ হইয়া গেল, ছোট ছোট টবে কত রকমেরই যে ফুলগাছ লাগান রহিয়াছে এবং সমস্তই এমন জীবন্ত যে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়!

মুনি যখন গাছ পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত, কল্যাণী বলিল—মুনিবাবু, আপনি আমার খুব কাছে কাছে থাকুন না—

মুনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—জানেন না বুঝি, এটা ব্রাহ্ম-পাড়া। চার-পাশের জানালাগুলোর দিকে একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন, দেখ্‌বেন, ছোট বড় কত রকমের সব চোখ ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে তাকিয়ে আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গেজেট্ ছাপা হ'য়ে যাবে। ঐ যে প্রকাণ্ড হল্‌দে রং-এর বাড়ীটা দেখ্‌ছেন ওটা হচ্ছে মিসেস্ ডি'র বাড়ী, ওঁকে চেনেন না?

মুনি ভীতভাবে বলিল—চলুন নীচে যাই, দরকার নেই ওসব গণ্ড-গোলে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—এই আপনার সাহস?—

মুনি বলিল—তলোয়ারের চেয়ে জিভটাকে আমি ভয় করি। চলুন—

কল্যাণী—It's too late. ঐ দেখুন—

মুনি দেখিল প্রায় প্রত্যেক জানালা হইতে মেয়েরা তাহাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছে!

— ১৬ —

স্যাণ্ডহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে বিকাশ, জীবন এবং মুনি থাকিত, বাস্তবিক সেটি বাসা-বাড়ী নয়। বাহিরের সৌন্দর্য্য এবং ভিতরের আস্‌বাব্ ইত্যাদি হইতে ইহাকে প্রাসাদ না বলিলেও বড়লোকের বাড়ী বলা চলে। অর্থাৎ একজন বড় লোকের বাড়ী যে-ভাবে গঠিত এবং সজ্জিত হওয়া উচিত তাহা সমস্তই ইহাতে ছিল, তবু কেন যে তিন বন্ধুতে ইহাকে 'বাসা' বলিয়া অভিহিত বা অভিযুক্ত করিয়াছিল তাহা অনুমান করা শক্ত। মুনি সময় সময় বলিত—'ব্যাচিলার্স্ ডেন্'।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য স্যাণ্ডহার্ষ্ট ষ্ট্রীট একেবারেই উপযুক্ত স্থান নয়, তথাপি বিকাশের মাতুল দ্বিজেশচন্দ্র সেন বাড়ীটিকে পছন্দ করিয়া এখানেই তাঁহার অফিস বসাইয়াছিলেন। তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, বিকাশকে তিনি এইখানেই রাখিতে পারিবেন। কর্ম্ম-কোলাহলময় শহরের কোন ব্যবসায়ী-প্রধান স্থানে বিকাশ দুইদিনে পাগল হইয়া যাইবে ইহা তিনি জানিতেন। বিকাশ যখন পাটনা হইতে এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে পড়িবার অভিপ্রায় জানাইল,

তখন তিনি মাড়োয়ারী-পট্টি হইতে তাহার অফিস বা 'গদি' উঠাইয়া এখানে লইয়া আসেন।

বাড়ীটি তিন তলা। নীচের দুই তলায় অফিস হইল এবং উপরের তলায় বিকাশের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। প্রায় আটখানি ঘর, তাহার মধ্যে একখানি দ্বিজেশচন্দ্র আপনার জন্য সজ্জিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহা বন্ধই থাকিত। বাকী ঘরগুলিতে বিকাশ যেমন খুশী বিচরণ করিত।

বিকাশ যখন বি, এ ক্লাসে পড়ে তখন জীবন এবং মুনির সহিত পরিচয় হয় এবং তাহারা এক মেসে থাকে জানিয়া দ্বিজেশের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে আপনার কাছে লইয়া আসে।

জীবন এক জমিদারের সন্তান। তাহার মাতা, স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক জীবনকে লইয়া 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্'-এর আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কারণ তাহার জমিদারীর আয় বাৎসরিক প্রায় যাট হাজার টাকা হইলেও জীবনের পিতা প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ধার রাখিয়া যান। ইহা ছাড়া একাধিক স্থান হইতে তাঁহার পিতৃত্বের প্রমাণ করিয়া যখন কোর্টে নালিস উঠিতেছিল তখন সে সমস্ত মিটাইতে তাঁহাকে জমিদারীর অনেকখানি অংশ ছাড়িতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার ঋণের আরও কারণ ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে এখানে বেশী-কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

জীবন এখন সাবালক এবং ঋণমুক্ত। যখন খুশী দেশে যায়, জমিদারীর তদ্বির করিয়া মাকে দেখিয়া আসে, তিনি এখন প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন।

মুনি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। জানিবার ইচ্ছাও কোন দিন হয় নাই। তাহার অভাব হইত না। প্রয়োজন মত টাকা

চাহিলেই সে পিতার নিকট হইতে পাইত এবং মুনির পিতা দ্বিজেশচন্দ্রের মত মধ্যে মধ্যে সম্বলপুর হইতে আসিয়া মুনিকে দেখিয়া যাইতেন। ছুটির সময় দু'চার দিনের জন্য সেও মার কাছে যাইত কিন্তু বিকাশ এবং জীবনকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিত না, চলিয়া আসিত।

বিকাশ পড়িত প্রেসিডেন্সী কলেজে, মুনি এবং জীবন পড়িত স্কটিশ-চার্চ্চে কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোনই অসুবিধা হইত না এবং বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করিলেও তাহাদের মধ্যে অনুরাগটা বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

তিনজনে এক সঙ্গে এম্, এ, পরীক্ষা দেয়। তাহার পর বিকাশ তাহার মাতুলের ব্যবসা দেখিতে লাগিল, মুনি 'ল' পরীক্ষা দিয়া এক এটর্নির অফিসে কাজ লইল এবং জীবন সাহিত্য লইয়া পড়িল অর্থাৎ সাধারণের মতে সে কিছুই করিল না।

এই ভাবে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর একত্র বাস করিবার পর মুনি যেদিন বিকাশকে বলিল—ভাই, এবার আমাকে যেতেই হবে, বাবা 'রিটায়ার' ক'রে এখানে এসেছেন আর সম্বলপুরে যাবেন না। সেখানকার জায়গা জমী আর বাড়ীটা আমাদের 'দেশ' হ'য়েই উপস্থিত রইল। তা ছাড়া বোন আর ভাইগুলো আরো বাবাকে ব'লে ব'লে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে, নইলে—'

বিকাশ হাসিয়া বলিল—বড় অন্যায় তাদের।

মুনি যেদিন চলিয়া গেল সেদিন আহারের সময় বিকাশ বলিল—তার পর তুমি কবে যাচ্ছ জীবন?

জীবন গম্ভীর ভাবে বলিল—যেদিন গলাধাক্কা দেবে—তার আগে নয়, কিন্তু হলপ্ করতে চাই না।

বিকাশ বলিল—তবু ভাল!

বিকাশের ঐ কথায় জীবন অবাক্ হইয়া গেল। অমন বিদ্রূপপূর্ণ এবং কঠিন স্বরে বিকাশ কখনও কথা কহে না! জীবন তীক্ষ্ণ ভাবে বিকাশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল—তোমার কি হয়েছে বল ত? আজ ক'দিন থেকে যেন তোমার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

বিকাশ হাসিয়া বলিল—ঐ কথাটা তোমাকে আমিও বল্‌ব ভাব্‌ছিলাম, তুমি আর আগেকার জীবন নও। তবে আমার মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন আসে নি তা বল্‌তে পারি না। আমার বোধ হয় আমি আর তোমাদের আগেকার বিকাশ নই, তোমাদের 'মিস্ বোস্' আজ ক'দিন হ'ল মারা গেছে, এখন তার জায়গায় যে এসেছে সে বিকাশ বোস্ is a man of the world—a man.

বিকাশের আরক্ত মুখের দিকে জীবন অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। কেহ আর কোন কথা কহিল না। কিন্তু আহারের পর বিকাশ যখন তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল জীবন বলিল—আমি তোমার ঘরে আমার ক্যাম্প খাটটা নিয়ে পাত্‌ব বিকাশ?

বিকাশ বলিল—এস।

তখন রাত্রি প্রায় দুইটা হইবে, বিকাশ জীবনকে ডাকিয়া বলিল—তুমি জেগে আছ জীবন?

জীবন জড়িত স্বরে বলিল—এই জাগ্‌লাম।

বিকাশ অনুতপ্ত হইয়া বলিল—আহা, তুমি ঘুমুচ্ছিলে জান্‌লে আমি ডাক্‌তাম না, বড় অন্যায় হ'ল—

জীবন। যদি আর না ডাকো আর অনুমতি দাও তা হ'লে ঠিক তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়্‌তে পারি, তোমার দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই এতে।—তোমার চোখে আজ ঘুম হয়েছে কি?—

বিকাশ। কি জানি কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না।

জীবন। তোমার নিশ্চয় কিছু হারিয়েছে ?—

বিকাশ। না, কিছু পেয়েছি। তারই আনন্দের উত্তেজনায় আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় বইছে !

জীবন তাহার বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—দুঃখের বোঝা যে-যার নিজের নিজের বহা উচিত কিন্তু সুখের ভাগ দিতে হয় বিকাশ—

বিকাশ বলিল—আমিও তাই ভাব্‌ছি।—আমার জীবনের সমস্ত কথাই জান্‌তে পেরেছি জীবন। এতদিন কেবল সন্দেহ হ'ত যে, প্রকাণ্ড একটা কোন রহস্যের ভিতর দিয়ে আমার জন্ম হয়েছে কিন্তু সে রহস্যটা যে কি তা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি এতদিন, আজ তিন দিন হ'ল মিসেস্‌ মিত্র সব বলেছেন।

জীবন। একটু থাম ভাই বিকাশ, আমি দু' একটা কাজ সেরে নিই।

সে উঠিয়া আলো জ্বালিল, একটা কাচের পাত্রে খানিকটা গোলাপ জল ঢালিয়া জলের সহিত মিশাইয়া প্রথমে নিজের কপালে মাথায় ও ঘাড়ে দিল, তাহার পর সেইরূপ করিয়া বিকাশকেও মাখাইয়া দিল। গোটা বারো ধূপ একসঙ্গে জ্বালিয়া ধূপদানিটাকে ঘরের কোণে রাখিয়া দিল। একটি কাচের গ্লাস এবং জলের কুঁজাটি খাটের নীচে রাখিয়া সে আলো নিভাইয়া দিয়া বিকাশের সাম্‌নে আসিয়া বসিয়া বলিল—তারপর ?—

বিকাশ বলিল—তুমি আমার মামাকে কি ভাব্‌তে ?—

জীবন। ভয়ানক বড়লোক এবং ভয়ানক 'ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌' !

বিকাশ। আমিও তাই আজ প্রায় কুড়ি বছর জান্‌তাম—সম্প্রতি আরও কিছু জেনেছি। উনি আগে এত বড়লোক আর এত

'ডিসপেপ্‌টিক্' ছিলেন না, আমাদের মত বয়সে আমাদের মতই অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিলেন।

—তিনি যাঁকে ভালবাস্‌লেন তার কাছ থেকে ভালবাসা পেলেন; কিন্তু মানুষের বিচারে তিনি অযোগ্য ব'লেই [illegible] পেয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের ভালবাসাটাকে ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময়ে বিচারক সহ্য করেন কিন্তু তার দাবীকে নয়। তিনি যেদিন স্বীকার করলেন, বিমলাকে আমি ভালবাসি, বিচারক হাস্‌লেন। তিনি যখন দাবী করলেন—বিমলাকে আমি চাই, ও আমার। বিচারক বল্‌লেন বাপু, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে; বিমলাকে যে সাহেব পিয়ানো বাজাতে শেখান, তার মাইনে—

—তিনি বল্‌লেন—থাক্ আর বল্‌তে হবে না, এতেই হবে কিন্তু এ বাড়ী থেকে চলে যাবার পূর্ব্বে তাকে দেখ্‌বার অনুমতি দেবেন না কি? এতে আপনাদের বিশেষ কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এমন কিছুই অপমানজনক নয় এটা,—একবার দেখে যাব মাত্র—

—বিচারক বল্‌লেন—এই সামান্য দুর্ব্বলতাটাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারছ না? তুমি না পুরুষ মানুষ?—

—এই বিচারক ছিলেন আমার মামী-মার বাবা।

—এর এক সপ্তার মধ্যেই তিনি দেশ ছাড়েন। যে-দিন যাবেন, সেদিন সকালে একখানি চিঠি লোক-মারফত পান, তাতে [illegible] ছিল—তুমি শুধু অনুমতি দাও, একবার বল, আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব দ্বিজেশ।

—সেই লোকের হাতেই তিনি লিখে পাঠালেন—তোমার বাবার প্রত্যেকটি কথা সত্যি বিমলা। আমার স্বার্থের দিকে চেয়ে তোমাকে ধূলায় নামাতে বসেছিলাম, তোমাকে তোমার যোগ্য আসনে যদি না

বসাতে পারলাম তবে কি হ'ল?—হয় ত এ জীবনে হ'য়ে উঠবে না, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই—আমার ভালবাসা এর ভিতর দিয়েই ধন্য হবে—'

—তিনি দেশ ছাড়লেন।

—এখন তিনি যে-সব খনির মালিক তখন তারই একটির ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কাজ নিয়েছিলেন। তারপর আট বছরের মধ্যে তিনি সেই খনির অংশীদার হন।

—এই সময় একদিন অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা একটা চিঠি তাঁর কাছে এল—আর বোধ হয় সময় নেই দ্বিজেশ, একবারটি এস—

—তিনি সেইদিনই ফিরে এলেন—মামী-মা তখন টাইফএডে ভুগ্‌ছেন প্রায় পনেরো দিন।

—তিনি মামী-মা'র বাবাকে বল্‌লেন- আপনার ডাক্তারদের ব'লে দিন আমার এই চেক্ বই-এ যত টাকা আছে সব তাঁদের, শুধু তারা বিমলাকে ফিরিয়ে দিন্—'

—তার পর হ'ল এক আশ্চয্য ব্যাপার। শহরের প্রায় সমস্ত ডাক্তার যমের পেয়াদাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইল—কিন্তু সাধ্য কি?

—মামা বল্‌লেন—আর দেরী কর্‌তে পারি না, আপনাদের আচার্য্যদেবকে ডাকুন, রেজিষ্ট্রারকে নিয়ে আসুন, সকলকে নিমন্ত্রণ করুন, আজই সন্ধ্যায় আমার বিয়ে।

—এবার তাঁর কথা অমান্য করবার সাহস কারো হ'ল না, সমস্ত আয়োজন হ'ল। টেলিফোনে আর মোটর ছুটিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে, নিমন্ত্রণ শেষ হ'ল। সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত!—কোন কিছুরই ত্রুটি হ'ল না—সাড়ে সাতটার মধ্যে বিয়ে হ'য়ে গেল!

—মিসেস মিত্র বল্‌লেন—বিমলার সে কি আনন্দ—কি খুশীতে ছাপিয়ে উঠল তার সমস্ত শরীরখানি! আমায় বল্‌ল—আজই ফুলশয্যা

হোক করুণা—ওদের চলে যেতে বল। আমি আমার বরকে একটু দেখি—ডাক্তার নার্স কেউ থাক্‌তে পাবে না এখানে এখন, তুইও না করুণা—শুধু আমার বর আর আমি। তাই হ'ল।

—ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে তার বিছানা ঢেকে দেওয়া হ'ল, ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইটের বাল্‌বগুলো রঙ্গিন সিল্ক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হ'ল, যতগুলো আতরের শিশি ছিল সব খুলে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল—তার বাক্সে যত গয়না ছিল সব তাকে পরানো হ'ল। সে নিজের হাতে আরসি ধ' কপালে সিন্দুরের টিপ পর্‌ল, চোখের পাতায় সুরমার রেখা টেনে দিয়ে বল্‌ল—ইচ্ছে কর্‌ছে একটা পান খাই—' ডাক্তাররা দিল না।

—নিমন্ত্রিতেরা অবাক্‌ হ'য়ে নববধূর সে রূপ-মাধুরী দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর হুকুম হ'ল—করুণা, ওদের চলে যেতে বল্‌—

—মিসেস্‌ মিত্র বল্‌লেন—সকলকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে ঘরের দরজা আগ্‌লে এসে ব'সে রইলাম, সেদিকে কা'কেও আস্‌তে দিলাম না। চুপ ক'রে বসে আছি আর দেখ্‌ছি—বিমলা বিছানায় উঠে বস্‌ল যেন কিছুই তার হয় নি। দ্বিজেশবাবুকে বল্‌ল—ঐ সোফাটায় আমায় নিয়ে চল—

তিনি বিমলাকে কোলে তুলে সোফায় এনে বস্‌লেন। তারপর বিমলা জোর ক'রে দ্বিজেশবাবুর মাথাটা আপনার বুকের ওপর টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে তাঁর চেতনা যেন লুপ্ত ক'রে দিতে লাগ্‌ল।

—তার পর ধীরে ধীরে বিমলার বাহুপাশ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে অনুভব ক'রে তাকে দেখ্‌বার জন্যে যখন দ্বিজেশবাবু তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আন্‌লেন, বিমলার চোখের পাতা তখন বন্ধ হ'য়ে গেছে, ঠোঁটের ওপর তৃপ্তির হাসি ফুটে রয়েছে, কিন্তু যে বুকের স্পন্দন তিনি বুক দিয়ে অনুভব কর্‌ছিলেন তা আর পাওয়া যায় না . . .

—তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্‌লেন—করুণা-দি, একবার এদিকে এস—

বাড়ীর লোক কেঁদে উঠ্‌ল।—তিনি বল্‌লেন—ও চল্‌বে না, আজ কারো কাঁদ্‌বার অধিকার নেই। সানাই বাজ্‌তে লাগ্‌ল সমস্ত রাত, তিনি তাঁর নববধূকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন সমস্ত রাত . . . মিসেস্ মিত্র বল্‌লেন সে রাত্রে তিনি আর একটিও কথা বলেন নি।

পূর্ব্ব রাত্রে যে আচার্য্য বিয়ের মন্ত্র পড়েছিলেন তিনিই এলেন সকাল বেলা মৃত আত্মার সদ্‌গতির জন্যে প্রার্থনা করতে! মামা তাঁর শ্বশুর মশায়কে বল্‌লেন—বিমলার জন্যে প্রার্থনা কর্‌বার দরকার হবে না, সেটা আপনারা নিজেদের জন্যে করুন আপনাদের ভগবানের কাছে।

—তাঁর গলার স্বর কাঁপ্‌ল না, চোখে তাঁর জল নেই, আগুনও বেরিয়ে এল না! বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ভাবে শ্মশানে এলেন, চিতা সাজান হ'ল, তিনি নিজে মামী-মাকে শুইয়ে দিলেন। মুখে কপালে মাথায় চুমা দিলেন—নিজেরই হাতে আগুন ধরিয়ে কিছু দূরে ব'সে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

—শেষ হ'ল।

—এর পর একমাস তিনি ডাঃ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন নিজের বাড়ীতে যান নি। সেখান থেকেই আবার তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে যান।—এই হ'ল প্রথম অধ্যায়, জীবন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি আসছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার গোলাপ জলটা আর একবার দাও।

জীবন নিঃশব্দে উঠিয়া বিকাশকে গোলাপ জলের পাত্রটি দিলে সে তাহা কপালে মাখিয়া বলিল ঃ—

আমার দাদামশাই ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম-প্রচারক। গোঁড়া ব্রাহ্ম হ'লে যে সমস্ত দোষ-গুণ থাকা উচিত তা তাঁর ছিল। আর তাঁর

এক মেয়ে ছিল। তাঁর নাম সন্ধ্যাতারা,—তিনিই আমার মা। আমার মামার চেয়ে দু-বছরের ছোট।

—একদিন দাদামশাই জানতে পারলেন, তিনি তাঁর অনুমতি না নিয়েই এক জনকে ভালবেসেছেন, তাঁকে চিঠি লেখেন, তাঁর সঙ্গে বাড়ীর বাইরে অনেক জায়গায় দেখা করেন।

—কোন্ ধর্ম্মভীরু মানুষ তা সহ্য করবে? দাদামশাই মাকে বল্‌লেন—তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়তে হবে। তখন মা'র বয়েস প্রায় বাইশ।

সমাজের মানুষ বল্‌ল—দেখুন বিরূপবাবু, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে, তা ছাড়া এর পর আর কোন ছেলে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে তা ব'লেও মনে হয় না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে—আর এই যে কত লোকের মেয়ে মরেই যায় তা কি আর বাপ-মায়ের সহ্য হয় না? ইত্যাদি।

—কি আর করেন তিনি অগত্যা এ 'অপমান' এবং 'অন্যায়ের' কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন, বল্‌লেন—বিয়ে তা হ'লে তোমরা দাও, আমি থাকব না এতে।

—কিন্তু ওদিকে আর-এক বিপদ আরম্ভ হ'ল! পাত্র বল্‌লেন—আমি আপনাদের সাজানো বিয়ে বিশ্বাস করি না—ওর ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই, বিয়ে করব আবার রেজেষ্ট্রী কি? আশীর্ব্বাদ ক'রে আপনারা সম্প্রদান করুন, সে-ই যথেষ্ট হবে।

—এবার সমাজসুদ্ধ সবাই খাপ্পা হ'য়ে উঠল, বল্‌ল—অনাচারী।

—মা বল্‌লেন—ঐ অনাচারীই আমার স্বামী—

—দাদা মহাশয় হুকুম দিলেন—ওকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ।

—মা, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার সঙ্গে থাকব সুচারু। . . .

—কোথায় গিয়ে প্রথমে তাঁরা ঘর বেঁধেছিলেন তা কেউ জানে না, কেউ তা জান্‌বার চেষ্টাও করেন নি।

—অনেক দিন পর আমার মামা তাঁদের খুঁজে পান—মাড়বারের ভিতরে এক অজ্ঞাত পল্লীতে। কিন্তু তাঁর খুঁজে পাওয়া বৃথা হ'ল।

—কিছুদিন থেকে সেই পল্লীতে প্লেগ ভীষণ ভাবে মানুষের সংখ্যা হ্রাস কর্‌ছিল; আমার মা আর বাবা তাই থামাবার জন্যে বুক দিয়ে গিয়ে পড়্‌লেন—ফল যা হবার তাই হ'ল।

—মামা যখন সেখানে এলেন তখন তাদের শেষ অবস্থা। বাবা আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বল্‌লেন—ও কোন বন্ধনের মধ্যে দিয়ে এ পৃথিবীতে আসে নি, সমস্ত বিশ্বটা ওর জন্যে খোলা রইল; ও কোন সমাজের কোন সম্প্রদায়ের নয়, ওর নাম বিকাশ—ওকে বাঁচাও দ্বিজেশ—

—আমার মা বাবাকে যারা চিন্‌তেন তারা তাঁদের ভুলতে চেষ্টা করেছেন, কারণ তাঁরা সমাজে অনাচারের সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু আজ ক'দিন থেকে তাদের আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাদের কথা শুন্‌ছি, তাদের স্পর্শ পাচ্ছি—গর্ব্বে আমার বুক ভ'রে উঠ্‌ছে!

বিকাশ হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

জীবন তখন নীরবে তাহার চোখ মুছিতেছিল।

বিকাশ বলিল—আমি যখন মামার সঙ্গে তাঁর ধানবাদের বাড়ীতে আসি তখন আমার বয়েস চার বছর, বারো বছর বয়েসে আমি পাটনা যাই, সেখানে থেকে এনট্রান্‌স্ দিই।

—মামা আমাকে তাঁর নিজের আদর্শ মত গড়েছেন—মা-বাবার কথা আমার মনেই হয় নি কোন দিন। প্রায় ষোল বছর বাইরে ছিলাম, বাংলা দেশের কোন কিছুই আমি জানতে পারি নি—বিশেষ ক'রে

মামা আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে সর্ব্বদা আড়াল ক'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছেন। এই এত বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও বলেন নি যে, মিসেস্ মিত্র বা ডাঃ মিত্রের সঙ্গে তাঁর এত পরিচয় আছে।

জীবন বলিল—তোমার মা বাবাকে কিছু মনে পড়ে না বিকাশ?—

বিকাশ। না, কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু মিসেস্ মিত্র সেদিন আমাকে তাঁদের দু'খানা ছবি দিয়েছেন; তাঁদের নিজের হাতে নাম লেখা—দেখে দেখে আমার তৃপ্তি হয় না জীবন—

বিকাশ ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার আর সাড়া পাওয়া গেল না। জীবন উঠিয়া বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়া আধ-ঘুম আধ-জাগরণে-ভরা পৃথিবীর দিকে শূন্য মনে তাকাইয়া রহিল।

—১৭—

Mrs. K. K. Dutta.

At Home

Requests the pleasure of

Mr. and Mrs..*'s*

Company on Saturday, the 15th

May, 1922 at 5-30 p. m.

"The Cot"

19, Hunterford Street, Calcutta. *R.S.V.P.*

একদা প্রাতঃকালে চায়ের টেবিলে উক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রটি পাইয়া এক দিকে যেমন কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং মহিলা উৎকণ্ঠিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, অন্যদিকে তদপেক্ষা অধিক ভদ্রলোক এবং মহিলা আনন্দের সঙ্গে বলাবলি করিতে লাগিলেন—তা যাই বল কিন্তু, মিসেস্ দত্ত আমাদের সমাজটাকে জাগিয়ে রেখেছেন—Tea, Music, Tableau, Social—সত্যি কিন্তু এমন উৎসাহ কারো দেখা যায় না!

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার! মাঝে একদিন সময় আছে; নিমন্ত্রিতদের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষার আয়োজন চলিতে লাগিল।

কথায় বলে—'কুটুম্ ঠকাতে চাও?—সন্দেশ ফেলে মাছ পাঠাও।' কথাটাকে একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মাছ ভেট্ দিবার ভিতর দিয়া যে কোন পরিবারের তৈলের ভাঁড়টি খালি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং সন্দেশ প্রভৃতির মত বিনা খরচে এবং পরিশ্রমে ভোজনানন্দ লাভ করা যায় না। এইরূপ ভেটের দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপন্ন পরিবারের স্বার্থত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই; মাছটি পাইবামাত্র কাটিয়া উত্তমাংশের কিছু প্রয়োজন মত রাখিয়া প্রতিবেশী মহলে তাঁহারা বিতরণ করিয়া ফেলেন।

কিন্তু 'এ্যাট্ হোম্' ব্যাপারটি ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক গুরুতর। ইহাকে পরের ঘাড়ে চালান করিবার উপায় নাই, ইহা গৃহস্থের তৈলের ভাঁড়টি খালি করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় না—ইজ্জতেও হাত দেয় এবং ইহাকে অস্বীকার করিলে?—কিন্তু থাক্ সে কথা।

অনেকের সঙ্গে মল্লিক পরিবারেও নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে কিন্তু মিঃ মল্লিককে বেশ একটু বিব্রত দেখা যাইতেছিল। তিনি চা-পান শেষ করিয়া ঈষৎ চিন্তিত ভাবে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—ওগো দেখ,

আমার সব 'ইভ্‌নিং স্যুট্'-গুলোতেই কিছু কিছু 'ডারন্' না করলে আর পরা যাবে না—একটা স্যুট্ যদি তুমি—

মিসেস্ মল্লিক মুখ ভারি করিয়া বলিলেন—হাঁ, আমি এদিকে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে রয়েছি, ওঁর স্যুট্ সেলাই করতে বসি! আমার নিজেরই কাপড় ব্লাউজগুলো ইস্ত্রি করা হয় নি—

মিঃ মল্লিক করুণ স্বরে বলিলেন—যদি সময় পাও—

মিসেস্ মল্লিক। সময় যেটুকু পাব তোমার ধিঙ্গী মেয়ে রয়েছেন না? ওকে ত এবার থেকে বার করতেই হবে। তা তুমি এক কাজ কর না কেন, পার্টিতে না গিয়ে শনিবার দিন টুটুকে নিয়ে Tarzan of Apes দেখতে যাও না? ও বেচারা অনেক দিন যেতে পায় নি। বায়স্কোপে খুব 'এনজয়' করবে।

মিঃ মল্লিক মুখ কালো করিয়া বলিলেন—হুঁ।

* * * *

মিস্ লতিকা চ্যাটার্জ্জি তাহার মাতাকে বলিল—মা, আমি এই গোল্ড-গ্রে সাড়ীটার সঙ্গে বাফ্-ব্লাউজটা পরব?—

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ওটা না তুই মিসেস্ গুপ্তর পার্টিতে পরে গিয়েছিলি!

লতিকা। তবে এই ফ্লেম্ কলারের সাড়ী আর স্যামন পিঙ্ক ব্লাউজ্‌টা পরি, কি বল মা?—

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। মরি মরি, যে না রূপের মেয়ে, ঠিক যেন কয়লার বস্তায় আগুন লেগেছে মনে হবে!—

তাহার পর মাতা এবং কন্যার মধ্যে যে প্রহসন স্বরু হইল তাহার দর্শক কেহ থাকিলে দেখিত, কাপড় জামা ঘরময় ছড়াইয়া লতিকা

তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং তাহার মাথার কাছে বসিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী তাহাকে কিলাইতেছেন।

এইভাবে অনেক পরিবারেই অল্প-বিস্তর একটা কিছু হইয়া যাইতে লাগিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা কি সহজ কথা? বিশেষত নারীর পক্ষে। সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদের অশান্তি। পোষাক নির্ব্বাচন করিতে অশান্তি, পরিতে অশান্তি, পরিয়া অধিকক্ষণ গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে অশান্তি, এমন কি নিমন্ত্রণে গিয়া কোন মহিলার নির্ব্বাচনী শক্তির শ্রেষ্ঠতা, দৈহিক লাবণ্যের শ্রেষ্ঠতা, বাকচাতুর্য্য, ভঙ্গিমা, Gait বা মনোহারিণী শক্তির প্রাচুর্য্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যবতীর মনে যে অশান্তির ঝড় তুলিয়া দেয় তাহার নির্ব্বাণ করিতে হয় ত সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিতে এবং সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া বন্ধুগণের নিকট 'প্রাণ খুলিয়া' কথা কহিতে হয় এবং এই 'প্রাণ-খোলা' কথার ভিতর দিয়া যে 'অমৃত' পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই পান করিয়া দুইটি সম্প্রদায় বাঁচিয়া থাকে।—প্রথমটির নাম Gossip, দ্বিতীয়টির নাম Scandal-monger.

সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজের বুকে প্রচণ্ড একটা 'জবরদস্তি'র আসন গাড়িয়া বসিয়া আছে। ইহাদিগকে জানে না, ইহাদিগকে ভয় করে না এমন মানুষ নাই। ইহাদের কর্ম্ম-কুশলতা সম্বন্ধে কিছু বলাও বাহুল্যমাত্র

সেদিন ছাদে কল্যাণী মুনিকে যে মিসেস্ ডি—র নামের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিল, তাহা 'দত্ত' নামেরই অপভ্রংশ হইলেও এবং তিনিও মিসেস্ কে, কে, দত্ত হইলেও, যাহার নাম স্বাক্ষরিত 'এ্যাট হোম্' কার্ড আমরা পাইয়াছি তিনি ইনি নন। তিনি হাণ্টারফোর্ড

ষ্ট্রীটের একটি সুরম্য উদ্যান-সম্বলিত 'কট্' অর্থাৎ কটেজে অধিষ্ঠান করেন—তবে দুইজনেই একই ঝাড়ের বাঁশ বটেন!

কিন্তু উপস্থিত আমরা কল্যাণী কর্তৃক পরিচিত মিসেস্ ডি'—র কথাই আলোচনা করিব।

স্যাণ্ডহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে পথটি বরাবর খালপার রোডের দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম রুখিয়া ষ্ট্রীট; এবং যেখানে এই হত্যা-কাণ্ড হইয়াছে তাহারই নিকট 'দি গ্রেন' নাম লেখা যে প্রকাণ্ড বাড়ীটি আশে পাশের সমস্ত বাড়ীর উপর নাক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মিসেস্ ডি'—এই গৃহেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিপুল তাঁহার তনু, দোর্দ্দণ্ড তাঁহার প্রতাপ, দুর্জ্জেয় তাঁহার মন, তীব্র তাঁহার লালসা, ক্ষমাহীন তাঁহার হৃদয়, ভীষণ তাঁহার প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি!—তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রচুর পরিমাণেই আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর, তাঁহার মুখের হাসি।

তিনি সর্ব্বদা যেন 'হাসিয়াই' আছেন। হাসিয়া ঘুমান, হাসিমুখে কাজ করেন, এবং যখন হাসিতে হাসিতে কথা বলেন, তখন তাঁহার গালের মাংস ঠেলিয়া উপরে উঠার দরুণ তাঁহার চোখ প্রায় দুটি সরল রেখায় পরিণত হয় এবং তাহাও এত অতল তলে তলাইয়া হাসিতে হাসিতে ডুবিয়া যায় যে, মুখের সমস্ত মাংসরাশি যথাস্থানে না ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে টানিয়া তুলিবার উপায় নাই।

একবার শুধু কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখে হাসি দেখা যায় নাই। কে একজন ভুলক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিল—আপনার বাড়ীর নম্বরটা ত আমার জানা নেই মিসেস্ দত্ত, পরশু যদি যাই—

মিসেস্ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণ শুধু চাহিয়া ছিলেন এবং ঐ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখে হাসি ছিল না কিন্তু তাহার পরই প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন হাসিয়া বলিলেন—কি আশ্চর্য্য ! আপনি আমার বাড়ীর নম্বর জান্‌তে চান?—কিন্তু আমার বাড়ী যে গরু ছাগলেও চেনে !—

সে হাসি দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তার বুকের রক্ত শুখাইয়া উঠিয়াছিল।

'সাব্‌মেরিনে'র যেমন 'পেরিস্কোপ' থাকে—যাহার সাহায্যে ভিতরে বসিয়া সমুদ্রের বহুদূরের অনেক ঘটনাবলী দেখা যায়, লোকে বলে মিসেস্ ডি'—র চার তলার উপরের ঘরখানিও এইরূপ একটি গুণসম্পন্ন ছিল এবং তিনি নাকি একটি 'বাইনকিউলরে'র সাহায্যে অনেক বাড়ীর হাঁড়ির টাট্‌কা খবর টানিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু লোকে অনেক কথাই বলে তাহা কানে তুলিতে নাই। আমরাও তাহা এখন বিশ্বাস করিলাম না।

হাণ্টারফোর্ড ষ্ট্রীটের মিসেস্ দত্ত এই মিসেস্ দত্তের সম্পর্কে 'জা' হন। এবং আমাদের সুবিধার জন্য কল্যাণী প্রভৃতির দেওয়া সাঙ্কেতিক নাম মিসেস্ ডি'—বলিয়াই ডাকিব।

দুই জায়ের মধ্যে যে প্রীতি তাহা সাধারণের আদর্শ হওয়া উচিত। এক পরিবারে না থাকিয়াও তাঁহারা পরস্পরের অতি নিকটেই ছিলেন —টেলিফোনের সাহায্যে 'হ্যালো—নাইন্ নট্ নট্ নাইন্?'—'হ্যালো— ফাইভ্ এইট্ থ্রি—' প্রায় সমস্ত দিনই চলিত। এবং শহরের দুই সীমায় দুই মিসেস্ দত্তকে দেখিয়া মানুষ ভাবিত—Cannon at the back of them, Cannon in front of them . . .

* * *

14

মিসেস্ ডি'—র স্বামী স্বনাম-ধন্য ডাক্তার কে. কে. দত্তকে জানে না শহরে এমন লোক খুব কম আছে। উল্‌সলী ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড একটি দাওয়াইখানা তাঁহার আছে। তাহার সাম্‌নের দেওয়ালে বোর্ডের উপর যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করা আছে তাহা পড়িয়া শেষ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। মোটের উপর এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যত প্রকারের চিকিৎসা-প্রণালী আজ পর্য্যন্ত সাধারণে শুনিয়াছে তাহার শতগুণ অধিক প্রণালীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ... শুনিতেও এমন আশ্চর্য্য লাগে যে, মনে হয় বুঝি উহার প্রয়োগে যাবতীয় ব্যাধি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া কোন্ জাহান্নমে গিয়া মরিয়া থাকিবে। কিন্তু বিশেষ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য লাল অক্ষরে বড় বড় করিয়া কাঁচফলকে যে কথাটি লেখা ছিল তাহা ঐ সমস্ত নামের মত উদ্ভট এবং দুর্ব্বোধ্য নয়। ঐ লেখাটি দিনের আলোকে সাধারণে যেমন স্পষ্টভাবে পড়ে এবং বুঝে, গভীর রাত্রেও তেমনি স্পষ্ট হইয়াই সাধারণের চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া থাকে :—

SPECIALIST

In the diseases of women & Children

তাঁহার দাওয়াইখানা কখনও শূন্য থাকে না, রাস্তার ফুটপাথের দুই ধারে ছোট বড় মটর, গাড়ী প্রভৃতি ঠিক রাখিতে পুলিসকেও সতর্ক থাকিতে হয়।

তিনি প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করেন ' না বোঝা যায় না, কারণ লম্বোদর শীর্ণকায় কোন রোগীকে তাঁহার দাওয়াইখানায় কোন দিন দেখা যায় নাই। তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য যাঁহারা আসেন সকলকেই বিশেষ অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় এবং রোগের চিহ্ন বিশেষ তাঁহাদের শরীরে দেখা যায় না।

তিনি সাধারণত এই সকল রোগীকে 'ইন্‌জেক্‌সন্‌' দ্বারা চিকিৎসা করেন এবং প্রত্যেককেই আশ্বাস দেন—আমাকে বিশ্বাস করুন, চোদ্দটি ইন্‌জেক্‌সনে আপনাকে একেবারে সুস্থ ক'রে আন্‌ব। ছ'মাস আপনাকে আমার 'ট্রিট্‌মেণ্ট'-এ থাক্‌তে হবে। After that you are free. Excuse me, are you married, sir ?—I see—why not send her for a change to her father's ? This will help you a lot, you know what I mean ? By the way, you will get fever on reaching home, don't be afraid, it's for that. Well, see me any day next week—

তাঁহার চিকিৎসায় কোন রোগীকে আজ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার কথার নড়চড় হয় না এবং অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাপন্নদের জন্য তিনি চোদ্দটি ইন্‌জেক্‌সনের স্থলে সাতটির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু সমান যত্নের সহিতই চিকিৎসা করেন। তাঁহার এই সদাশয়তার জন্য রোগীরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকে। এবং প্রতি ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতির জন্য তাঁহারা যে পঞ্চাশটি করিয়া রৌপ্য-মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া থাকে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন।

কিন্তু 'Diseases of women' সম্বন্ধে ডাঃ কে. কে. দত্তের ব্যবস্থা অন্য প্রকার। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সকলকেই দেখেন এবং আরোগ্য হইলে হাসিয়া বলেন—I have dragged you out of a 'rotten hole', madam, and I beg leave of you—আমার অন্য patient'-রা অপেক্ষা করছেন, নমস্কার—

তিনি তাঁহার দাওয়াইখানায় আসিয়া বসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হাতে যে 'চেক' আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা যেমন ভাবী তেমনি

ভারী একটি অনুরোধ-পত্র তিনি সাধারণত রোগী বা রোগীর অভিভাবক প্রভৃতির নিকট হইতে পান—Thanks Doctor. Hope I can trust you,—for heaven's sake, don't let it out.

এই দুইটি গুরুভার পদার্থই তিনি হাসি-মুখে জামার বুক-পকেটে স্থাপন করিয়া নীরবে বহন করিয়া চলেন, কাহাকেও তাহার ভাগ দেন না, অন্তত সাধারণের তাহাই বিশ্বাস। কিন্তু তাহারা যদি কোন দি. দেখিত—ডাক্তার কে. কে. দত্ত গৃহে ফিরিবামাত্র তাঁহার জীব. সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হাসিমুখে হাসিঢালা স্বরে বলিতেছেন—হাঁ গা, সেই তেতাল্লিশ নম্বরের আজ কিছু খবর এল? আর ষোল নম্বরের?—এবং তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত জামার পকেট হইতে সেই দুটি গুরুভার পদার্থ বাহির করিয়া লইয়া বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ এবং পর্য্যবেক্ষণান্তে আপনার 'এটাচি কেসে' তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় হাসিমুখে বলিতেছেন—তা যাই হোক আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করি, কি বল? এ সব কথা পাঁচ-কানে ওঠা কি ভাল? যে ভোলা মন তোমার, কখন্ কোথায় কি ফেল্‌বে তার ঠিক নেই—ও আমার কাছেই থাক্—আর চেকখানা সতুকে দিয়ে কাল জমা দিয়ে আন্‌ব। এই কথা শুনিয়া তাহারা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিত এবং অশান্তির শেষ থাকিত না। কিন্তু বাইবেলে বলে—Blessed are the Ignorants. আমরাও এখানে তাহাই বলিলাম।

মানুষ তাহার দেবতার কাছেই সব কথা বলে, কোন কিছুই গোপন করে না এবং স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিথ্যা কথা বলে, প্রবঞ্চনা করে; ইহাই অনেকের বিশ্বাস কিন্তু

ডাঃ দত্তকে দেখিলে তাহাদের সে ভুল ভাঙ্গিবে। অবশ্য পরের বিষয় হইলে এবং আপনার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি স্ত্রীকে যাহা বলেন, যে ভাবে বিশ্বাস করেন, তেমন ভাবে দেবতাকে বলেনও না, বিশ্বাসও হয় ত করেন না। তাঁহার মত অনুগত স্বামী বড় একটা দেখা যায় না।

লোকের কথা বিশ্বাস করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার বয়স ছিল সাতাশ এবং সে সময়ে নাকি তাঁহার স্ত্রীর বয়স ছিল তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসর বেশী এবং আরো কিছু ছিল।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া দারিদ্র্যবশত বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভাগ্য-বিধাতা ডাঃ ইউ. এন. গাঙ্গুলীকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া লইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ কে. কে. দত্তের ভবিষ্যৎ আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যে তিনি স্বর্গীয় ডাঃ ইউ. এন. গাঙ্গুলীর পত্নীকে বিবাহ করিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া সংসার পাতিলেন। ডাঃ দত্তের বয়স এখন পয়তাল্লিশ এবং তাঁহার পুত্র কন্যা যে ঠিক কয়টি তাহা বলা একটু শক্ত হইলেও আমাদের গরীবি মতে হিসাব করিলে দেখি, তাঁহার কন্যাগুলিকে একটি সেকেণ্ড ক্লাস বন্ধ গাড়ীতে ভর্ত্তি করিলে পুত্রগুলিকে ছাদে বসিতে হয়।

সতীনের ছেলেমেয়েকে মেয়েরা বিষ-নয়নে দেখে ইহার কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি কিন্তু ডাঃ কে. কে. দত্ত স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানদের সহিত আপনার সন্তানগণের কোন পার্থক্য রাখেন নাই। সকলগুলিকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন অর্থাৎ কোনদিন চক্ষু

বিস্ফারিত করিয়া কোনটিকেই তিনি দেখেন নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রীই সমস্ত করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের বিষয়ে তাঁহার মন জাগ্রত আছে। এতগুলি সন্তানের জননী হইয়া ও স্বামীর প্রতি তাঁহার কোন অবহেলা নাই, আলস্যও নাই। তাহার সুখ-সুবিধার প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। প্রতিদিন তিনি যখন দাওয়াইখানায় যান তখন তাঁহার নোট্-কেসে একটি দশটাকার নোট এবং 'পার্‌সে' একটাকার চেঞ্জ অর্থাৎ সিকি দোয়ানি একআনি রাখিয়া দেন এবং এই এগার টাকার হিসাব তিনি কোন দিনই রাখেন না। হয় ত রাখিলে পাইবেন না এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতেন বলিয়াই ও টাকাগুলো জলে দিলাম বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেন।

অবশ্য স্ত্রীর বদান্যতার উপরই ডাক্তার বাঁচিয়াছিলেন এ কথা মেয়েরা বিশ্বাস করিলেও পুরুষে করে না। তাহাদের বিশ্বাস, সব কাজেরই একটা করিয়া উপরি অর্থাৎ 'ওভার টাইম্' আছেই এবং অতিবড় পত্নীগত প্রাণ কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উকিল ডাক্তার মোক্তার সকলেই এই উপরিটিকে আশ্রয় করিয়াই মেয়ের বিয়ে, মহাজনের দেনা কিম্বা বাগান বাড়ীর একটা মজলিসের খরচ মিটাইয়া থাকেন। কিন্তু যে ভাবে ডাঃ দত্ত স্ত্রীর নিকট হইতে ঐ এগারটি টাকা লন, ঐ টাকার উপর তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর, ঐ টাকা কয়টিকে এমন লোভের চক্ষে দেখেন যাহাতে অতিবড় অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস হইবে যে, ঐ কয়টি 'হাতের ময়লা'কে আশ্রয় করিয়া এ ভব-সংসারে কোন মতে তিনি টিঁকিয়া আছেন। এবং এই কথাটি মিসেস্ ডি'—বিশেষ গর্ব্বের সহিত প্রচার করিতেন।

এখানে আমরা আর একবার বাইবেলের কথাটি উচ্চারণ করি—Blessed are the Ignorants!

শুনা যায়, যে সকল জননীর সন্তান জন্মিয়া বাঁচে না তাঁহারা পুত্র-কন্যার সাধারণত পেঁচো, মেথরা, এককড়ি, তিনকড়ি প্রভৃতি নাম রাখেন এবং এই প্রকার নামকরণের কারণ এবং ইতিহাসও আছে। কিন্তু ছোট-আদালতের উকিল ষষ্ঠীচরণ দত্ত ক্রমান্বয়ে সাতটি সন্তানের পিতা হইয়া এবং বহুপ্রকার নামের সাহায্য লইয়াও যখন একটিকেও ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, তখন অনেক চিন্তা করিয়া অষ্টম সন্তানের জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া ধাত্রীকে বলিলেন—খোকার নাকে বলে দাও—ওর নাম কৃতান্তকিঙ্কর,—ঐ নামেই যেন সবাই ডাকে।

আশ্চর্য্য নামের মাহাত্ম্য! কৃতান্তকিঙ্কর তাহার 'নিবিড়-নিশা নিকষ-ঘন কাল'রূপে মায়ের কোল আলো করিয়া দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাপ-মায়ের তাপিত চিত্ত শান্ত হইল। শুধু তাহাই নহে, কৃতান্তের জন্মের ঠিক এক বছর পাঁচ মাসের মধ্যে মায়ের কোলে আর একটি যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল তাহাকেও দেখিতে কৃতান্তেরই অনুরূপ, যেন এক ছাঁচে ঢালাই-করা দুটি লোহার পুতুল!

ষষ্ঠীচরণ তাহার নাম রাখিলেন—করালীকিঙ্কর এবং সেও টিঁকিয়া গেল। কিন্তু তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী দুজনের কেহই টিঁকিলেন না। তাহার পর দুই ভায়ে মামা খুড়ো প্রভৃতির স্নেহের আড়ালে বর্দ্ধিত হইয়া আজ একজন হইয়াছেন ডাঃ কে. কে. দত্ত এল. আর. সি. পি; আর একজন মিঃ কে. কে. দত্ত বার-এট্-ল।

সাগর-পারের মানুষদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে—Insurance is a scheme to provide your wife with the dowry for her second marriage…' এবং যাহারা দেখিয়া

শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা বন্ধুগণকে ঐ কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলে—Eat, Drink and Be merry.

কিন্তু ডাঃ ইউ. এন্. গাঙ্গুলী সাগর-পারের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রাণে মনে বাঙ্গালী। প্রায় পনেরো বৎসর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্থাৎ রোগী সারিয়া এবং মারিয়া একদিন নিজেও যখন ইহজগৎ হইতে সরিয়া গেলেন, তখন দেখা গেল—পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি জীবন-বীমা, দুই লক্ষ টাকার একটি ব্যাঙ্ক-বুক, উল্‌স্‌লী ষ্ট্রীটে একটি দাওয়াইখানা, যাহার মাসিক আয় সহস্রাধিক টাকা, স্যাণ্ডহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে 'দি গ্রেন' নামক বিখ্যাত একটি অট্টালিকা এবং তিনটি কন্যারত্ন, তিনি স্ত্রীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

একটি অবলা সরলা বিধবা বালা, তাহার মাথার উপর এতগুলি গুরুভার বহন করিয়া চলিবে, আর তাহার পাশের মানুষ অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া শুধু দেখিবে?—তাহা কি হয়?—

দাদা আসিয়া বলিলেন—ওরে মিঠু, আমার মনে হয় কিছুদিন তুই যদি আমাদের কাছে গিয়ে থাকিস্, তাহ'লে তোর মেয়েদের দেখা-শোনা আমাদের পক্ষে একটু সুবিধের হয়, এত দূর থেকে—

মিঠু বলিলেন—কিচ্ছু ভেবো না দাদা, ও হ'য়ে যাবে এক রকম ক'রে, তা ছাড়া ওদের দেখাশোনার কোন ঝঞ্ঝাটই ত আমায় পোহাতে হয় না, সব মিস্ দাস্ করেন—এমন চমৎকার 'গভার্ণেস্' দেখিনি, ওদের কি যত্নটাই যে করেন কি বল্‌ব দাদা,—তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

দাদা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে সম্পর্কে দেবর এবং ননদ প্রভৃতি আসিয়া বলিলেন—বৌ-দি, তুমি বড় একা—আর যে বাড়ী,—যেন খাঁ খাঁ কর্‌ছে! রাতে তোমার নিশ্চয়ই ভয়ে করে—আমরা এসে থাকব কিছু দিন?

বৌ-দি বলিলেন—না ভাই, তোমরা কিচ্ছু ভেবো না, ভয় আবার কি? টাকাকড়ি ত আর বাড়ীতে রাখি না, তা ছাড়া চাকর দরোয়ান রয়েছে, পূর্ণ কম্পাউন্ডারও রাতে এসে এখানে থাকে। আমার জন্যে তোমরা কিচ্ছু ভেবো না ভাই, আমার কোনই কষ্ট হবে না। তিনি চলে গেলেন এটাই যখন সইতে পার্‌লাম—

তিনি চক্ষে আঁচল দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

কবি গাহিয়াছেন :—

তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি . . .

মিসেস্ গাঙ্গুলীর মধ্যে এই সত্যের যথেষ্ট পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাঃ গাঙ্গুলী কিছুদিন হইতে যাহাকে তাঁহার দাওয়াইখানার জন্য এসিষ্ট্যাণ্ট ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা জানি এবং তিনি ডাঃ গাঙ্গুলীর গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন।

মিসেস্ গাঙ্গুলীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—তাঁহার সর্ব্বদাই অসুখ করিত। তিনি সকলকে বলিতেন—আমাকে দেখ্‌তেই এমন, কিন্তু ভিতরে কিচ্ছু নেই—

হিংসুক মানুষ আড়ালে বলিত—আহা 'শরীলে আর পদত্থ নেই—'

তাঁহার এই অসুখ সহস্র চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে না পারিয়া ডাঃ গাঙ্গুলী তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্টের হাতে স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার পর হইতে মিসেস্ গাঙ্গুলীর শরীর সারিতে থাকে।

ডাঃ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর মিসেস্ গাঙ্গুলী কিছুদিন শয্যা লইলেন, এ সময়ে কেহ তাঁহার দেখা পাইত না, কেবল ডাঃ দত্ত তাঁহার কাছে থাকিতেন। তাঁহার শরীর আবার অসুস্থ হইতে লাগিল। কিছুই ভাল লাগে না, মনে শান্তি নাই, সর্ব্বদাই কেমন একা-একা লাগে। প্রাণ আই-ঢাই করে। বাহিরের call আসিলে ডাঃ দত্তকে যখন উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইত মিসেস্ গাঙ্গুলী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন—তুমি যতক্ষণ আমার হাতটি ধরে ব'সে থাক, বেশ থাকি—কোন কষ্ট, কোন ভয় থাকে না—

ডাঃ দত্ত তাহার কপালে গালে হাত বুলাইয়া বলেন—এখনি আস্‌ব আবার, একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর—

তাহার পর একদিন সকলে শুনিল—ডাঃ কে. কে. দত্ত, মিসেস্ গাঙ্গুলীর স্বামীর স্থান পূর্ণ করিতে যাইতেছেন।

যাহারা পরের ভাল কোন দিনই সহিতে পারে না, তাহারা আড়ালে নিন্দা করিল, চোখ টেপাটিপি করিল এবং বিবাহের দিন প্রকাশ্য ভাবে উপহার পাঠাইল—পুত্র কলত্র লইয়া আহারও করিয়া গেল।

সম্প্রদানের সময় যখন আচার্য্য বলিলেন—শ্রীমান্ কৃতান্ত, তুমি কি—

একটি ডেঁপো ছেলে তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল—ও বাবা! কনেকে যমে ছুঁয়েছে, তাকাস্ নি ওর্ দিকে, মর্‌বি—

এই কথায় বিবাহ-সভায় বেশ একটু হাসির তরঙ্গ উ[illegible]ছিল। এবং শুনা যায় ইহার পর হইতে নাকি ডাঃ কে. কে. দত্ত বানান করিয়া আপনার সম্পূর্ণ নাম লিখিতেন না, এবং কেহ লিখিলে চটিয়া যাইতেন।

এই বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই যখন সকলে শুনিল—ডাঃ কে. কে. দত্ত একটি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের পিতা হইয়াছেন—ডেঁপো

ছেলেদের মধ্যে আবার একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। একজন বলিল—Biologically এটা আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি—

আর একজন বলিল—আরে রেখে দাও তোমার 'বাইওলজি', ও-সব মানুষের বেলায় খাটে। যমদূত ন-মাস ছ-মাসের ধার ধারে না—সে এসে পৌঁছুলেই আমাদের মেনে নিতে হবে ঠিক সময়ে এসেছে।

* * *

দাদা কৃতান্তের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ আকাশ যখন এইরূপ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে তখন ভাই করালীর জীবনও যে বিশেষ তমসাচ্ছন্ন ছিল তাহা মনে হয় না।

কৃতান্ত যখন ডাক্তারী পাশ করিয়া ডাঃ গাঙ্গুলীর এসিষ্টাণ্ট হইলেন, করালী তখন বি, এল পরীক্ষা দিয়া পুলিস-কোর্টের উকিল হইলেন। তাহার পর চার বৎসরের মধ্যে তিনি যাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু লইয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া এটর্নীদের অন্ন মারিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তিনি সাধারণত বিধবা এবং নাবালকের সম্পত্তির তদ্বির করিতেন এবং বহুকাল অবিবাহিত থাকিবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

এবারও তাঁহার বিবাহ-সভায় অনেক ডেঁপো ছেলে উপস্থিত থাকিলেও কেহ বলিবার মত একটি কথা খুঁজিয়া পায় নাই। তাহারা শুধু বিস্ময়ে মোহিত হইয়া দেখিতেছিল—যেন মূর্ত্তিমান্ অন্ধকারকে ঘিরিয়া শুভ্র জ্যোৎস্না ফুটিয়া রহিয়াছে! এখন কি করিয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি ঘটিল দেখা যাক্।—

সঞ্জীবচন্দ্র সোম, বহুকাল রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর ছিলে[illegible]নি মারা যাইবার সময় প্রভূত ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান। মি[illegible]ম সে সমস্ত তাঁহার একমাত্র কন্যা তটিনীর জন্য যক্ষের মত আগুলি[illegible]য়াছিলেন।

কৃতান্ত এই বিষয়ে একদিন তাঁহার এক বন্ধুকে [illegible]ছিলেন—ওহে করালীটার 'এলেম' আছে! কি ক'রে যক্ষী-বুড়ী মিসেস্ সোমকে হাত করেছে দেখেছ?

বন্ধু বলিলেন—হবে না কেন? তোমারই ত ভাই?—

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে legal adviser হইয়া করালীকিঙ্কর যাহার ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় একদিন মানুষ শুনিল এবং দেখিল তিনি করালীর হাতের উপর তটিনীর হাতখানি রাখিয়া বলিতেছেন—ওঁর মত মানুষ আমি দেখি নি তটি, ওঁকে বিয়ে ক'রে আমায় শান্তিতে মরতে দে—

তটিনীর মনের অবস্থা তখন কি হইতেছিল তাহা দেখিবার অবস্থা তাহার মাতার তখন ছিল না; তিনি তখন শান্তিতে মরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তটিনীও কন্যার কাজ করিল—সে করালীকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতাকে শান্তিতে মরিতে দিল।

সেদিন রাত্রে ক্লাবে গিয়া দাদা কৃতান্তের কানে কানে ভাই করালী বলিলেন—মাৎ!

দাদা কৃতান্ত বলিলেন—Good. বো-য়, কাউল্ কট্‌লেট্ ওউর সাদা লেবল্—'

ইহার অল্পদিন পরেই ভাই করালী বিবাহ করিয়া তাঁহার হোটেল ছাড়িয়া হাণ্টারফোর্ড ষ্ট্রীটের 'কটে' আসিয়া স্থায়িভাবে পত্তন গাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার বিবাহের সুদীর্ঘ চারি বৎসরের দিকে আমরা এখন তাকাইব না।

— ১৮ —

'ঐ আঁখি রে
ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বল বাকি রে?
মরমে কেটেছ সিঁধ্ নয়নের কেড়েছ নিদ্
কি সুখে পরাণ আর রাখি রে!'

বহুক্ষণ বহু প্রকারের এবং বহু লোকের সাধ্য-সাধনার পর মিস্ লাহিড়ী ঐ গানটি করিল। কিন্তু ইহাতে কাহারও অসন্তোষের কোন কারণ থাকিতে পারে না। যদিও অনেকের ধারণা—'জানি না, পারি না, অনেক দিন অভ্যাস নেই' প্রভৃতি বলিয়া যাঁহারা গাহিতে পারেন তাঁহারা নিজেদের দাম বাড়ান, কিন্তু এই ধারণা মিস্ লাহিড়ীর উপর রাখিলে অন্যায় হইবে। সে 'ফ্যারিন্‌জাইটিস্' নামক কণ্ঠ-রোগে আজ বহুদিনযাবৎ ভুগিতেছে, তাহা ছাড়া তাহার 'টন্‌সিলাইটিস্' ত লাগিয়াই আছে, কথা কহিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়, তবু মানুষ বুঝে না! অগত্যা কি করে তাহাকে গাহিতে হইয়াছে।

কিন্তু অর্গ্যানের চাবি টিপিতেই এক আশ্চর্য কাণ্ড হইয়া গেল! টন্‌সিলাইটিস্ এবং ফ্যারিন্‌জাইটিস্ যাহা এত কাল তাহার কণ্ঠ চাপিয়া বসিয়া ছিল হঠাৎ তাহারা পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠের স্বাভাবিক কোমল এবং তীব্র সুরগুলি সকলের কানে

তৃপ্তি ঢালিয়া দিল। এই মিষ্ট স্বরের সহিত যখন সে বিলোল কটাক্ষে তাহার পরিচিত এবং অনুগৃহীত মানুষগুলির দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল তখন তাহারা এমন শান্ত বিমোহিত ভাবে তাঁ[illegible]র দিকে চাহিতেছিল যেন তাহাদের অন্তরাত্মাও ধূয়া ধরিতে[illegible]—

'মরমে কেটেছ সিঁধ নয়নের কেড়ে[illegible],
কি সুখে পরাণ আর রাখি রে!'

ইহাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রথম সমাজ-প্রাঙ্গণে অর্থাৎ Society-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে মাতাঠাকুরাণীগণই তাহাদের পরিচালনা করেন এবং এই পরিচালন কার্য্যটি চোখের ইঙ্গিতেই সাধিত হইয়া থাকে। কোথাও কোন নবীনা অতিরিক্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে বা অতিরিক্ত মাত্রায় জড়সড় হইয়া আছে তখনই সে তীব্র দৃষ্টির খোঁচা খাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে. অবশ্য ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক নয়। বেশীর ভাগ নবীন এবং নবীনাগণ[illegible] পরস্পরের বিশেষ পরিচিত বলিয়াই মনে হয়। এবং তাহারা যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া পরস্পরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, এমন কি পাশের মানুষও ধরিতে পারে না।

তাহাদের চোখের কোণে বাষ্পবারি নাই, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্ ন[illegible] শরীরে রোমাঞ্চ বা বেপথু প্রভৃতি লক্ষণও ধরিবার উপায় নাই। [illegible] ইহারা পরস্পরকে যে ভাবে উদ্দেশ করিয়া কথা কহে তাহার মধ্যে যে কি আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অতি বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ Psychologist-এরও মাথা ঘুরিয়া যাইবে এবং সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উহাতে আর যাহাই থাক্, প্রেমের bacilli নাই!

মিস্ লাহিড়ীর গান সমাপ্ত হইবামাত্র ইংরেজী ধরণে প্রশংসা অর্থাৎ চাটুবাদে তুষ্ট করিয়া রবিকমল বলিল—বাই দি ওয়ে, মিস্ লাহিড়ী, আমার ফ্রেণ্ডের যে লেখাটা আপনাকে কাল পড়্তে দিয়েছিলাম সেটা দেখ্বার সময় হয়েছিল কি আপনার ?—

মিস্ লাহিড়ী হাসিয়া বলিল—কিছু মনে কর্বেন না মিঃ পাল, কিন্তু এমন sloppy sentiment আমি খুব কম দেখেছি। উঃ বাবা, মাথা ধরে উঠেছিল, আর সব চেয়ে অসহ্য লেগেছিল লেখকের বিনয় আর ন্যাকামীর উচ্ছ্বাস—

ঐ কথা কয়টি শুনিয়া রবিকমল নিশ্চয়ই তাহার চোখে ধুতুরা বা সরিষা যে-কোন একটা ফুল অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে লাগিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, মনের শক্তি যেন চলিয়া গেল।

রবিকমলের পাশে আর একটি যে মানুষ এতক্ষণ ধৈর্য্যশালী বিড়ালের মত অপেক্ষা করিয়াছিল সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—মিস্ লাহিড়ী, excuse me, মিসেস্ দত্তের গাছ থেকে তখন এই 'ক্লিমেটিস্ বাঞ্চ্'টা চুরি করেছিলাম, কিন্তু চোরাই মাল আপনি রাখ্বেন কি ?

মিস্ লাহিড়ী। I am not at all afraid of policemen. ধন্যবাদ—

মিস্ লাহিড়ী হাসিয়া ফুলটিকে নিজের বুকের ব্রোচে আট্কাইয়া দিল। প্রদাতা কৃতার্থ হইয়া গেল।

এই নবীন নবীনা দলের পিছনেই এই সময় প্রশ্ন হইতেছিল—মিঃ পালিত যে ? কি সৌভাগ্য, আপনার দেখা পাওয়া গেল ! আজকাল আপনি প্রায় ডুমুরের ফুল হয়েছেন—

ইহার উত্তরে একটু ঘড়্ ঘড়্ শব্দের সহিত মুখ বিকৃত করিয়া হাসিয়া পালিত মহাশয় বলিতেছিলেন—আজ্ঞে বড় ব্যস্ত ছিলাম, যে

কাজ পড়েছে—কিন্তু যদি কোনদিন অনুগ্রহ ক'রে এ দীনকে স্মরণ কর্‌তেন মিসেস্ রক্ষিত—'

মিসেস্ রক্ষিত। আমাদের মত মানুষের কি আর আপনি সময় ক'রে উঠ্‌তে পার্‌তেন? আর কি ক'রেই বা পার্‌বেন—উনি বল্‌ছিলেন, আজ কাল আপনাকে প্রায়ই চ্যাটারটন্ ষ্ট্রীটে যেতে হয়—

কথা কয়টি বলিয়া বেশ একটু ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া মিসেস্ রক্ষিত পালিত মহাশয়ের মুখখানি দেখিয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন—তা ছাড়া মিঃ কর প্রায়ই আপনাদের বাড়ীতে যান। তাঁরই কাছে শুন্‌লাম সাধারণত অফিস থেকেই আপনি ওখানে যান—

মিঃ পালিত। মিঃ কর? আমাদের বাড়ীতে আসেন?—কে তিনি?

মিসেস্ রক্ষিত মন খুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—Bless you, আপনি জানেন না, আপনার 'গেষ্ট'কে? সুধাংশু কর—তিনি আপনার স্ত্রীর ফ্রেণ্ড, সম্প্রতি Mysore থেকে ফিরেছেন। আর কি ক'রেই বা চিন্‌বেন, বিকালে ত আর বাড়ী থাকেন না?—But tell me, what drags you thither almost every day? Is it tea or the preparation?—

পালিত মহাশয়ের মনের আগুন এতক্ষণ ধোঁয়াইতেছিল এইবার জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন—There I fight with your husband too. আমি বলি চায়ের নেশা—তিনি বলেন প্রিপারেশন্। তাঁর মতে মিসেস্ মল্লিকের মত আর কেউ চা তৈরী কর্‌তে পারে না। আমার ধারণা যদিও তা নয়, তবু I don't mind his being so bold, as such good friends they are,—ঐ যে মিসেস্ মল্লিক, মিঃ রক্ষিতকে চায়ের কাপ্ এগিয়ে দিচ্ছেন।

মাথাটিকে অল্প একটু পাশে ঘুরাইয়া মিসেস্ রক্ষিত যখন তাঁহার স্বামীর দিকে চাহিলেন, পালিত মহাশয় মনের আনন্দ মুখের হাসিতে বাহির করিয়া ভাবিলেন—Now I have paid you back in your own coin—

মিসেস্ ডি'—হাসি মুখে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া ফিরিতেছিলেন। করুণা সুবর্ণ মনীষা নিরুপমা নগেন্দ্র প্রবোধ বীরেন্দ্র প্রভৃতি যেখানে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, মিসেস্ ডি'—সেখানে আসিয়া বলিলেন—কি? আপনাদের যে বেশ 'এ্যাট্ হোম' ব'লে মনে হচ্ছে! মেয়ে-ছেলেরা যে কেউ এল না?—

করুণা হাসিয়া প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তারা আজ ওঁদের বাড়ীতে চড়িভাতি করছে।—রাতে আবার আমাদের নেমন্তন্ন ওখানে। এখান থেকে ফিরেই যাব।

মিসেস্ ডি'—বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—বটে! কিন্তু বল্‌বেন মিসেস্ মজুমদার, আমি কল্যাণীর ওপর বড় রাগ করেছি। আজকের দিনে সকলকে আমার পার্টি থেকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে সে ভাল করে নি। কথা কয়টি বলিয়াই সরলতার পরিচায়ক তাঁহার উচ্চ হাসির স্রোত বহাইয়া দিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর উঠিয়া সকলের নিকট হইতে দূরে কিছু স্বতন্ত্রভাবে যে কয়টি মহিলা বসিয়া অতি নিবিষ্ট মনে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন সেখানে আসিয়া বসিবামাত্র তাহাদের মধ্যে যেন নব জীবনীশক্তির সাড়া পড়িয়া গেল।

চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া একজন মহিলা বলিলেন—সত্যি? বাবা! ওর পেটে পেটে এত বিদ্যে! আর কেমন মেনিমুখ ক'রে থাকেন। যেন কিছু জানেন না, বোঝেন না!—

মিসেস্ ডি'—সে যদি ভাই দেখ্‌তে চপলা!—হেসে হেসে ছাদের ওপর তার গায়ে ঢলে-পড়া . . . কিন্তু সে ছোঁড়াটা যে কে তা বুঝ্‌তে পারলাম না—মাঝে মাঝে সমাজেও আসে।

চপলা। আর এদিকে কি হচ্ছে শোন নি বুঝি? সে এক কাণ্ড মিঠু-দি! তরুর মেয়ে শান্তা একজন আর্টিষ্টের প্রেমে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছে যে, আর চোখে-কানে দেখ্‌তে পায় না—আমার দোতলার ঘরে বস্‌লে ওদের অনেকগুলো ঘর স্পষ্ট দেখা যায়, বিশেষত শান্তার ঘরটা। সেদিন দুজনে খুব কাছাকাছি ব'সে বিভোর হ'য়ে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ছোঁড়াটা শান্তাকে চুমু খেতে যাবে এমন সময় তরু ঘরে এসে পড়্‌ল আর হ'ল না—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

সকলের বিস্ময় ঘৃণা প্রভৃতি যখন সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়াছে এমন সময় একটি স্থূলকায়া মহিলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—ও ভাই মিঠু-দি, শুনেছ কেলেঙ্কারীর কথা? বেশ হয়েছে, যেমন সব কর্ম, এখন তার ভোগ্ ত হবে?

নবাগতাকে ঘিরিয়া সকলে উৎসুক হইয়া বলিলেন—কি ব্যাপার?

নবাগতা বলিলেন—ব্যাপার চমৎকার!—জান ত, আজ চার বছর প্রায় দীপ্তি অমলের সঙ্গে 'এন্‌গেজ্‌ড্' ছিল। এখন সেটা ভেঙ্গে গিয়ে কাল হঠাৎ সুধা রায়চৌধুরীর সঙ্গে অমলের আর পাকাপাকি 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' হয়ে গেল। এখন দীপ্তি নাকি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে দোর দিয়ে আছে, কারো সাম্‌নে বেশী বার হয় না। সত্যি, তার কি দোষ বল?—এখন ডাঃ মিত্র আঙ্গুল কামড়াচ্ছেন। বন্ধুর ছেলেকে নিজের খরচে বিলেত পাঠালেন, লেখাপড়া শেখাতে টাকা ঢাল্‌লেন,—এক রকম ত আমরা সবাই জান্‌তামই যে, অমল ফিরে এসে দীপ্তিকে

বিয়ে কর্‌বে। আহা বেচারী হয় ত সপ্তায় সপ্তায় কত love letter লিখেছে। হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

মিসেস্ ডি'—। আমার মনে হয় চপলা, এর মধ্যে আরও কিছু আছে। নইলে অমল হঠাৎ এমন কর্‌বে কেন? তা ছাড়া বিলেত থেকে ফিরেও ত ও ওদের ওখানে যাতায়াত করেছে। আমার কি মনে হয় জান? ঐ যে সব হিন্দু-সমাজের ছোঁড়াগুলো কাজের ছুঁতো ক'রে ওদের বাড়ীতে আসে তাদের কারুর সঙ্গে—বুঝেছ কি না? তা ছাড়া সেই illegitimate ছেলেটা নাকি দিনরাত্তির ওখানে পড়ে আছে।

চপলা। সত্যি মিটু-দি, তুমি না বল্‌লে একবারও মনে হ'ত না আমাদের এ কথা! ওমা! আর আমরা কেবল অমলের নামেই দোষ দিচ্ছিলাম! এ দিকে—

মিসেস ডি'—। দোষ দিলেই ত হয় না? সে থাক্ এখন, আর একটা কিছু দেখ! সেই তেতাল্লিশ নম্বরের খবর। ওঁকে সেদিন চিঠিতে কি লিখেছে দেখ!—মরণ আর কি! লজ্জা ঘেন্না ব'লে যেন কিছু নেই—

মিসেস ডি'—তাহার ব্লাউসের ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিলেন।

এইভাবে প্রত্যেকে যখন নিজের নিজের মত করিয়া 'এ্যাট্ হোম' অনুভব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাগানের অপর দিক হইতে পদ্মালিকা প্রবাহের মত মৌন নম্র অবনত-শীর্ষ মানুষের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যে ধীরে ধীরে সমবেত অভ্যাগত-মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া চারিদিকে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—তটিনী—তটিনী!

উপবিষ্ট ভদ্রলোকগণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহিলারা বসিয়াই হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার করিলেন এবং অনেকের চিন্তা-স্রোতের মুখ ফিরিয়া 'তটিনীতে' গিয়া পড়িল।

একদল নবীন এবং প্রবীণ ব্যারিষ্টার এতক্ষণ তাঁহাদের ক্লাব, হোটেল, লণ্ডন, এডিনবরা, থিয়েটার প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন এবং প্রত্যেকেই যে অভিজ্ঞতায় অপরের শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্য হইতে একজন অতি ক্ষীণকায় ব্যক্তি, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট বিপুলকায় বন্ধুটির কাঁধ টিপিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন—'Pon my word man—your wife is really—

বিপুলকায় বন্ধুটি সিগারের পাইপটি দাঁতে চাপিয়া বলিলেন—Yes, a She-devil—'

ক্ষীণকায়: How do you mean ?—

বিপুলকায়: I mean what you say—'

ক্ষীণকায় কিছুক্ষণ বিপুলকায় মানুষটির দিকে তাকাইয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—আইবুড়ো থাকা আর সুন্দরী বিয়ে করা ও দুটোই দেখ্‌ছি সমান ঝক্‌মারীর কথা, দাদা, Look around !—

তটিনী এই সময় সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল—আমি এঁদের নিয়ে 'গ্রীন হাউস' দেখাতে গিয়েছিলাম, বিশেষত মিঃ নন্দী কখনও অরকিড্ গাছে ফুটে থাক্‌তে দেখেন নি! আশা করি আমার অনুপস্থিতিতে আপনাদের—তা ছাড়া আমি কিন্তু আপনাদের 'হোষ্টেস্ নই, আমার বাড়ীতে এটা হয়েছে মাত্র। এ সব আমার দিদি—

মিসেস্ ডি'—এক গাল হাসিয়া ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিতেছিলেন—আঃ তটিনী, কি যে করিস্ তার ঠিক নেই!—

কথাটি সত্য না হইলেও সাধারণের বিশ্বাস, এই সমস্ত পার্টি প্রভৃতি মিসেস্ ডি'—র উদ্যোগে এবং খরচে হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত ব্যাপার তাঁহার নিজের বাড়ীতে না হইয়া এখানে যে হয়, তাহার কারণ 'গ্লেন'-এ এমন সুন্দর বাগান নাই এবং বাগান না হইলে নাকি পার্টি জমে না।

মিঃ নন্দী আসিয়া তটিনীকে বলিলেন—তা হ'লেও এটা ত আপনারই বাড়ী মিসেস্ দত্ত সুতরাং আমরা আপনারই গেষ্ট এবং আপনি আমাদের 'এন্টারটেন্' করতে বাধ্য।

তটিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া পুরুষদিগের বলিবার ধরণ নকল করিয়া বলিল—ফর্মাইয়ে—'

ফর্মাস হইল গান। এবং তটিনী গাহিতে বসিল।

বীরেন্দ্রনাথ করুণাকে বলিলেন—করুণা, দীপ্তির সঙ্গে তটিনীর কোথায় যেন মিল আছে ব'লে মনে হয়! তোমার কি মনে হয়েছে এ কথা কোন দিন ?—

করুণা। অনেক দিন। আজ দীপ্তিকে যেমন দেখি, ঠিক তেমনি আর পাচ বছর পূর্ব্বে তটিনীও ছিল। এখনও তার কিছু পরিচয় ওর গলার স্বরে রয়ে গেছে। শোন না, মনে হয় কি এখন ঐ তটিনীই এই সমস্ত পুরুষগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাদের ওপর দিয়ে নিজের খুশীকে ইচ্ছে-মত ছুটিয়ে দেয় ?—আমাদের কি ভালটাই বাস্ত আগে মনে আছে ত ? এখন আমাদের বলে 'প্রিগ'। আমাদের সব চেয়ে বেশী তফাতে রাখ্তে চেষ্টা করে, হয় ত ঘৃণাও করে। আজ কদিন থেকে কেবলই আমার ভয় হচ্ছে হয় ত কোনদিন এমনি ক'রেই দীপ্তি জ্বলে উঠবে।

বীরেন্দ্র। আমি তোমাকে একটা কথা জিগ্গেস কর্‌ব ভাব্‌ছিলাম, অমলের এই ব্যবহারটা ও কি ভাবে নিয়েছে জান ?

করুণা। কি ভাবে যে, তা বলা শক্ত। তবে কাল সন্ধ্যা বেলা আংটিটা খুলে অমলকে পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ সকালে দেখ্‌লাম এতদিন সেই আংটিটা পরার দরুণ আঙ্গুলে যে দাগ হয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে আছে! মনে হ'ল ভয়ানক একটা লজ্জা ওর বুকে চেপে ব'সে আছে।

বীরেন্দ্রনাথ কোন কথা বলিলেন না। করুণা বলিলেন—এখন আমাদের একমাত্র আশা—বিকাশ।

বীরেন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবর্ণ তাহাকে টানিয়া বলিলেন—আচ্ছা মিত্রমশাই এইটেই কি ব্রাহ্ম-সমাজ?—

বীরেন্দ্র। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না আপনার কথাটা—

সুবর্ণ। ঐ ছেলেমেয়েগুলিকে দেখুন না—ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ অনুযায়ী ওরা কি বেড়ে উঠেছে?

বীরেন্দ্র। ব্রাহ্ম-সমাজের কোন আদর্শ ছিল নাকি?

সুবর্ণ ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। একটু ভাবিয়া বলিলেন—ঐ ভাবেই কি আমাদের ছেলে-মেয়েদের গড়ে তুল্‌তে চাই?

বীরেন্দ্র। সেটা সব সময় কি আমাদের ইচ্ছের ওপরই নির্ভর করে, বড়-দি?

সুবর্ণ। মানে, এরা কি ঠিক পথে চলেছে?

বীরেন্দ্র। কে তার বিচার কর্‌বে?

সুবর্ণ আপনার মনেই বলিলেন—আমার ইচ্ছে কর্‌ছে মায়ের মত চেঁচিয়ে ওদের বলি—তোমাদের সভ্য-সমাজ থেকে হাত জোড় ক'রে বিদেয় চাইছি, আমাকে ছেড়ে দাও—করুণা তুই আরও থাক্‌তে চাস এখানে?

করুণা। আর একটু বোস না। ভাল না-ই বা লাগ্‌ল। আমার মনে হয় আমাদের দেখা দরকার, তা ছাড়া তোমার

আমার স'রে দাঁড়ানোর ওপর বিশেষ কিছুই নির্ভর করছে না দিদি!

ঠিক এই সময়ে মিসেস্ ডি'—র প্রবৃত্তির ইন্ধনে যে কুৎসার জ্বাল দেওয়া হইতেছিল তাহারই সৌরভে মোহিত হইয়া কতকগুলি নারী ভাবিতেছিলেন—ডাঃ মিত্র এবার অমলের নামে মানহানি আর বিবাহ-ভঙ্গের মামলা আন্‌বেন ... কল্যাণীকে নিয়ে এবার সমাজে যে আন্দোলন স্থরু হবে তার জন্যে আমাদের তৈরী হ'তে হবে ... শান্তার সঙ্গে আর যাতে কোন মেয়ে মিশ্‌তে না পায় তার চেষ্টা কর্‌তে হবে আর এ সব খবরগুলো তাড়াতাড়ি চারিদিকে প্রচার ক'রে দিতে হবে! ...

এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মহিলার স্বামীরা তটিনীকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলেন—She is not at all what she was. কিছু বোঝা গেল না ব্যাপারটা কি! Strange! ...

মিসেস্ কে, কে, দত্তের 'এ্যাট্ হোম্' পত্র পাইয়া মনীষা যখন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—খুকি, তুই যাচ্ছিস্ ত?

কল্যাণী একখানি চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করিয়া ধীরে-স্থস্থে সেখানি খামে বন্ধ করিয়া জিহ্বা দ্বারা আঠা লাগান স্থানটি একবার লেহন করিয়া লইয়া মনীষার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—উঁ—?

মনীষা। তুই পার্টিতে যাবি ত?

কল্যাণী চক্ষু আনত করিয়া একবার ঠোঁটের দুই পাশ সঙ্কুচিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঈষৎ নীলাভ কপালটির উপর কয়েকটি অতি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

মনীষা উত্তরের আশায় এতক্ষণ চুপ করিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মুখ ভ্যাঙাচ্ছিস্ কেন? যা হয় একটা ঠিক কর্।

কল্যাণী বিশেষ বিচলিত না হইয়া তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে কলমটি উঠাইয়া লইয়া দোয়াতে ডুবাইল, অতিরিক্ত কালি উঠিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিল, ঠিকানা লেখা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—তাই ত কর্‌ছি, বাবা, যা খিট্‌খিটে হচ্ছ তুমি দিন দিন!—

মনীষা হাসিয়া বলিলেন—কি ঠিক কর্‌লি শুনি?

কল্যাণী। মুনিবাবুকে লিখে দিলাম, মিসেস্ কে, কে, দত্তের পার্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। Let us celebrate it—

মনীষা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কল্যাণী চাকরকে ডাকিয়া চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া মনীষার কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল—মা-মণি, শনিবার দিন আমরা এখানে চড়িভাতি কর্‌ব; তুই রাগ কর্‌তে পাবি না, বারণ কর্‌তে পাবি না—সব আমরা ঠিক করেছি মা-মণি, তোর নেমন্তন্ন, বাবার নেমন্তন্ন, করুণা মাসীদের আর এদের ওদের, তাদের, বুঝেছিস্ মা-মণি?—

মনীষা। আঃ নাব্, বুড়ো হাতী আমার লাগে না?—

কল্যাণী। আগে বল্—নইলে হাতী বসেই রইল!

মনীষা হাসিয়া ফেলিলেন। কল্যাণী তাঁহার মুখে চুমা দিয়া বলিল —লক্ষ্মী মা-মণি। সে উঠিয়া কিছুক্ষণ, Swan dance-এর অনুকরণে শরীর দুলাইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর একটা কলম লইয়া ফর্দ্দ করিতে বসিয়া গেল।

মনীষা বলিলেন—করুণা-দি-দের ত ডাক্‌বি, সোনা-দিও আস্‌বেন, মায়া দীপ্তি কমলা উমাও বাদ যাবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু 'এরা ওরা তারা'টা কারা?

কল্যাণী চটিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা, তোমার সঙ্গে বক্‌তে বক্‌তে মুখের জল ছাতু হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌ছে। ওদের যেন চেন না!

মনীষা। ঘাট হয়েছে বাবা! মেয়ে নয় ত যেন তাড়কা রাক্ষুসী! তাহার পর উঠিয়া কল্যাণীর পাশে বসিয়া বলিলেন—তা হ'লে তোরাই সব কর্‌বি ত? আমাদের কিছু কর্‌তে দিবি না?

কল্যাণী। কিছু না, সুপ্রকাশবাবু নাকি পাকা রাঁধুনী, শ্রীশ-দা বল্‌ছিল। আমাদের plan সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল— শান্তাটারও 'রাঁধ্‌ব খাওয়াব' রোগ আছে, দুটোকে ছেড়ে দিয়ে—

মনীষা। তবেই হয়েছে! সে রান্না ঠাকুর আর কুকুর ছাড়া আর কারো মুখে তোল্‌বার জো থাক্‌বে না।

মনীষার কানের কাছে মুখ আনিয়া কল্যাণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—জানিস্ মা-মণি, শান্তাটা—

মনীষা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিলেন—ছি, অমন ভাবে এ-সব কথা বল্‌তে নেই—

কল্যাণী। কিন্তু সত্যি মা-মণি।

মনীষা। তাহ'লে এ নিয়ে কোন দিন আলোচনা করিস নি, কাকেও কর্‌তে দিস্ নি।

কল্যাণী। এটা অন্যায় মা-মণি ?

মনীষা। না সেজন্যে বলি নি, পৃথিবীতে বেশীর ভাগ মানুষই ভালবাসাটাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে, যারা সত্যি ভালবাসে তাদের সেটা বড় আঘাত করে কিনা, তাই তোকে বারণ করছিলাম।

কল্যাণী মনীষার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—শান্তা বল্‌ছিল—ওকে পাই আর না পাই, ওর দেখা যে পেয়েছি এই ঢের।

মনীষা। সুপ্রকাশের কি মত শান্তার সম্বন্ধে জানিস্ ?

কল্যাণী। শান্তা বল্‌ছিল—ও সর্ব্বদা আমাকে তফাতে রাখ্‌তে চেষ্টা করে।—তা ছাড়া আমি নিজে ওর কথা শুনে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় কোথাও ওর মন ভেঙ্গেছে মা। মেয়েদের সম্বন্ধে ও বড় বেশী stiff! আর সব বিষয়ে এমন মিষ্টি, কি বল্‌ব! আমি শান্তাকে বল্‌ছিলাম—তুই একটু চেষ্টা কর্‌লেই ত ওর stiffness সরিয়ে নিতে পারিস্ ?

—ও বল্‌ল—হৃদয় জয় কর্‌বার বাসনা আমার আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই। আচ্ছা মা, ওটা বোকার মত কথা নয় ?

মনীষা হাসিয়া বলিলেন—তার মানে ?

কল্যাণী। ভাল যদি বাসি তাহ'লে ছলে বলে কৌশলে কেঁদে কোকিয়ে যেমন ক'রে পারি ভালবাসা আদায় ক'রে নেবো। বা রে! আমি ভালবেসে মর্‌ব, আর সে বাস্‌বে না ? কি আব্দার!—

মনীষা। আচ্ছা খুকি, তুই মা-মণিকে একটা কথা বল্‌বি ?

কল্যাণীর মুখে যেন জগতের সমস্ত দুষ্টু মেয়ে আসিয়া উঁকি মারিল। মনীষার কথায় সে চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া গলার স্বর বদ্‌লাইয়া কি যে বলিতে চাহিল তাহা সে-ই জানে। মনীষা কল্যাণীর কাণ্ড দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—কি জিগ্‌গেস কর্‌বি কর্‌ না, অমন কর্‌ছিস কেন?

মনীষা। আমার ধারণা সত্যি?—

কল্যাণী। তুই ডাইনী-মা হ'তে পারিস, আমি ত আর ডাইনি-মেয়ে নই, তুই কি ভেবেছিস্ তা কি জানি? আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কল্যাণী চলিয়া যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া মনীষাকে তখনও হাসিতে দেখিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া মুখ লুকাইল। মনীষা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—কেন আমায় এতদিন লুকোলি খুকি?—

কল্যাণী কোন কথা না বলিয়া মনীষার গলায় একটি চুম্বন করিল। মনীষা দেখিলেন কল্যাণীর চোখে দুই ফোঁটা জল টল্ টল্ করিতেছে!

* * *

তখন বেলা প্রায় একটা হইবে। মুনি তাহার ঘরে পায়চারী স্থরু করিয়া দিয়াছে। ঘরের মধ্যে দুইখানি বড় বড় আয়না, সাম্‌না-সাম্‌নি ভাবে ঝুলানো রহিয়াছে। প্রতিবার তাহাদের নিকটে আসিলেই সে আপনার মুখ দেখিয়া লইতেছে,—বিড়্ বিড়্ করিয়া কি সব যেন বকিতেছে, মাথা নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া হাত নাড়িয়া যেন সে কোন অদৃশ্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অভিনয় করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি ঘড়ির উপর পড়িল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চিন্তাক্লিষ্টভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া সে যেন কিসের হিসাব করিয়া লইল, তাহার পর আবার ঘড়ির দিকে চাহিল—১ টা ২৩ মিনিট্!

সাম্‌নের আয়নার দিকে চাহিয়া বেশ নিশ্চিন্তভাবে বলিল—ওঃ এতক্ষণ?—এতক্ষণ নিশ্চয়ই সবাই এসে গেছে, নিশ্চয়ই এসেছে। এ সব ক্ষেত্রে যত দেরী করে যাওয়া যায় ততই ভাল, কেউ না ভাবে

আমারই তাড়া বেশী—বেশ সহজ ভাবে ধী... সবার শেষে যাব—তাতে অবশ্য একটা রাগের চাউনি যদি... তবু—নাঃ, আর দেরী করা নয় সবাই যখন এসেই গেছে, তখন—

সে তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা বাহির করিয়া সাজিতে সুরু করিয়া দিল। তাহার পর ঘরের বাহিরে আসিয়া একবার পিতার ঘরের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাইয়া কিছু শব্দ শুনিতে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর দরজার দিকে কয়েকপদ অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেই অত্যন্ত সরু গলায় মুনির ছোট বোন চারু বলিয়া উঠিল—বাঃ ঠিক যেন কার্ত্তিকটি!—

মুখ বিকৃত করিয়া মুনি ইসারায় তাহাকে মারিবার জন্য ঘুসি দেখাইল। তাহাতে খানিকটা হাসির শব্দ উপহার পাইয়া মুনি যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। বলিল—পোড়ারমুখি, দুপুর বেলা টো টো করে বেড়াচ্ছিস্, বাবাকে বলে দেবো?—

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পোড়ারমুখী বলিল—তুমি কোথায় যাচ্ছ দাদু? বাবারে! 'সেণ্টে'র গন্ধ যে ভর্ ভর্ করছে! সব শিশিটাই গায়ে ঢেলে দিয়েছ নাকি?—

নিরুপায় হইয়া মুনি বলিল—কোথা যাচ্ছি জানিস্? তোর একটা বরের সন্ধান পেয়েছি, তাকে দেখ্তে যাচ্ছি।

চারু। ওঃ কি উদার অন্তঃকরণ গো! আচ্ছা দাদু, ঐ সোজা সোজা অক্ষর, মোটা মোটা চিঠি তোমায় কে লেখে রোজ রোজ?—

মুনি। ও আমার একজন 'ক্লায়েণ্ট'।

চারু মুখখানি বাঁকাইয়া বলিল—ক্লায়েণ্ট মানে কি দাদু?—

মুনি রাগিয়া বলিল—'ক্লায়েণ্ট' মানে কি দাদু'—বাঁদরি, ইস্কুলে যাও কি করতে?

চারু। পড়তে।—কিন্তু তোমার মত ক্লায়েণ্টের খোঁজ করতে নয়। তোমার ক্লায়েণ্ট তোমায় ডেকেছে বুঝি? খুব জরুরী কোন মকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখাবে বুঝি? তা বেশ যাও, বাবা উঠলে আমি বলব অখন—দাদু তার ক্লায়েন্টের বাড়ী গেছে।

মুনি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে বলিল,—ফিরে এসে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

উত্তরে সে শুধু একটু তীব্র অথচ চাপা হাসির শব্দ শুনিতে পাইল।

কিন্তু এত হিসাব এত সাবধানতা সত্ত্বেও ৯৯ নম্বরে আসিয়া মুনি দেখিল, তখনও কেহ আসে নাই! তাহার পর রণজিৎ প্রশ্ন করিল—আপনি একা যে?—ওঁরা কেউ এখনও এলেন না?—

মুনি ভিতরে ভিতরে ঘামিয়া উঠিল। রণজিৎকেই যেন কৈফিয়ৎ দিবার জন্য সে বলিল—তাই ত কি আশ্চর্য্য! অথচ আমাকে ওরা বলল যে একটার মধ্যেই সবাই আসবে!

মনীষা বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনার বন্ধুদের তা'হলে ত বড় অন্যায়! তা আর কি হবে, আপনি ত আর জলে পড়েন নি?—তা ছাড়া কাজও ত আপনাদের ঢের রয়েছে, যান না ও ঘরে, খুকি আর শান্তা কি-সব করছে তাদের সাহায্য করুন। আমাকে ওরা ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না বলেছে। কিন্তু রান্না যদি খারাপ হয় এমন নিন্দে করব যে টের পাবেন সবাই।

মুনি ডাইনিং রুমে আসিয়া দেখিল একরাশ কিসমিস, বাদাম, পেস্তা লইয়া শান্তা এবং কল্যাণী বসিয়া আছে, কিন্তু সেগুলি যে কতদূর 'বাছা' হইতেছে, তাহার বিষয় বলিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে। কথা কহিতে কহিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া একটি একটি

করিয়া বাদাম বা পেস্তা লইয়া উভয়ে নাড়া চাড়া করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখেও যে উঠিতেছে না, তাহাও বলা যায় না।

মুনিকে দেখিয়া একরাশ পেস্তা মুখে পুরিয়া কল্যাণী হুকুম করিল—ঐ চালগুলো শিগ্‌গির বেছে দিন্, একটি যদি কাঁকর থাকে বুঝ্‌বেন।—'

শান্তা হাসিয়া বলিল—'পড়েছেন যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' নিন্ ব'সে পড়ুন।

মুনিও বিনা আপত্তিতে কল্যাণীর পাশে বসিয়া একটি বড় থালে চালগুলি ঢালিয়া বাছিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অনেক বিষয়ে মুনি যে বিশেষ দক্ষ এই তথ্যটি সে কল্যাণীর সহিত আলাপ হইবার পর হইতেই আবিষ্কার করিয়াছিল কিন্তু চাল-ডালও যে সে এমন তৎপরতার সহিত বাছিতে পারে তাহা এই প্রথম জানিল।

শান্তা বলিল—আপনি পার্‌বেন দেখ্‌ছি!

মুনি হাসিয়া শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি শান্তা-দি?

শান্তা দুষ্টামি করিয়া কল্যাণীর দিকে তাকাইয়া বলিল—কল্যাণীর ভাঁড়ার ঘর গুছিয়ে দিতে—এই কথাটি শেষ না হইতেই তাহার গালে যাহা আসিয়া আঘাত দিল তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া কিস্‌মিসের অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও একেবারেই মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয় নাই!

শান্তা হাসিতে হাসিতে মুখ মুছিতে লাগিল। এই অবসরে মুনি এবং কল্যাণী একবার চকিতভাবে পরস্পরকে দেখিয়া লইল। এই সময়ে মনীষা আসিয়া বলিলেন—ওরে খুকি, তা হ'লে বয়কে এ বেলা ছুটি দিয়ে দিই? তোরা ওকে চাস্ না ত?

কল্যাণী: এখুনি ওকে বিদেয় করে দাও মা, আজ আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে ও যেন না আসে।

মনীষা। বেশ, ও সব জোগাড় ক'রে রেখে যাচ্ছে রান্না ঘরে, সব হাতের কাছে পাবি, আমাকেও তোরা চাস্ না ত?

কল্যাণী 'এপ্রিকট্' লইয়া মনীষার মুখে পুরিয়া দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—বেরো এ ঘর থেকে।

তিনজনে আপন আপন কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য যখন মাতিয়া উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের কথার স্রোতও বন্ধ হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে মহা কলরব করিতে করিতে উমা কমলা শ্রীশ দীপ্তি ও মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিকে তদবস্থায় দেখিয়া মায়ার হাসি আর থামে না! বলিল—হাঁরে কল্যাণী, এমন faithful slave কোথায় পেলি?—এই কম্‌লি, মুনিবাবু কেমন পা ছড়িয়ে চাল বাছ্‌ছেন দেখ্! শুপুরি কাট্‌তে পারেন মুনিবাবু?—

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—তোমার অত হাস্‌বার দরকার নেই, আমাদের পাচক ঠাকুরটিকে দেখ্‌লে তোমার চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে যাবে। কিন্তু সে ভদ্রলোকের হ'ল কি! শ্রীশ-দা শেষটা সব পণ্ড হবে নাকি?

শ্রীশ। আসবার সময় একবার ভেবেছিলাম ওকে তুলে নিয়ে আসি, মায়া বারণ কর্‌ল, বল্‌ল—হাঁ এতক্ষণ তিনি বাড়ীতে আছেন কি না? নিশ্চয়ই 'নাইন্‌টি নাইনে' গেছেন।

কল্যাণী। এখ্‌নি যাও, তোমার গাড়ী ত রয়েছে তাকে নিয়ে এস।

শ্রীশ বেশ আরাম করিয়া বসিয়া বলিল—সে-ও ত বড় হাঙ্গাম! তা এক কাজ কর না কেন, আমাদের গাড়ীটা নিয়ে মুনিকে পাঠিয়ে দাও।

কল্যাণী ফোঁস্ করিয়া উঠিল—তোমার কি আক্কেল শ্রীশ-দা! উনি না, আমাদের 'গেষ্ট'?—

মায়া। আহা এর বেলায়ই গেষ্টের ওপর নত টান পড়্‌ল! আর এতক্ষণ যে এক কাঁড়ি চাল বাছিয়ে নিলেন, তখন গেষ্ট

বলে মনে ছিল না? চড়িভাতিতে আবার গেষ্ট কি? মুনিবাবু must go—

মুনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিল—যদি অভয় দেন একটা কথা আপনাকে বলি মায়া-দি,—আমার মনে হয় এই ছুটোছুটির কোনই দরকার নেই, সময় হ'লেই সে আসবে। আমাদের ব্যস্ত হওয়া-না-হওয়া এ ক্ষেত্রে সমান কথা। যদি যাই হয় ত সেখানে গিয়ে দেখ্‌ব সে বাড়ীতে নেই। তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে যদি soul force প্রয়োগ করি।—'

কিন্তু আর soul force প্রয়োগের প্রয়োজন হইল না, সুপ্রকাশ, জীবন, বিকাশ আসিয়া হলের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইল।

সকলের এই বিলম্বের জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সকলকে ঘরে আনিয়া বসাইতেই শ্রীশ বলিল—আমরা সবাই বোধ হয় এসেছি?—

মায়া বহুক্ষণ হইতেই চারিদিকে তাকাইতেছিল, সে জীবনকে বলিল—সহকারী মহাশয় আপনি একাই এসেছেন নাকি? কিন্তু চিঠিখানাতে সম্পাদক মহাশয়কেও সমান একাগ্রতার সঙ্গে আমরা আহ্বান করেছিলাম।

জীবন। তার আস্‌বার বিশেষ ইচ্ছে ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে তার শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না, তাই বল্‌ল—আমার company-টা হয় ত ওঁদের পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়্‌তে পারে।

কল্যাণী। Just like a man! আমাদের সহ্য অসহ্য নিয়ে, তাঁর মাথা ঘরাবার কোন দরকার নেই।

কল্যাণী ঘরের কোণে যেখানে টেলিফোন বসান আছে তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একটি নম্বর খুঁজিয়া বাহির করিল, তাহার পর বিপুল বেগে 'রিং' করিয়া বলিল—Six naught nine naught Regent, please—তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যালো!

আপনি নিশ্চয়ই ?— ভয়ানক রাগ করেছি আপনার ওপর বিমলবাবু, কেন এলেন না ? না, কোন explanation শুন্‌তে চাই না বিমলবাবু—এই শুনুন, আপনি না-এলে আমাদের ভয়ানক খারাপ লাগ্‌বে। শরীর কি খুব খারাপ ?—না ? তবে আসুন লক্ষ্মীটি, কেমন ? আমি শ্রীশ-দা'র গাড়ী পাঠাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ 'রেডি' হয়ে নিন্, কেমন ?—আচ্ছা।

'রিসিভার'টি নামাইয়া রাখিয়া সে শ্রীশকে বলিল—তোমার ড্রাইভারকে ব'লে দাও বিমলবাবুকে এখানে নিয়ে আস্‌তে।

শ্রীশ কল্যাণীর আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ওহে প্রকাশ, রন্ধন-সমুদ্র-মন্থনে তুমিই আমাদের আশা ভরসা যা-কিছু বল সবই কিন্তু বেড়ি খুন্তি হাতে তোমাকে রান্নাঘরে পাঠাবার পূর্ব্বে 'সূপকার্য্যের গুহ্যরহস্য' সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই।—কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সহায়তা কর্‌তে পারে।

সুপ্রকাশ হাত জোড় করিয়া ব্যাকুলভাবে শ্রীশের মুখের দিকে তাকাইয়া অভিনয়ের স্বরে বলিল :—

কহ বন্ধু, কহ শুনি কেমনে উঠিবে
ফুটি' ডেক্‌চি ভিতরে কোর্ম্মা-পোলাও
টগ্ বগ্ ছ্যাক্ ছোঁক্ ছনন ছনন
গানে,—গন্ধে পথিকের পথ হবে ভুল !
ম্লানমুখে যেতে যেতে আঘ্রানি বাতাস,
লেহন করিয়া নিজ লালাসিক্ত আবেশ-
বিহ্বল ওষ্ঠ দুটি, কহিবে কাতরকণ্ঠে—
হায়, কেগো তুমি সীমন্তিনী ! মোর ঘরে
কেন তব হ'ল নাক ঠাঁই—

সকলে হাসিয়া অস্থির হইল। কল্যাণী বলিল—শ্রীশ-দা, তোমার শিষ্যটি উপযুক্ত, তোমার উপদেশ বৃথা হবে না।

শ্রীশ। একেবারে গুরু-মারা চেলা! অতএব উপদে[illegible] উপস্থিত মুলতুবি থাক্।

উমা। বটে আর কি? তা হচ্ছে না, নাও আ[illegible], আর দাম বাড়াতে হবে না।

শ্রীশ বলিল—এক ভদ্রলোক একদিন তাঁর রান্না কর্‌বার জন্যে একটি পাকা-রাঁধুনীর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর যাকে নিয়ে ঘরে ফির্‌লেন আর রাঁধ্‌বার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে স্নান কর্‌তে যাবেন ব'লে তেল মাথ্‌তে বস্‌লেন, সেই পাকা-রাঁধুনী বেশ বিনয় সহকারে বল্‌ল—আজ্ঞে আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু আপনি একবার না দেখিয়ে দিলে—

ভদ্রলোকটি ত অবাক্! বল্‌লেন—সে কি রে! এই না আমায় বল্‌লি সব পার্‌ব?

—আজ্ঞে কিছু মিথ্যে বলি নি কর্ত্তা—দেখিয়ে দিলেই সব পার্‌ব।

—ভদ্রলোকটি ত মহা চটে গেলেন। কিন্তু কি আর করেন? বেলাও ঢের হ'য়ে গেছে, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে, বল্‌লেন—আচ্ছা আমি যা বলি তা কর্, রান্না ঘরে ঢুকে দেখ্ উনানে আঁচ্ আছে ত?

—আজ্ঞে হাঁ কর্ত্তা।

—আচ্ছা, হাঁড়িটা বসা—বসিয়েছিস্?—

—হাঁ হুজুর।

—জল ঢাল্,—ঢেলেছিস্?

—হাঁ কর্ত্তা।

—আচ্ছা, এবার ঐ গামলায় যে চালগুলো ধোয়া আছে, তা ঢেলে দে,—দিয়েছিস্?—

—হাঁ হুজুর।

—যা ব্যাটা এবার সরাটা মুখে চাপা দিয়ে ঘুমোগে' যা, আমি এসে তরকারী রাঁধ্‌ব।

ভদ্রলোকটি স্নান করতে গেলেন—ফিরে এসে দেখেন—উনান নিভে গেছে, হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে বসান আছে, ঘরের মেঝেতে চাল ঢালা! আর জলের ওপর মুখে সরা চাপা দিয়ে পাকা-রাঁধুনী মশাই ঘুমচ্ছেন!

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—এটা চিম্‌টি কাটা হ'ল! আচ্ছা সুপ্রকাশ-বাবু, আপনি এটা সহ্য করবেন?

সুপ্রকাশ। কখনই না। আমাকে ব'লে দিন ত রান্না ঘরে যাবার পথটা কোন্ দিকে, তার পর সব দেখে নিচ্ছি।

মনীষার সহিত প্রবোধ এই সময়ে ঘরে আসিয়া বলিলেন—শ্রীশ, আমি তোমাদের পাকা-রাঁধুনীমশাইয়ের উৎসাহের প্রশংসা করি কিন্তু এক কাজ করলে হয় না, তোমরা যত দূর সম্ভব রাঁধা-বাড়া কর, আমরা পার্টি থেকে ফের্‌বার পথে 'ফার্পো' থেকে কিছু—

কল্যাণী। এ অসহ্য সুপ্রকাশবাবু—

সুপ্রকাশ দাঁড়াইয়া বলিল—আমি প্রস্তুত, শুধু এক জন এসিস্‌টান্ট চাই।

কল্যাণী শান্তার দিকে চাহিয়া বলিল—শান্তা—

তাহার পর মহা কলরবে সকলে সুপ্রকাশকে লইয়া রান্না ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

একটা 'ন্যাপ্‌কিন্' কোমরে জড়াইয়া জামার হাত গুটাইয়া ডেক্‌চিটাকে 'ওভ্‌ন্'-এ বসাইয়া দিল; তাহার পর দধি, হলুদ, আদাবাটা পেঁয়াজবাটার ভাগ মাংসের পরিমাণে কতটা করিয়া দিতে হয় তাহা সকলকে দেখাইয়া মাংস কষিতে আরম্ভ করিল। মনীষা এবং প্রবোধ অবাক্ হইয়া গেলেন!

কল্যাণী চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—এবার হয়েছে ত?

মনীষা সুপ্রকাশের অভ্যস্ত হাতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—হয়েছে—কিন্তু এখানে এত লোকে ভিড়্ কর্‌লে ত চল্‌বে না। রান্না ঘরে দুজনের বেশী মানুষ থাকা শাস্ত্রের বারণ।

কল্যাণী। আমিও ত তাই বল্‌ছি,—এই উর্মি, কম্‌লি, বেরো এ ঘর থেকে—মায়া বেশ যা হোক! জীবন আর বিকাশবাবু, ও ঘরে চলে গেলেন, যা ওঁদের কাছে,—শ্রীশ-দা, তোমারই বা কি আক্কেল! আর এই রণজিৎ, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছিস্?—যা দশ নম্বরে এনা বীণার সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্‌টন্ খেল্‌গে, যা।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে রান্না ঘর হইতে সকলকে তাড়াইয়া দিয়া মুনিকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল—বাবা মা বেরিয়ে গেলে, আর ঐ ছেলেমেয়েগুলো কথাবার্ত্তায় জমে উঠ্‌লে আমি একবার হাঁচ্‌ব, ঠিক তার তিন মিনিট পরে তুমি বেশ সহজভাবে—মানে carelessly উঠে এটা ওটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিঁড়ি দিয়ে আমার ছাদের ঘরে চলে যাবে—বুঝেছ?

মুনি একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল—সে সমস্তই বুঝিয়াছে এবং এই আদেশ পালন করিতে অন্যথা করিবে না।

কল্যাণী বলিল—এখন ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ জমাও—আমি আজ খালি চর্‌কি-পাক খেয়ে বেড়াব, কোথাও ধরা দিচ্ছি না।

*　　*　　*　　*

রান্নাঘর হইতে সকলে বাহির হইয়া যাইতেই সুপ্রকাশের মুখের সরলতার ভাবটি সরিয়া গেল। শান্তা যে তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে পলকহীন চোখে দেখিতেছে তাহা যেন সে জানে না; তাহার অস্তিত্বও যেন সুপ্রকাশ ভুলিয়া গিয়াছে।

নিস্তব্ধ ঘরে ডেক্‌চির মধ্যে মাংস ফোটার শব্দ উঠিতেছে, সুপ্রকাশ মাঝে মাঝে তাহা খুন্তি দিয়া নাড়িয়া ডেক্‌চির মুখ চাপা দিতেছে, ওভ্‌নের তেজ কম-বেশী করিতেছে, কিম্বা কোন কিছু লইয়া আপনার মনে নাড়া-চাড়া করিতেছে।

হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের ওভ্‌নের গ্যাস খুলিয়া দিয়াশলাই দিয়া জ্বালিল, তাহার পর একটা কড়া চাপাইয়া দিয়া মাছের কোন একটা তরকারী রাঁধিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। শান্তা সরিয়া আসিয়া বলিল—আমি রাঁধ্‌ব এ মাছটা ?—

সুপ্রকাশ একবার ভাবহীন চোখে শান্তার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—রাঁধুন।

দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আপনাদের কাজ করিয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই, মাঝে মাঝে নড়িতে চড়িতে পরস্পরের হাতের স্পর্শ পাইতেছে। শান্তা তাহার কড়া হইতে মুখ উঠাইয়া সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল—সুপ্রকাশবাবু—

সুপ্রকাশ তাহার ডেক্‌চি হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—বলুন—

শান্তার বুকের মধ্যে যেন কি সব গুটি পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। গলা কাঁপিয়া যাইবার ভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় মুখের দিকে

তাকাইয়া বলিল—আমি কি আপনার জীবনে অশান্তি এনে দিচ্ছি সুপ্রকাশবাবু ?—

সুপ্রকাশ তাহার শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া শান্তার সাম্‌নে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চোখদুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য ! এ সব কি বল্‌ছেন শান্তা দেবী ? না, এমন কথা আমার মনে ওঠে নি কোন দিন, বিশ্বাস করুন । কেন ভাব্‌লেন ও কথা ?—

শান্তা মুখটি নামাইয়া ফুটন্ত মাছগুলির গায়ে ধীরে ধীরে খুন্তি ছোঁয়াইয়া বলিল—সবার কাছে আপনি সহজ, সবার কাছেই আপনি হাসেন আর সে হাসিটা যে আপনাকে কত সুন্দর ক'রে তোলে—

শান্তা থামিয়া গিয়া আবার আরম্ভ করিল—কিন্তু আমি যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি, মনে হয় যেন আমি আপনার ঐ হাসির পথ বন্ধ ক'রে আছি। আপনার মধ্যে সবাই যেটাকে পেয়ে তৃপ্ত হয় সে-টুকুও আমি পাব না কেন ?—

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—সে দোষ আপনারই, কেন সবার থেকে আলাদা হ'য়ে আমার কাছে এলেন ?—

শান্তা। ওঃ এই অপরাধ ? তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমায় অমন ভাবে অপমান ক'রে চলে এলেন ?—

সুপ্রকাশ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—অপমান ?—

শান্তা সুপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—অপমানই ত সুপ্রকাশবাবু, মনে আছে, আপনি আমায় কি বলেছিলেন ?

সুপ্রকাশ। না, কিছু মনে নেই কি বলেছি। তবে 'আপনাকে অপমান করব ব'লেই বলেছি' এ ধারণাটা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারেন না ?

শান্তা। আপনি মুছিয়ে দিন্।

সুপ্রকাশ নীরবে কিছুক্ষণ শান্তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চোখের তারা দুটির উপর বাষ্পের অত্যন্ত পাত্‌লা একটা আবরণ আসিয়া দেখা দিল। ধীরে ধীরে আপনার বুকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলিতে লাগিল—আমার এই বুকটার ভিতর একটা আগুন জ্বল্‌ছে, তারই জ্বালায় আমি তিল তিল ক'রে মর্‌ছি—আমি আজ বহু দিন অসুস্থ। আমার এই অসুস্থতা হাসি আর হাল্কা ভাব দিয়ে সবার চোখের দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে রাখি। আপনার কাছে এ ভণ্ডামি আমার ধরা পড়ে গেছে। তাই প্রতি কথা, প্রতি কাজে আপনি আপনার সান্ত্বনার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে চান—কিন্তু যাদের হাতে এ আগুন জ্বলেছে, এ জ্বালার শান্তির জন্যে তাদেরই কাছে এসে দাঁড়াতে হবে, শুধু এই কথাটা ভেবেই এমন একটা দুর্ব্বলতার কান্না মনে জাগে, যাকে সব সময় থামান দুষ্কর হ'য়ে ওঠে শান্তা দেবী!

শান্তা গ্যাস কমাইয়া দিয়া মাছগুলিকে টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সুপ্রকাশের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি আমায় নির্লজ্জ বা যা-কিছু ভাব্‌তে পার প্রকাশ, আমি তোমাকে আজ ব'লে যেতে চাই যে, তোমাকে আমি আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি, আমার নিজের চোখে দেখা তোমার লুকান রূপে আমার চোখ ভ'রে উঠেছে, মনটার ত কথাই নেই!—তাই এত দিন নানা ছলে তোমায় কাছে ডেকেছি, কথা বলেছি, সব দিক দিয়ে তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে কত রকমের আয়োজন করেছি; কিন্তু এইটাই যদি তোমার সব চেয়ে বড় অশান্তির কারণ হয়, তাহ'লে এখানে, আজই সব শেষ ক'রে দেবো প্রকাশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কোন দিন কোন দিক্

দিয়ে তুমি আমায় অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা ব'লেও দেখ্‌বে,—এ সে শান্তা নয়।—

সুপ্রকাশ শান্তার একখানি হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—আজ আমায় আর কিছু ব'ল না, থাক্, সইতে পার্‌ব না শান্তা।

শান্তা সুপ্রকাশের চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—যদি অনুমতি দাও, তোমার বোঝা আমি নামিয়ে নিই—

ম্লান হাসিয়া সুপ্রকাশ বলিল—নামান যায় না।

শান্তা। ওর ভাগ ত নিতে পারি ?

সুপ্রকাশ। এত বড় কাপুরুষ কি ক'রে হই ?

শান্তা। কাপুরুষ ?—

সুপ্রকাশ। ওটা কাপুরুষতা নয় ?

শান্তা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—তোমার কাছে হ'তে পারে, আমার কাছে নয়।—কাল আস্‌বে একবার আমার কাছে ?

সুপ্রকাশ শান্তার হাতের আঙ্গুলগুলি একবার ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল।

শান্তা। আস্‌বে না ?—

সুপ্রকাশ। আস্‌ব।

শান্তা। অমন অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে কেন ?

সুপ্রকাশ। আর একটা কথাও ঐ সময় ভাব্‌ছিলাম।

শান্তা। কি কথা ?—

সুপ্রকাশ শান্তাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—শান্তিকে বুকের এত কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে হবে।—

শান্তা। কেন ?—

সুপ্রকাশ। কাল সব জান্‌বে।—তোমার মাছের ঢাকাটা তোল, বোধ হয় হ'য়ে গেছে।

ইহার পর দুইজনে ভাগাভাগি করিয়া রান্না আরম্ভ করিয়া দিল, তেল নুন বা মশলার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় ছাড়া আর কোন কথা কহিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুইজনে দুইজনকে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া লইতেছিল।

রান্না ঘর হইতে 'হলে' আসিয়া জীবনের সহিত কথা কহিতে গিয়া মায়া অবাক্ হইয়া গেল। যে-মানুষ এক দিন স্পষ্টভাবে একজনের কাছে স্বীকার করিয়াছে 'তোমায় ভালবাসি' তাহারই কাছে সে এমন সহজ এবং নির্লিপ্তভাবে বসিয়া কথা কহিতে পারে? হাব ভাব চাহনিতে জীবনের মনের সরলতা ছাড়া এমন কিছুই মায়া দেখিতে পাইল না যাহাকে সে ভয় করিতে পারে বা যাহা ভাবিয়া তাহার মনে সহানুভূতি জাগিতে পারে।

একসময় জীবন মায়াকে বলিল—আচ্ছা, আপনি বাঙ্গাল-দেশে গেছেন?

মায়া হাসিয়া বলিল—বাঙ্গাল-দেশ, মানে পূর্ব্ব-বঙ্গে?—না, যাই নি।

জীবন। আমি বিয়ে ক'রেই আমার দেশে আপনাদের সকলকে নিয়ে গিয়ে একটা পার্টি দেবো—শরৎকালটা আমাদের দেশ ভারি সুন্দর দেখায়—জানেন, আমাদের বাড়ী-ঘর সব জলে-ঘেরা, সে এক রকম প্রায় ভিনিস্ বল্‌লেই চলে।

মায়া। কবে নিয়ে যাবেন?

জীবন। বিয়ে হ'লেই।

মায়ার যেন আর দেরী সহ্য হইতেছিল না, বলিল—তা হ'লে শিগ্‌গির বিয়ে করুন—কবে কর্‌বেন ?

জীবন। যেদিন বৌ খুঁজে পাব।

মায়া। একটু তাড়াতাড়ি বার করুন,—next autumn, কেমন ?

জীবন। দেখুন। আমার হাত-যশ, আর আপনার বরাত।

মায়া। আমরাও খোঁজার ভার নেবো ?

জীবন। I trust nobody

মায়া। তাহ'লে খোঁজ্ আরম্ভ করেছেন ?—পেলেই আমায় খবর দেবেন ?

জীবন। সবার আগে।

মায়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। কিন্তু তাহার এই শান্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। ধীরে ধীরে বিমল আসিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া মায়াকে নমস্কার করিয়া একটি চেয়ারে বসিল।

বহু দিনের পরিচিত হইলেও দীপ্তি বিমলের সহিত গায়ে পড়িয়া কথা কহে না বা আলাপ করে না; আজ বিমলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার চোখের অবসাদে-ভরা চাহনির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে বেদনার উৎস লুকান ছিল তাহা সে যেন দেখিতে পাইল। সে উঠিয়া আসিয়া বিমলের পাশে বসিয়া বলিল—সত্যি সত্যি যে পনার শরীর বড় খারাপ হয়েছে বিমলবাবু! দিন কতক কোথাও ঘুরে আসুন না ?

জীবন বলিল—বলুন ত মিস্ মিত্র, আমি হয়রাণ হয়ে গেছি।

বিমল হাসিয়া বলিল—না, এখন আমি অনেকটা ভাল আছি, মাঝে খুব দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু তখন ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি। আমার জন্যে কিছু ভাববেন না, তা ছাড়া জীবন এখন আমায় আর কোন কাজই কর্‌তে দেয় না, আমার খাতা-পত্তর সব ও 'বাজেয়াপ্ত' করেছে, শুধু তাই নয়, একজোড়া মুগুর এনে ঘরে রেখেছে, বলে, exercise কর্‌তে হবে !

দীপ্তি। বেশ করেছেন, আমি খুব খুশী হয়েছি। আজ সন্ধ্যায় মা ত এখানে আস্‌ছেন, এলেই আমি নালিস কর্‌ব।

বিকাশ বলিল—মায়া-দি, আপনি যে কিছুই বল্‌লেন না বিমল-বাবুকে ?

মায়া বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমি ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি ওঁকে এ রকম দেখে, বল্‌বার কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না—আচ্ছা বিমলবাবু, এতগুলি মানুষের স্নেহের কি কোন মূল্যই নেই ?

বিমলের মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল চীৎকার করিয়া বলে—পুরুষের কাছে স্নেহের কোন মূল্যই নেই, প্রেমই তার সব। নারীর সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য। নারীর পক্ষে স্নেহই যথেষ্ট। তাই নিয়ে তারা বেশ দিন কাটাতে পারে—কিন্তু পুরুষের তা অসহ্য।

বিমল কি বলিতে যাইতেছিল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছোট একটি শব্দ হইল—হ্যাঁ—চ্ছো—ও—এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া কল্যাণী বলিল—বাবা ! ও তুটোতে কি রাঁধ্‌ছে ! ফোড়নের গন্ধে যে বাড়ী ভ'রে গেল !

কল্যাণী হল্‌ হইতে চলিয়া যাইবার পরই দেখা গেল, মুনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ! হাত আড়াল দিয়া তুইবার হাইও তুলিল, তাহার পর

উঠিয়া হলের দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখিতে দেখিতে একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া এক সঙ্গে দুই তিন ধাপ্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া কল্যাণীর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে আসিয়া একটি চেয়ারে অত্যন্ত শান্ত শিশুটির মত বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই কল্যাণী আসিয়া তাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার আর পোষাবে না।

মুনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি ?

কল্যাণী। পোষাবে না, ব্যস্।

মুনি। আমি কি করেছি ?

কল্যাণী। কিছু না। তাই ত তোমার সঙ্গে আমার পোষাবে না বলেছি,—আমিই সব কর্‌ব, আর উনি কিছু কর্‌বেন না, কি ক'রে পোষাবে ?—অন্য ছেলে হ'লে কত মৎলব খাটাত, কত চিঠি লিখ্‌ত, কত উপায়ে দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত—তুমি এ-সবের কিছু করেছ ?

মুনি স্বীকার করিল, সে কিছুই করে নাই। শেষে বলিল—দেখ, তুমি নিজে যে-সব উপায় ঠিক কর, তা এমন সহজ আর চমৎকার যে আমাকে কিছু ভাব্‌তেই হয় না। এই দেখ না, সেদিন তুমি লিখে পাঠালে—Come and study in the Fossil section, Indian Museum, 12th, noon, positively . . . , আমি সাড়ে এগারোটা থেকে সেখানে গিয়ে সব study কর্‌তে লাগ্‌লাম—তুমি সকলের সঙ্গে এসে হঠাৎ আমায় খুঁজে পেলে।—তারপর একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একজিবিশনে আমি সেই রাশিয়ান আর্টিষ্ট-এর আঁকা ছবিখানা দেখ্‌ছি, তুমি accidentally আমায় খুঁজে পেলে।—চিড়িয়াখানার সেই অশোক গাছের তলায় বিরহী যক্ষের মত বসে আছি হঠাৎ শুন্‌লাম—ওমা, এ যে মুনিবাবু, কি আশ্চর্য্য !

কোন ঝঞ্ঝাটই আমায় পোহাতে হ'ল না। কোন 'স্কাণ্ডেল্ মঙ্গারে'র 'ফাদার্-ইন্-ল'ও কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কারণ সর্ব্বদাই আমরা দলে ভারি থাক্‌তাম।

কল্যাণী। এমনি ক'রেই কি চিরদিন চল্‌বে নাকি?

মুনি। নিশ্চয়ই না।

কল্যাণী। তার আয়োজন কি করছ শুনি?

মুনি। আয়োজন?

কল্যাণী। ন্যাকা, propose কর্‌বে ত?

মুনি। Propose? আর তুমি যদি dispose ক'রে দাও?—

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আচ্ছা আগে কর-ই ত, তার পর দেখা যাবে।—

মুনি। Dispose কর্‌বে না ত?

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—তা যদি ব'লেই দেবো তাহ'লে তোমার propose করার ত দরকারই নেই? আংটিটা এনেছ?

মুনি তাহার জামার ভিতর হইতে ছোট একটি বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীর হাতে দিল। কল্যাণী আংটি বাহির করিয়া মুনির হাতে দিয়া বলিল—আমার পায়ের কাছে ব'সে হাত জোড় ক'রে propose কর—

মুনি। কি বল্‌তে হয়?

কল্যাণী। আচ্ছা এক আনাড়ীর পাল্লায় পড়েছি বাবা! জান না কিছু?

মুনি। বা! কি ক'রে জান্‌ব? আমি কি কখনও propose করেছি নাকি?

কল্যাণী একটু ভাবিয়া বলিল—তাও ত বটে! আচ্ছা আমার ওটা শোনা আছে, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—কেমন?—

মুনি খুশী হইয়া কল্যাণীর পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া propose করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কল্যাণী বলিল—বল, আমি, তুমি কি—তুমি কি আমাকে—আমাকে তুমি কি তোমার—বল্‌ছ না যে?

মুনি। তুমি অমন সুন্দর ক'রে বল্‌ছিলে—তাই আর interrupt করি নি।

কল্যাণী। বটে? ভাগো, disposed—

মুনি ভীতভাবে বলিল—এই মজালে!—না কল্যাণী, রাগ কোর' না, তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না, ভয়ানক কষ্ট হবে। এম্‌নিতেই বেশীক্ষণ না দেখ্‌লে অস্থির হ'য়ে উঠি, তুমি জান না—

কল্যাণী। আচ্ছা তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম। ওতেই propose করার কাজ হয়েছে।

মুনি। হয়েছে? তাহ'লে আংটিটা পরিয়ে দিই?

কল্যাণী। তোমার মা-বাবার মত নিয়েছ?

মুনি মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল! মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে মত লয় নাই।

কল্যাণী। তাহ'লে ত হ'তে পারে না।

মুনি। বাঃ, কিন্তু হ'তেই হবে যে!

কল্যাণী। তাঁদের না জানিয়ে কি ক'রে হবে? তুমি তাঁদের বল।

মুনি। ও বাবা!

কল্যাণী। কেন?

মুনি। বা! আমি বিয়ে করতে চাই, এ কথা কি ক'রে বল্‌ব? তা ছাড়া চারু বাঁদ্‌রীটা এমনিতেই যা করে, এ কথা শুন্‌লে ত আমার মাথা পাগল ক'রে ছেড়ে দেবে—

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—তা হ'লে আমিই গিয়ে তাঁদের বলি যে, আপনার গুণধর ছেলে, আমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে আমাকে তাঁর বৈধ-পত্নীরূপে সম্প্রদান করতে এসেছি—

মুনি। ধ্যেৎ!

কল্যাণী। যাই হোক্‌ এত দিনে আমার একটা কাজে তোমার অসম্মতি দেখে মনে হচ্ছে—পতিদেবতার আবির্ভাবের সূত্রপাত তোমার মধ্যে আরম্ভ হয়েছে।

মুনি কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ জগৎটা দুঃখ অশান্তি দিয়ে ভরা তা স্বীকার করি, কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের জীবন কি এমনি সহজ সুন্দর সরলতার ভিতর দিয়ে কেটে যেতে পারে না কল্যাণী? এতখানি সুখ আশা করা অন্যায় তা মানি কিন্তু তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাক আমার বুকটা যে কি খুশীতে ছাপিয়ে ওঠে কি বল্‌ব।—

কল্যাণী উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মুনির চেয়ারের 'আর্‌মে' বসিতেই মুনি তাহার গালে হাত দিয়া মুখখানি আপনার মুখের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া মুগ্ধভাবে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ডাকিল—কল্যাণী—

কল্যাণী সহসা উঠিয়া মুনির নাকে আঙ্গুল দিয়া আঘাত করিয়া বলিল—এই খবরদার, অমন আদর ক'রে এমন কথা ব'ল না, ভয়ানক লোভ লাগে—

মুনি হাসিয়া বলিল—তবে কখন বল্‌ব?

কল্যাণী। আগে তোমার মা-বাবাকে হাত করি, তার পর।

মুনি। কি ক'রে শুনি?

কল্যাণী। ভাব্‌ছি, একদিন রিলিফ ফণ্ডের চাঁদা আদায় করতে বেরুব। বাড়ীতে থেক, কিন্তু খবরদার সাম্‌নে এসো না, আমায় চিন্‌তেও পেরো না, বুঝেছ? Next Wednesday, কি বল?—

মুনি হাসিয়া বলিল—রাজী।

নীচে নামিয়া আসিয়া কল্যাণী মুনিকে বলিল—তুমি ওদের কাছে যাও আমি একবার রান্নাঘরে গিয়ে ও দুটোকে দেখে আসি—শান্তাটা যে হাঁদা, হয় ত কেবল খুন্তি নেড়েই সময় কাটিয়েছে—যেন ওদের রাঁধাবার জন্যেই ডেকেছি!

মুনি। আর যদি কিছু হ'য়ে গিয়ে থাকে?

কল্যাণী। আজ আমাদের engagement-এর semi-final হ'ল ত? final-এর দিন তাহলে তোমায় একটা জিনিস দেবো।

মুনি। আজ হয় না?

কল্যাণী। এর বেলায় ছেলের বুদ্ধি টনটনে আছে দেখছি! Kiss me if you can—

কল্যাণী ছুটিয়া একেবারে রান্নাঘরে গিয়া হাজির হইল এবং নিবিষ্ট মনে দুজনকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ঠিক তাই!

শান্তা। তোকে ভূতে পেল নাকি? কি ঠিক?—

কল্যাণী। যা বলেছি।—আচ্ছা সুপ্রকাশবাবু, আপনি কি ভাবেন, এই সব রাঁধ্‌বার জন্যেই আপনাকে এখানে এনেছি?

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—তা একবারও ভাবি নি।

কল্যাণী। আপনি জানেন কেন এখানে আপনাকে এনেছি?—

সুপ্রকাশ। হাঁ। কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে সে কৃতজ্ঞতা আমার প্রকাশ কর্‌তে চাই না।

কল্যাণী শান্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই হাস্‌ছিস্ না যে?

শান্তা। কাল হাস্‌ব।

কল্যাণী। আর আজ কি কর্‌বি?

শান্তা। আজ এই রান্নাগুলো যাতে বেশ ভাল হয় তার চেষ্টা কর্‌ব।

কল্যাণী বলিল—তুই মর্। আহা অমন্ জান্‌লে বয়কে আমি ছেড়ে দিতাম না। যা বেরো—আমি এই চপ্‌গুলো ভাজি। তুই একটু বাইরে গিয়ে বোস্।

কল্যাণীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বাইরেটা যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া জটলা পাকাইল।

সুপ্রকাশের কাছে আসিয়া জীবন বলিল—আঃ তোফা গন্ধ বেরিয়েছে রে! প্রকাশ, আমার বিরহ যে উথ্‌লে উঠ্‌ল ভাই!—কখন্ খাওয়া হবে?—

জীবনের কথায় কল্যাণীর প্রথম মনে হইল যে, মা বাড়ী থাকিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই চা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে বলিল—এই শান্তা, এখন রান্না রাখ্, ঐ কেট্‌লিটায় জল চাপিয়ে দে, চল্ চা খাওয়া যাক্ আগে—সুপ্রকাশবাবু, ছাড়ুন খুন্তি বেড়ি—

কল্যাণী সকলকে টানিয়া খাইবার ঘরে আনিয়া জড়ো করিল।

সন্ধ্যার পর প্রবোধ এবং মনীষার সহিত বীরেন্দ্র করুণা সুবর্ণ নগেন্দ্র প্রভৃতি সকলে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া

গেলেন। রাত্রি বারোটা বাজিল না, তরকারী পুড়িল না, কাহারও হাতে একটা ফোস্কার চিহ্ন নাই! সজ্জিত টেবিলের দিকে তাকাইয়া নগেন্দ্র বলিলেন—ডিনার-টাইমে চড়িভাতি! ব্যাপারটার কিছু নূতনত্ব আছে।

করুণা বলিলেন—এ কি সব একজনের রান্না?

কল্যাণী। না, দুজনের।

খাওয়া আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রবোধ বলিয়া উঠিলেন—A walking stick to fish and a brooch to meat.—

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—বাঃ চমৎকার হ'ল! শান্তা লাঠি হাতে ক'রে ঘুরে বেড়াবে আর সুপ্রকাশবাবু তাঁর পাঞ্জাবীতে ব্রোচ্ আটকে—

প্রবোধ। যাই হোক, ওদের ইচ্ছে হ'লে ওরা ওদুটো অদল-বদল ক'রে নিতে পারে—কি শান্তা, রাজী?

শান্তা। সত্যি এত ভাল রান্না হয়েছে?—

উমা। আহা নেকি! মুখে দিয়ে দেখ্না—বেড়ে ঝাল্ ঝাল্ হয়েছে! না রে কম্লি?—

কমলার চোখের দৃষ্টি কিছু ক্ষীণ কিন্তু তাহার সুন্দর চোখদুটির শোভা নষ্ট হইবার ভয়ে কোন দিন চশমা ব্যবহার করে না। সে একাগ্রমনে কাঁটা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—রাজ্যির কাঁটা যেন এই কইমাছগুলোতে এসে জু[illegible]২! কেন রে বাপু, তোরা যদি চিংড়ির মত নিষ্কণ্টকী হতিস্, কি ক্ষতি হ'ত?—

নগেন্দ্র প্রকাণ্ড একজোড়া ডিম বাহির করিয়া সজল চক্ষে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—There lies the mystery কমল, there lies the mystery,—জীবনবাবু—

নগেন্দ্রের কথা শেষ হইলে একটি ভরাট মুখের অস্পষ্ট শব্দ হইল—ওলুন্—'

নগেন্দ্র। নাঃ এমন কিছুই নয়, এমন সুসময়ে আপনি আমার পাশে আছেন জেনে বড় তৃপ্তি পেলাম।—শ্রীশ তোমার কি 'প্যাসিভ্ রিজিস্‌টান্স' চলেছে নাকি ?

শ্রীশ সংক্ষেপে উত্তর দিল—আমার এখন মর্‌বার সময়ও নেই।

নগেন্দ্র। বেশ বেশ—ওহে বিকাশ—বিমলবাবু, আছ ত সবাই ?—

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন—এগুলিকে তোমার চেলা ক'রে নিয়েছ নাকি ?

নগেন্দ্র। জলেই জল বাঁধে। ওরা সকলে নিজগুণেই ধন্য হ'য়ে উঠেছেন, আমাকে আর বিশেষ কিছু কর্‌তে হয় না।—ডাক্তার-সাহেব, ছোড়্দি আর ওর-নাম কি, যে যেখানে আছ সবাইকেই স্মরণ কর্‌ছি, আমার পাত্ বুঝি খালি হ'য়ে গেল !—

কল্যাণী। তু'লে নাও না, সাম্‌নেই ত রয়েছে সব।

নগেন্দ্র। আবার তু'লে নিতে হবে ?

টেবিলের উপরে যখন এইভাবে হাসি কোলাহল চলিতেছে, টেবিলের নীচেও তখন একটি বড় চমৎকার মূক অভিনয় হইয়া যাইতেছিল। কল্যাণী এবং মুনির পাদুটি পরস্পরের সঙ্গে কখনও জড়াইয়া কখনও চাপিয়া কখনও ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া কত কি ভাব যে ব্যক্ত করিতেছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হঠাৎ এক সময়ে কল্যাণী আপনার পা সরাইয়া লইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে খুঁজিতে খুঁজিতে যাহাকে ধরিয়া মুনি আবেগের সঙ্গে চাপ্ দিল, তাহা ঠিক কল্যাণীর বলিয়া মনে হইল না ! এবং সঙ্গে সঙ্গেই নগেন্দ্রনাথ

বলিয়া উঠিলেন—ওটা আমার মুনিবাবু, কল্যাণীরটা আর একটু বাঁ-দিকে। তাহার পর নির্ব্বিকারভাবে খাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মুনি রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বিষম খাইল।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'ল গো ?—

নগেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন—ও আমাদের jurisdiction-এর বাইরে।

স্বর্ণ সমস্তক্ষণই মায়াকে দেখিতেছিলেন, তাহার হাব-ভাব তাঁহার কাছে যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল—এত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত তাহাকে বড় একটা দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সে বিমলের দিকে তাকাইতেছে। বিমল কোন দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাইয়া চলিয়াছে। খাওয়াটা তাহার কাছে যেন শাস্তি বলিয়া মনে হইতেছে।

বিমল এবং মায়াকে দেখিতে দেখিতে স্বর্ণের মনে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বিমল বলিল—বড়মাসী, আমার এই ডিস্‌টাতে কিছু স্যালাড্ দিন্ না—এমন সুন্দর রান্না হয়েছে, কিন্তু খেতে পার্‌ছি না, ভাল ক্ষিধে হয় না।

স্বর্ণের মন হাল্কা হইয়া গেল। বলিলেন—ক্ষিধে অপরাধ ? রাতদিন অমন ক'রে খাট্‌লে শরীর থাকে ?—আমি না হয় তোমার পর, কিন্তু করুণার কাছে ত আজ চার বছর সমানে আছ, ওর কথাও কি শুন্‌তে নেই ?—তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে ও পাগল হ'য়ে থাকে, আর ছেলে তুমি সময়ের ওজর দেখাও ?

সুপ্রকাশ। কাল অনেক বার আপনাকে তুমি বলেছি, নাম ধ'রেও ডেকেছি কিন্তু পরে বড় অনুতাপ হয়েছে, আজ আমার কথা শেষ হ'লে যদি অনুমতি দেন তাহ'লে আবার শান্তা ব'লে ডাকব—কেমন?

শান্তা সুপ্রকাশকে তাহার ঘরে আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া বলিল—বল তোমার কথা।

সুপ্রকাশ। কিন্তু আলো জ্বাল্‌লেন না যে?

শান্তা। বিশেষ দরকার আছে কি?

সুপ্রকাশ। আছে।

শান্তা। কি?

সুপ্রকাশ। আমি আমার কথা বল্‌তে বল্‌তে আপনার মুখের দিকে তাকাব। আপনি আমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মুখের দিকে তাকাবেন। তাই আলোর দরকার আছে শান্তা দেবী!

শান্তা নিঃশব্দে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া পুনরায় সুপ্রকাশের পাশে বসিয়া বলিল—বলুন—

সুপ্রকাশ। আর একটি অনুরোধ শান্তা দেবী, আপনি দয়া ক'রে আমার কাছ থেকে কিছু দূরে বসুন। জানেন ত মানুষের দুর্ব্বলতার শেষ নেই, হয় ত আমার কথা সব না ব'লেই আপনার হাতখানা ধ'রে ওর মধ্যে আশ্রয় খুঁজ্‌ব।

শান্তা তাহার চেয়ার সরাইয়া লইয়া কিছু দূরে গিয়া বসিল।

সুপ্রকাশ শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এমন ক'রে কারো সাম্‌নে ব'সে আমার কথা বল্‌তে হবে তা ভাবি নি কোন দিন—শোন্‌বার মত, শোনাবার মত কোন মানুষ এ-জগতে আছে তাও বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি। আমি আপনার বেশী সময় নেবো না। কিন্তু এসব কথা

বলা এত শক্ত, কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ কর্‌লে নিজেকে ঠিক ক'রে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ব তা জানি না, তবুও আমি আরম্ভ কর্‌ছি। আমার এই কথার ভিতর দিয়ে নির্লজ্জতা আর অভদ্রতা, সীমা ছাড়িয়ে যাবে। শুধু আমার হাসি নয়, আমার মলিনতাও দেখ্‌তে হবে তোমাকে, নইলে তোমার করুণা, তোমার সহানুভূতি আমার সহ্য হবে না।

সুপ্রকাশ একবার তাহার কপালে হাত বুলাইয়া লইয়া বলিল—আমার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কয়েক বছর পূর্ব্বে থেকে একটা সত্য বড় বেশী ক'রে আমার সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল—আমি সাধারণত বিবাহিত মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয়! . . .

—'প্রিয়' বল্‌লে হয় ত তাদের প্রতি অবিচার করা হয় তবু ওটা'ই, আমি বল্‌ছি। একটির পর একটি কি ক'রে যে আমার জীবনে এসে দেখা দিয়েছে তা আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, কারণ জানি না।

—তাদের সব চেয়ে বেশী ক'রে অনুভব করেছি তখনই, যখন তারা আবার ধীরে ধীরে আমার জীবনের পথ হ'তে দূরে সরে গেছে। তাদের আসা-যাওয়া আমার কাছে আজও প্রহেলিকাময় লাগে কিন্তু তাদের বিচার কর্‌বার ইচ্ছা কোন দিন আমার হয় নি, তাদের কথা, তাদের মুখ, আমার মনে আজও বেশ স্পষ্ট হ'য়ে আছে, কিছু ভুলি নি,—হয় ত তা সম্ভবও হবে না।

—তাদেরই মধ্যে একজনের কাছে আমার হার হ'ল. সে আমায় জয় কর্‌ল, রূপ দিয়ে নয়, চোখের জলে।

—মানুষ অমন ক'রে কাঁদ্‌তে পারে, আমারই জন্যে? এই কথাটা নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমার কেটে গেল। আর তারই সঙ্গে আমার মধ্যেকার প্রবল আমিত্বটুকুর একেবারে সমাপ্তি হ'য়ে গেল! . . .

—এই সমাপ্তির কথাটা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, ওটা অনুভব কর্‌বার, বোঝাবার বা বল্‌বার নয়।

—যেদিন জাগ্‌লাম, সেদিন বুকে আমার দারুণ তৃষ্ণা, চোখে আমার নেশার ঘোর, বিশ্বজগৎ আর যা-কিছু সব আমার মন থেকে মিলিয়ে গেছে . . .

—তাকে বল্‌লাম—এবার কি কর্‌বে ?

—সে বল্‌ল—ভাব্‌ছি।

—আমি বল্‌লাম—ভাব্‌বার সময় নেই।—চ'লে এস।

—সে বলল্—তাও কি হয় ? আমি যে চার দিক দিয়ে বাঁধা ! ও ছেঁড়্‌বার আমার শক্তি নেই।

—তবে এলে কেন ?—

—তোমাকে পাব ব'লে।

—আমাকে অপমান কর্‌বে ব'লে।

—না।

—হয়েছে পাওয়া ?

—হয়েছে। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা রাখ্‌বার ঠাঁই আমার বুকে নেই।

—আমার বুকে একটা ক্ষুধিত মানুষ পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—যে ভালবাসাকে পাবার জন্যে তোমার স্বামী, সমাজ, সন্তানকেও অস্বীকার কর্‌লে, সেই ভালবাসাকেই অপমান ক'রে চ'লে যাবে ?—

—সে কোন উত্তর দিল না।

—আমি বল্‌লাম—'বন্ধু' ব'লে আমার বুকে চোখের জল ফেল্‌লে। 'বর' ব'লে আমার সেবা কর্‌লে। 'দেবতা' ব'লে আমার পূজা কর্‌লে, একথা এত সহজ ভুলে যাবে ?

—কোন উত্তর পেলাম না।

—তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। শান্তা দেবী, এই আমি—এই আমার জীবন।

সুপ্রকাশ হঠাৎ থামিয়া গিয়া দেখিল শান্তা চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে! তাহার মুখে যেন জীবনের কোন চিহ্নই নাই!

একটা দারুণ লজ্জা সুপ্রকাশের বুকে চাপিয়া বসিল। তাহার মনে হইল ঘৃণায় লজ্জায় শান্তা যেন ঐরূপ হইয়া গিয়াছে! সে শিহরিয়া উঠিল; তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, অতি সন্তর্পণে উঠিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে যাইয়া সিঁড়ি দিয়া পথে নামিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সুপ্রকাশের কথা শুনিতে শুনিতে শান্তা কিসের আবেশে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।—তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিতেই, সে সাম্‌নের দিকে হাত বাড়াইয়া ডাকিল—প্রকাশ—

সহসা চোখ মেলিয়া ঘরে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে যেন কেমন হইয়া গেল! ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত ঘরের আলো জ্বালিয়া সুপ্রকাশকে খুঁজিল; পথে নামিয়া আসিয়া যত দূর দৃষ্টি চলে দেখিতে চেষ্টা করিল, শেষে ফিরিয়া আসিয়া সুপ্রকাশের পরিত্যক্ত চেয়ারে তাহার চাদরখানি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মা, বৌ-দিদি এবং দাদা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শান্তা তাহার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া আছে।

বৌ-দিদি জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল? এমন ক'রে তুই শুয়ে যে?

শান্তা বলিল—আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তুই এখন আর আমায় জ্বালাস্‌ নি, তোরা খেয়ে নে, আমি খাব না।

* * * *

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ভোরের দিকে সুপ্রকাশ আলো জ্বালিয়া চিঠি লিখিতে বসিল, অনেকগুলি লিখিল। সবগুলি খামে বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিয়া টিকিট মারিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; সকালে ডাকে দিবে। তাহার পর বিছানায় আসিয়া শুইতেই তন্দ্রায় তাহার চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিল।

সে যখন জাগিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চাকরকে ডাকিয়া তাহার চা তৈয়ারী করিতে বলিয়া স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া একটি চামড়ার ট্রাঙ্কে তাহার কাপড়-জামা গুছাইয়া লইতে লাগিল।

সে যখন এই সমস্ত ব্যাপারে ব্যস্ত তখন একজন মানুষ যে কখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই!

অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল—প্রকাশ—

সুপ্রকাশ হাতের কাজ ফেলিয়া ফিরিতেই শান্তাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল! বলিল—আপনি, এত সকালে?—

শান্তা সুপ্রকাশকে দুই হাতে জড়াইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—কাল অমন ক'রে আমায় ফেলে এলে কেন? . . .

কান্নায় তাহার কথা বন্ধ হইয়া আসিল!

সুপ্রকাশ কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে শান্তার মুখটিকে ধরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া শান্তার মুখের উপর পড়িতেছিল।

—২৭—

শুনিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকারের যান, অর্থাৎ গাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে, রকম-ফেরে মদ্রদেশই প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু বঙ্গদেশে, বিশেষত কলিকাতা করপোরেশনের উদ্ভাবিত III চিহ্নিত যানগুলির গুণাবলীর তুলনা নাই। মানুষের লেখনীর সাহায্যে ইহার বর্ণনা সম্ভবপর নয়। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, বেদব্যাস, বাল্মীকিও এরূপ যানের কল্পনা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ! দৈর্ঘ্যে ইহা চারি ফুট, প্রস্থে তিন ফুট, এবং ইহার বাহনদ্বয়ের সৃষ্টি যে ইহারই ফরমায়েস্ অনুসারে হইয়াছিল তাহাও বেশ ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর ইহার সারথি? তাহার কথা আর কি বলিব! জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণও যাহা করিতে সাহস করিবে না, ইহারা তাহা অনায়াসে করিতে পারে। বাবা মা এবং তাঁহাদের বড় মাঝারি বেঁটে ছোট কচি প্রভৃতি সর্ব্ব আকারের ছয় সাতটি সন্তানকে লইয়া সি, এস্, পি, সি, এ-র পেয়াদার চোখে ধূলি দিয়া ইহারা গঙ্গাস্নান বা তীর্থস্থান হইতে অনায়াসে ফিরাইয়া লইয়া আসে।

জনশ্রুতি,—ইহাতে আরোহণ করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক অসুস্থতা চলিয়া যায় এবং ইহাতে চড়িয়া খোয়া-বিছানো পথে তিন দিন তিন মাইল করিয়া বেড়াইলে বাতও নাকি সারিয়া যায়। ইহাতে নববিবাহিত-দম্পতী ঝিল্‌মিলি বন্ধ করিয়া তারস্বরে প্রেমালাপ করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। ইহার

লৌহনির্ম্মিত চক্রগুলি বেরসিক পথিকের কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া, সুখসুপ্ত মুদী ও গৃহস্থের বক্ষের স্পন্দন বা প্যাল্‌পিটেশন বাড়াইয়া তুল্‌কিতালে ঝড়্‌র্ ঝড়্‌র্ করিতে করিতে যখন অগ্রসর হয়, তখন মনে হয় যেন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরপুরীর ভিতর দিয়া চলিয়াছি!

এই শ্রেণীর এক রথে চড়িয়া জুন মাসের এক দারুণ মধ্যাহ্নে দুলিতে দুলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে যে মানুষটি চলিতেছিল, অশ্বিনী-নন্দনদ্বয়ের হঠাৎ মতি এবং গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটা হেঁচ্‌কা দোলন্ খাইয়া কিছুক্ষণ বিমোহিতভাবে তাকাইয়া থাকিবার পর সে বুঝিতে পারিল, রথ আর চলিতেছে না! সারথির হেট্-হেট্ টি-টি প্রভৃতি বহু শ্রুতিমধুর কথা এবং উপর্য্যুপরি চাবুকের আঘাতের বিরুদ্ধে তাহারা প্যাসিভ্ রিজিস্‌টান্স, এবং নন্‌ভায়লেণ্ট নন্-কো-অপারেশন প্রচার করিয়াছে!

সারথির সহকারী আট দশ বছরের একটি বালক তাহার সহস্র ছিদ্র এবং তালিযুক্ত পাজামা হাঁটু পর্য্যন্ত গুটাইয়া রথের পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল। সারথি হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চাক্কা মার্ বে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বালক লাফাইয়া পড়িয়া পিছনের চাকা দুই হাতে ধরিয়া ঠেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্বিনী-নন্দনদ্বয় একবার কি যেন কানাকানি করিয়া লইল, তাহার পর নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে পিছনের একটি পা ঈষৎ ছোট করিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিল।

সারথি পুনরায় হাঁকিল—উস্‌সে নেহি হোগা, রস্‌সি লে'কে টেংরিমে বাঁধ্‌কে খিঁচ্—

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সোয়ারী পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিল—এত শব্দ এত ঝাঁকানি সত্ত্বেও এলিসন রোডের সীমানা সে অতিক্রম করিতে পারে নাই!

পথে ভিড় জমিয়া গেল। স্কুল-পালান ছেলেরও অভাব ছিল না। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল—এমন লজ্‌ঝোড়্‌ গাড়ী, ঘোড়া, সইশ, কোচ্‌ম্যান্‌ কোথাও দেখেছিস্‌?

একজন বলিল—মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে কর্‌ছে।

আর একজন বলিল—কিন্তু সোয়ারীটি খাসা—দেখ্‌ মাইরি!

একটা অত্যন্ত ময়লা, তেল এবং সহস্র দাগে ভরা মট্‌কার চাদর ও পাঞ্জাবী পরিহিত পাকান-চুল হঠাৎকবি-গোছের এক ছোক্‌রা ঢুলু-ঢুলু চোখে গাড়ীর জানালার দিকে তাকাইয়া poetry বাঁধিতে সুরু করিয়াছিল—

জাফ্‌রাণে রঙ্গিন
ওড়নার আড়ালে
মনচোরা চোখ দুটি
স্বপ্ন যে ছড়ালে!
কজ্জলে আঁকা যেন
বাঁকা তোর চাহনি
প্রাণে আনে কি বেদনা
জানি না কি দাহনি!

ইয়ার ছোক্‌রাদের কথা এই সময় তাহার কানে আসিয়া ত[illegible] মিলের ভাঁড়ার ঘুলাইয়া দিল এবং তাহার প্রাণে একটা পুরুষত্বে[illegible] প্রচণ্ড অভিমান আসিয়া উঁকি দিল। গাড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া ঢুলুঢুলু চোখ দুটি বেশ সুগোল করিয়া ছোক্‌রাবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কি বলিল, কিন্তু কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। বিপরীত

দিক্ হইতে একটি মটর গাড়ী আসিতে আসিতে থামিয়া গিয়া হর্ণ্ বাজাইল।

শব্দ শুনিতেই মাথা তুলিয়া ভাড়াটিয়া-গাড়ীর সোয়ারী আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে কম্‌লি!—help—help—

কমলার ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কল্যাণী নামিয়া কমলার পাশে বসিয়া বলিল—মরেছিলাম আর কি, আর একটু হ'লেই, উঃ!

সোয়ারী ভাগিতেছে দেখিয়া সারথিপুঙ্গব চীৎকার করিয়া উঠিল—ই-কা, মেম্ সাব্! আপ্ কেড়ায়া কিয়া—

কল্যাণী মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—ডরো মৎ, পুরা দেগা, বক্‌শিস্ ভি।

সে একটি টাকা বাহির করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—চল—খালপার্ রোড্। সাত নম্বরে যাব।

গাড়ী মুখ ঘুরাইয়া লইয়া ছুটিতে লাগিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?—

কল্যাণী বলিল—শাশুড়ী ভোলাতে যাচ্ছি, ঐ গাড়ীতে ক'রে যেতে পার্‌লেই ভাল ছিল, তা আর কি কর্‌ব? তুই মোড়ে গাড়ীটা রাখিস্, আমি ঐ টুকু হেঁটে যাব।

কমলা। ধন্যি মেয়ে! সাহসকেও বলিহারি!

যথাস্থানে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই কমলা বলিল—কোন্ বাড়ীটা তা কি ক'রে বুঝ্‌বি?—

কল্যাণী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া আপনার মনে বিড়-বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—যেতে ডান্ দিক্‌কার ফুটপাথের ওপর হল্‌দে রং-এর প্রথম তিনতলা বাড়ী, তার পশ্চিম দিকের একটা জান্‌লায়

সবুজ রং-এর পর্দ্দা ঝুলানো থাকবে—আরে ঐ ত মুর্ত্তিমান্ ব্যোম্ স্বয়ং পর্দ্দা সরিয়ে দেখ্ছেন?—আচ্ছা তুই বোস্, আমি কাজটা সেরে আসি।

কমলা হাসিয়া বলিল—মর্—

কল্যাণী গাড়ী হইতে নামিয়া রৌদ্রতপ্ত পথ দিয়া কোন মতে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া পড়িল। দরওয়ানজী তখন দেওয়ালে হেলান দিয়া তাহার দিবানিদ্রাটুকু সারিয়া লইতেছিল। কল্যাণী তাহাকে অতিক্রম করিয়া হলে ঢুকিতেই যাঁহার সহিত তাহার চোখোচোখি হইল, তাঁহার বর্ণনা সে মুনির নিকট বহুবার শুনিয়াছে। ছোট একটি নমস্কার করিয়া হাতের খাতাটিকে নাড়িতে নাড়িতে মিঠা গলায় বলিল—আমি আপনার কাছে এসেছি—

হাতের খবরের কাগজটি নামাইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া সন্তোষ-কুমার বলিলেন—আমার কাছে? কিন্তু এই রোদে না-এসে আমায় ডেকে পাঠালেই ত পার্তে মা—অন্তত অন্য সময়ে—এই গরমে কেউ বাড়ী থেকে বেরোয়?—ব'স এই পাখাটার নীচে।

কল্যাণী পরম স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষগণের হাসি হাসিয়া বলিল—না, আমাদের রোদের ভয় কর্লে চলে না, তাছাড়া বেশী সময়ও নেই, আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে—

সন্তোষ। তোমার কি দরকার বল—কিন্তু তোমায় ত চিনতে পার্লাম না মা?—

কল্যাণী। আমি ভিক্ষেয় বেরিয়েছি। এবারকার বন্যার জন্যে কিছু টাকা তুলে দেবার আমি ভার নিয়েছি—

সন্তোষ হাসিয়া বলিলেন—স্বয়ং অন্নপূর্ণা ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন! একটু ব'স মা, আমি এঁদের ডেকে দিচ্ছি।

সন্তোষকুমার ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চারুও আসিয়া হাজির হইল। মুনির মাতা সুকুমারী, কল্যাণীকে স্নেহের তিরস্কার সুরু করিয়া দিলেন—আচ্ছা দস্যি মেয়ে ত তুমি! আর তোমার মা-ই বা কেমন পাষাণী, তোমায় ছেড়ে দিয়েছে?—

কল্যাণী সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—একটু জল দিন্ না মা, ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।

সুকুমারীর চক্ষু ভরিয়া জল উছলিয়া উঠিল, বলিলেন—আহা বাছারে! ব'স মা ব'স।—এই চারু, যা ত মা চট্ ক'রে কিছু ফল ছাড়িয়ে নিয়ে আয় ত, মিষ্টিও বোধ হয় কিছু আছে, যা ছুটে—ওকে দেখিস্ পরে।

চারুর হাত ধরিয়া কল্যাণী বলিল—না মা, থাক্, শুধু জল হ'লেই হবে, এখন কিছু খেতে পার্‌ব না।

চারু বলিল—ঘোলের সরবৎ আছে, আন্‌ব?—

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—মন্দ কি?—

চারু ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকাণ্ড একটি সাদা পাথরের গ্লাসে করিয়া সরবৎ আনিয়া কল্যাণীর হাতে দিল।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—দুপুর বেলা বাড়ী চড়াও হ'য়ে আপনাদের—

সুকুমারী। আচ্ছা, পরে কথা ক'য়ো, আগে ওটুকু খেয়ে ফেল ত? মুখখানা রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে গো!

কল্যাণী ধীরে ধীরে সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ঠোঁট চাটিয়া বলিল—চমৎকার হয়েছে। পেটে আর জায়গা নেই, নইলে আর এক গ্লাস খেতাম—একটু জল দাও না ভাই, গ্লাসটা ধুয়ে দিই।

সুকুমারী অবাক্ হইয়া বলিলেন—তুমি ধোবে ? কেন ?—

কল্যাণী অপরাধীর মত বলিল—আমি—আমরা ব্রাহ্ম ; আমাদের ছোঁয়া—

কল্যাণীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সুকুমারী গ্লাস্‌টি নিজের হাতে কাড়িয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—হ'ল আমার মাথা খাওয়া ! ব্রাহ্ম ? আর আমিই বা কোন্ ভট্‌চাজ্জি বামুনের বৌ ?—আমার কাছে আর আচার বিচারের কথা ক'স্ নি মা। আমার একটা ছেলে আছে, সেটা মুচিরও বেহদ্দ ! আর এই মেয়েটা ত ডোম্‌নী—

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—তা হোক্ গে, কিন্তু আমার কাজের কি কর্‌লেন মা ?

সুকুমারী। কাজ ?—কি কাজ ?

কল্যাণী। আমি যে ভিক্ষেয় বেরিয়েছি, বন্যাপীড়িত লোকদের জন্যে—

সুকুমারী। ও, তাই বুঝি বুড়ো তোমাকে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সরে পড়্‌ল ?—

এই সময়ে সন্তোষবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয় ; মুনিটাকে বল্‌তে গিয়েছিলাম, ওর গেল মাসের মাইনের সমস্ত টাকা ত রয়েছে, সেটা যদি এঁকে দেয়,—তা তোমার ছেলে যা চামার হচ্ছে দিন দিন, বল্‌ল—'ওটা এখন আপনিই দিয়ে দিন আমি পরে meet কর্‌ব—' meet যা কর্‌বে তা আমি জানি। এই নাও মা, গরীবের ছেলের সাধ্যে উপস্থিত যেটুকু কুলাল—বলিতে বলিতে দস্তখত-করা একখানি চেক্ কল্যাণীর হাতে দিলেন।

এই স্বভাব-সুন্দর প্রৌঢ়ের হাস্যোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাইয়া কল্যাণীর মন লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল—ছি ছি, এমন চমৎকার

মানুষগুলির সহিত সে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে!—কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—আপনার নামটা তাহ'লে আমার এই খাতায় লিখে তার পাশে ঐ টাকাটা জমা ক'রে দিন্!

সন্তোষ। ঐটি পারব না মা, আর তুমিও আমার নাম প্রকাশ ক'র না।

কল্যাণী। কিন্তু আমি টাকাটা যে আপনার কাছ থেকে নিলাম, তার—

সন্তোষকুমার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কল্যাণী লজ্জিত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—তাহ'লে আমি আসি?—

চারু বলিল—বাঃ, যেই কাজ ফুরালো অমনি আসি!—কখ্খন ছাড়্ছি না এখন তোমাকে—ওপরে চল—আমার ঘরে—

কল্যাণী। তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমার জন্য একজন রোদ্দুরে চিংড়ি-পোড়া হচ্ছে, তাই যা একটু তাড়া—

সুকুমারী। একটু ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে যা মা, বেচারীর একটিও সঙ্গী নেই। এখানে আমরা নতুন এসেছি, ও বিশেষ কাকেও চেনে না।

কল্যাণী আর আপত্তি করিতে পারিল না। চারুর সহিত তাহার ঘরে আসিতেই সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কে ভাই তুমি? কি মিষ্টি তোমায় দেখ্তে ভাই!

ইহার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনে দুজনের প্রেমে পড়িয়া গেল। এবং তাহাদের চুম্বনের শব্দ পাশেরই একটি ঘরে এক ক্ষিপ্তপ্রায় মানুষের বুকে মর্ম্মন্তুদ বেদনার সঞ্চার করিল। যেদিক হইতে কল্যাণী

এবং চারুর মিশ্রিত কলহাস্য-ধ্বনি আসিতেছিল সেইদিকে ফিরিয়া মরণাহতের স্বরে বলিতে লাগিল :—

O Love, Love, Love! O withering might!
O Sun, that from thy noonday height,
Shudderest when I strain my sight
Throbbing *thro' all thy heat and light.*
... *I whirl like leaves in* roaring wind!

ভীত ভাবে কল্যাণী চারুর হাত ধরিয়া বলিল—ভাই ওকি ?—তোমাদের বাড়ীতে কেউ পাগল-টাগল আছে নাকি ?

চারু হাসিয়া বলিল—না-না, ও দাদা, কবিত্ব করছে।

কল্যাণী। ওমা, তোমার ভাই ও ঘরে রয়েছেন! ছি ছি আর আমি এখানে চেঁচাচ্ছি!—আমি যাই—

চারু। আবার কবে আসবে ভাই ?

কল্যাণী। ভিক্ষে করতে কি রোজ রোজ আসে মানুষ? না, এলে সবাই সহ্য করবে ?—

চারু। আচ্ছা না হয় এমনিই এলে একদিন, আসবে না ?—

কল্যাণী। নুন যখন খেয়েছি তখন আসতে হবে বৈকি।

চারু। যাও ভাই, তুমি বড় কটকটি, আচ্ছা এখন আমাকে তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও, আমি চিঠি লিখব।

কল্যাণী কি মনে করিয়া একটা কাগজে লিখিল—'কল্যাণী মজুমদার, ৭৩ নং শুরকিগঞ্জ ফার্ষ্ট বাই লেন'।

এই ভুল ঠিকানাটি সে যে কেন দিল তাহা বলিতে পারা কঠিন। ৭৩ নম্বরে শ্রীশের কারখানা। সেখানে কল্যাণীর বিশেষ যাতায়াতও যে আছে তাহাও নয়।

ঠিকানাটি চারুর হাতে দিতেই সে বড় বড় চোখ করিয়া তাই দেখিতে লাগিল। কোন গুপ্ত ব্যাপারের সন্ধান পাইলে গোয়েন্দাদের চোখে যেমন বিজয়ের আনন্দ উছলিয়া উঠে তাহার চোখ-মুখেও তেমনি একটি আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল।

কল্যাণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া এবং কতকটা সন্থ-ধৃর্ত অপরাধীর মত জোর-করা সহজ ভাব মুখে আনিয়া বলিল—কি হ'ল?—

চারু। তুমিই দাদুর ক্লায়েন্ট?—

কল্যাণী। দাদুর ক্লায়েন্ট!—মানে?—

চারু। মানে! বলে দেবো? দেখ্‌বি?—

কল্যাণী হঠাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া চারুর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—থাম্‌ পোড়ারমুখী, নইলে তোর আর মুখ দেখ্‌ব না কোন দিন—

চারু নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—সে ত পরে হবে, এখন ত ব'লে দিই গিয়ে সব্বাইকে—

কল্যাণী মিনতি করিয়া বলিল—শুধু আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দে ভাই—

চারু হাসিয়া সুর বদ্‌লাইয়া বলিল—এই, ওর সঙ্গে দেখা কর্‌বি?—

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—বা রে! কার সঙ্গে আবার দেখা কর্‌ব? আমি কাকেও চিনি না। তোমার দাদু যাদু—

চারু। ফের্‌?—দেখ্‌বি মজা? টাকা নিয়ে ভুল ঠিকানা দেওয়া হয়েছে—৭৩ নং আমি যেন জানি না?—

কল্যাণীর কান্না আসিল। এইটুকু একটা মেয়ের কাছে যে তাহার এমন করিয়া হার হইবে বা হইতে পারে তাহা সে কোন দিন

এবং শোই! চারুকে অল্প অল্প হাসিতে দেখিয়া সে নিরুপায় হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—আমি হার মান্‌ছি, আমাকে কোন মতে এ বাড়ীর বাইরে একবার যেতে দে—

চারু। প্রতিজ্ঞা কর্ আবার আস্‌বি?

কল্যাণী। আস্‌ব।

চারু। চট্‌পট্ দাদুকে বিয়ে কর্‌বি,—ওকে বেশী ভোগাবি না?—

কল্যাণী। তোর মা বাবা যদি আমাকে আজই নেন্, আজই রাজী।

চারু। ঠিক্?

কল্যাণী। হাঁ লো রায়বাঘিনী, হাঁ।

দুই জনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঘরখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিপুল শব্দে চুম্বন করিতে লাগিল। পাশের ঘরে ক্ষিপ্ত মানুষ বলিতেছে:—

My Rosalind, my Rosalind
My frolic falcon with bright eyes,
Stoops at all game that wing the skies,
Whither fly ye, what game spy ye?—

চারু কল্যাণীকে ঠেলিয়া বলিল—শুন্‌ছিস্?—কর্‌বি দেখা?

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—তোর অত মাথা ব্যথার দরকার নেই—দে একটা চুমু—

যথারীতি চুম্বনান্তে কল্যাণী ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে চারুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—এখন আসি ভাই, চার্‌টের মধ্যেই এক ভদ্রলোক

আস্‌বেন আমার কাছে, কাল্ বলে গেছেন, গরজটা আমারই, তাই তাড়াতাড়ি যাচ্ছি।—

পাশের ঘরে তখন আবৃত্তি চলিতেছিল—

She kissed him noisily like a child! It occurred to him that he did not deserve her trust . . . that he was unworthy—

কল্যাণী। না ভাই সত্যি তোমার দাদুর মাথা খারাপ হয়েছে! পালাই বাবা মানে মানে—

সন্তোষ এবং সুকুমারীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কল্যাণী বাহিরে আসিয়া দেখিল একটা ছোট বকুল গাছের তলায় গাড়ী রাখিয়া কমলা মাথায় কপালে বরফ ঘসিতে ঘসিতে সরলপুঁটির মত 'খাবি' খাইতেছে! কল্যাণী নিকটে আসিতেই সে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি না হয় অভিসারে বেরিয়েছ কিন্তু আমি বেচারী—

কমলার আরক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া অনুতপ্ত হইয়া কল্যাণী বলিল—বড় দেরী হ'য়ে গেছে ভাই, তা লাভও মন্দ হয় নি! এই দেখ চেক্—

কমলা আপনার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া বলিল—ও বাবা! এ যে অনেক টাকা? তারপর, কেমন দেখ্‌লি সব?—

কমলার রুমালের ভিতর হইতে এক টুক্‌রা বরফ লইয়া মুখে পুরিয়া চুষিতে চুষিতে কল্যাণী বলিল—যেমনটি চাই।—চারু মেয়েটা যে কি, তোকে দেখাব একদিন।

কমলা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—দেখিস্, এখনই এত?—

—২২—

সেদিন যে ভদ্রলোকের আসিবার কথা ছিল সে আসিলে কল্যাণী বলিল—দেখ, আমার আঙ্গুলটায় বড় ব্যথা হয়েছে, কিছু লিখ্‌তে পার্‌ছি না। ভিটের মাটির বিমলবাবুকে বরং থামান যায়, কিন্তু জীবনবাবু ত গুণ্ডাবিশেষ! তাড়ার পর তাড়া দিচ্ছেন, তা তুমি যদি লেখাটা কপি ক'রে দাও বড় ভাল হয়।—দুপুর বেলা এস, আমি 'ডিক্‌টেট্' কর্‌ব, তুমি লিখে নিও, কেমন?

মুনি গম্ভীরভাবে পূর্ব্ববঙ্গীয়দের স্বর নকল করিয়া বলিল—ব্যাতন?

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—According to qualification.

চাকরীতে বাহাল হইয়া পরদিন মুনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া লিপি-কার্য্যে লাগিয়া গেল।

কিন্তু কয়েক লাইন লিখিবার পরই মুনি বলিল—দেখ, আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল'। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহ'লে—' বলিতে বলিতে পকেট হইতে একটি ঠোঙা বাহির করিয়া কল্যাণীর সম্মুখে রাখিল।

কল্যাণী। ওতে কি হরি নাম ভ'রে এনেছ নাকি?—

মুনি। বাসনা আছে তোমার মুখ দিয়েই প্রথম বলাব।

সে ঠোঙা খুলিয়া দেখাইল তাহার মধ্যে বাদাম পেস্তা কিস্‌মিস্ আখ্‌রোট খোপ্‌রা এবং ছোট ছোট মিছরির টুক্‌রা রহিয়াছে!

চুলায় গেল হাতের কাজ—ভিটের মাটি গেল উচ্ছন্নে। কবি কল্যাণী দেবীর মরক্কো বাঁধান খাতাটা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কোল

হইতে মাটিতে গিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িল। মুনির বড় সাধের প্লাটিনাম্ নিবযুক্ত কলমটা গড়াইতে গড়াইতে ঘরের দেওয়ালের কাছে গিয়া হাজির হইল! নিস্তব্ধ ঘরে শুধু মুখচলার শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে পরস্পরের মুখে 'হরিনাম' তুলিয়া দিতেছে; পরস্পরের দন্তে কর্ত্তিত অর্দ্ধাংশ 'হরিনাম' আবেশপূরিত মুগ্ধ অন্তরে মুখে লইয়া 'জপ' করিয়া চলিয়াছে 'চপ্ চপ্ চকুম্ চপ্—'

এক সময়ে কল্যাণী একটি কিস্‌মিসের বোঁটা দন্তে চাপিয়া মুনিকে বলিল—আমার ঠোঁট না-ছুঁয়ে এটা মুখ দিয়ে তুলে নাও দেখি—কিন্তু যদি ঠেকে যায় you miss the kiss for a month—

মুনি বহুবার চেষ্টা করিল কিন্তু হাসি থামান অত্যন্ত কঠিন দেখিয়া বলিল—A great risk—হবে না।

সে দিন রাত্রে বিদায়ের সময় তাহারা চুপি চুপি কি যে পরামর্শ করিয়াছিল তাহা কেহ শুনিতে পায় নাই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এক দিন দুপুর বেলা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে জন-বিরল ছায়া-শীতল পথ দিয়া দুইজনকে ধীরে ধীরে চলিতে দেখা গিয়াছিল। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্যাপারীর নিকট হইতে তাহার অবশিষ্ট একটি ডাব অসম্ভব মূল্যে ক্রয় করিয়া উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়াছে, এবং যিনি তাহাদের সে সময়ে দেখিয়াছিলেন তিনি বলেন তখন তাহাদের মুখে যে ভাব ফুটিয়াছিল তাহা এ পৃথিবীর বলিয়া মনে হয় নাই।

এদিকে যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল মুনির পিতা তখন চারুকে জেরা করিতে স্বরু করিয়াছেন। চারু সব দিক বজায় রাখিয়া 'উকিলের মেয়ে'র মত উত্তর দিতেছিল।

সন্তোষ। তুই ঠিক জানিস্ ও ৯৯নম্বরে রোজ যায়?—

চারু। হাঁ।

সন্তোষ। মেয়েটিকে কেমন দেখ্‌তে ?

চারু। দাদু তার পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়।

সন্তোষ। তুই নিজে দেখেছিস্‌ ?

চারু। হঁা।

সন্তোষ। কোথায় ?

চারু। বৌ-দি'র কাছে Honour-bound, বল্‌তে পার্‌ব না।

সন্তোষ। আচ্ছা তুই এখন যা।

চারু চলিয়া যাইতেই সন্তোষ সুকুমারীকে বলিলেন—তোমার মেয়েও কি রকম উঠে পড়ে লেগেছে দেখেছ ?

সুকুমারী। কি কর্‌ব ?

সন্তোষ। হয় বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন, না-হয় 'তেজ্য পুত্তুর' কর; মানে, আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাক্‌।

সুকুমারী। বেশ, একদিন গিয়ে মেয়ের বাপের সঙ্গে কথা ক'য়ে এস।

সন্তোষ। আবার একদিন ? চল না আজই যাই—

সুকুমারী রাজী হইয়া পোষাক পরিতে গেলেন।

* * *

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, বারান্দায় প্রবোধ একটি চেয়ারে বসিয়া কি-সব কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, এবং মনীষা বাগানের গাছগুলির পাকা পাতা, শুষ্ক ডাল ইত্যাদি কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। এই সময়ে একখানি গাড়ী আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল।

মুনি এবং কল্যাণী আসিয়াছে মনে করিয়া মনীষা আপনার মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রবোধও নড়িলেন না।

গাড়ীর ভিতর হইতে মনীষাকে দেখিয়া সন্তোষ সুকুমারীকে ঠেলিয়া বলিলেন—ছোঁড়াটার নজর আছে, দিব্যিটি না?

সুকুমারী। একটু যা বয়েস বেশী—

সন্তোষ। আমার একটি এগার বছরের খুকির সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল বলে কি ওকেও তাই কর্‌তে হবে না কি?

সুকুমারী। আহা রকম দেখ না। আমি কি তাই বল্‌ছি? তবে, সেদিন যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়ীতে, তার তুলনায় একে নিরেশ বল্‌তে হবে বৈকি?

সইস্ দরজা খুলিয়া দিলে উভয়ে নামিয়া ফটকের ভিতরে আসিতেই মনীষা বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

সুকুমারী হাসিয়া মনীষার কাছে আসিয়া তাঁহার গালে হাত দিয়া বলিলেন—তোমার মা কৈ মা?

মনীষা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—আমার মা? মা ত নেই?—

সুকুমারী। আহা তা আর কি হবে মা, সবার কি আর মা থাকে?—ঐ বুঝি তোমার বাবা?—বলিয়া প্রবোধকে দেখাইয়া দিলেন।

এইবার হাসির ধাক্কা খাইয়া মনীষা অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রবোধও কিছু বুঝিতে না পারিয়া বাগানে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্তোষ নমস্কার করিয়া বলিলেন—কিছু মনে কর্‌বেন না, এ বাড়ীটার নম্বর ৯৯ জেনেই ঢুকে পড়েছি। আমাদের দুজনের

জীবনটাও আজ কিছুদিন থেকে 'নিরেনব্বই'-এর ধাক্কায় কাটছে ! আমার নাম শ্রীসন্তোষকুমার দে, সম্প্রতি সম্বলপুর থেকে—

তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে হইল না, প্রবোধ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য ! এই একটু আগে মনীষাকে বল্‌ছিলাম, একদিন আপনাদের কাছে যাবার জন্যে—ভালই হ'ল।

বেয়ারা কতকগুলি চেয়ার দিয়া গেলে বাগানেই সকলে বসিলেন। সন্তোষ বলিলেন—আমার আসার কারণটা আপনাকে বলি, আজ কয়েক মাস ধরে শুন্‌তে পাচ্ছি আমার একটা ছেলে না কি এই বাড়ীর 'আনাচে কানাচে' বড় বেশী রকম ঘোরাঘুরি করছে। ভাব্‌লাম গেরস্তকে সাবধান ক'রে দেওয়া ভাল। আমার ছেলেটা অতি লক্ষ্মীছাড়া—' বলিতে বলিতে মনীষার দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—আপনার মেয়েটির সম্বন্ধে চারু যে বল্‌ছিল—দাদু তার পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়—তা সত্যি !—

প্রবোধ হঠাৎ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—আরে করেন কি মশায়? ও মনীষা, আমার স্ত্রী—

সুকুমারী। ওমা! আর আমি এতক্ষণ—ছি ছি—আর তুমিও ত ভাই ভারী দুষ্টু ! আমায় ব'লে দিলে না?

মনীষা। আমাকে ত আপনি বল্‌বার কোন সময় দেন নি; তা আর কি হয়েছে, বেশ একটু হেসে নেওয়া গেল।

চার জনেই খুব হাসিয়া লইলেন। সুকুমারী মনীষাকে বলিলেন—অমত ক'র না বোন, শুন্‌ছি মুনিটা তোমার মেয়ের জন্যে একেবারে—

মনীষা। কিন্তু আমি যে ঠিক উল্টো শুনেছি, আমি জানি আমার মেয়েই—

প্রবোধ। আর আমি একটি কথা যা জানি তা যদি বলি, তাহ'লে তোমার মেয়ের জেল হ'য়ে যায়।

সন্তোষ। এত বড় জেলখানা তৈরী হয় নি আজও।

প্রবোধ। মানে আপনিই তাকে জেলে দেবেন।

সন্তোষ। তাহ'লে জান্‌ব আমার পিঁজ্‌রাপোলে যাবার সময় হয়েছে।

প্রবোধ। সেদিন আমার মেয়ে আপনার কাছ থেকে যে চেক্‌খানা নিয়ে এসেছে, উপস্থিত সেটা আমার কাছেই আছে।

সুকুমারী এবং সন্তোষ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—আপনার মেয়ে?—কিন্তু সে ত ৭৩ নম্বরের ঠিকানা!

প্রবোধ। তাহ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, মেয়ে কি ভয়ানক?—

সন্তোষ। ঠিক, তার জেল হওয়াই উচিত! আমার হাতে যদি বিচারের ভার দেন আপনারা, তাহ'লে মুনিকে ওর warder ক'রে ৭ নম্বরে নিয়ে রাখি।

সন্তোষ এবং প্রবোধ যখন এমনি করিয়া পরস্পরের নিকটতর হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে মনীষার চোখ দুটি রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। তিনি সুকুমারীর অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমার ঐ একটা মেয়ে, দিদি, ওকে—

সুকুমারী। ওকি ভাই! ওসব কথা বলা কেন? আমি এসেছি ভিক্ষে ক'রে তোমার মেয়েটিকে নিতে—আমিই বরং বল্‌ব যে, আমার ছেলেকে তোমাদের উপযুক্ত ক'রে নাও।

প্রবোধ। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম এই কথাটা মনে ক'রে যে, এই বিয়েকে উপলক্ষ্য ক'রে আপনাদের সমাজে একটা কোন যদি গোলমাল হয়—

সুকুমারী। সে গোলমালটা আমাদের সহ্য করতে হবে বৈ কি। দুটো মানুষের জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির কাছে ও গোলমালটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। পরের গোলমালটা [illegible] গিয়ে নিজের 'মাথায় বাড়ি' নিয়ে ঘরে পড়ে থাকতে যদি দেখি আমাদের ছেলে-মেয়েকে, সেটা কি এই বয়েসে সহ্য হবে?

প্রবোধ অবাক্ হইয়া সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুকুমারী বলিলেন—মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের দেশের মানুষ গোলমাল থামাবার বিস্তর চেষ্টা করেছে; এবার যদি কেউ কেউ গোলমাল বাধিয়ে দেখ্‌তে চায় ব্যাপারটা কি হয়—[illegible] না।

সুকুমারীর মুখের এই দুইটি কথায় প্রবোধ এবং মনীষার মন হাল্কা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর মুনি এবং কল্যাণী যখন ফিরিল সন্তোষ এবং সুকুমারী তাহার বহু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অবর্ত্তমানে প্রকাণ্ড একটা জটিল ব্যাপারের মীমাংসা যে হইয়া গিয়াছে তাহা তাহারা জানিতে পারিল না। রণজিতের নিকট শুনিল—একজন পাকাচুল বুড়ো আর একজন পাকাচুল বুড়ীর সঙ্গে বাবা আর মা বেড়াতে গেছেন।

সুতরাং রণজিৎকে বকিয়া পাড়তে পাঠানই কল্যাণীর একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল।

কল্যাণী বলিল—ও ভাল কথা, কাল ত বুধবার, মনে আছে ত কম্‌লি আমাদের ডেকেছে, কিন্তু গাড়ীতে যাব না। এখান থেকে এস্‌প্লানেড্‌ পর্য্যন্ত ট্রামে গিয়ে ওখান থেকে 'বাস্‌' নেবো—কেমন?

পরের দিন তাহাই হইয়াছিল। এস্‌প্লানেড্‌ হইতে বাস্‌ লইয়া শুর্কিগঞ্জ সারকিউলার রোডে নামিয়া তাহারা হাঁটিয়া হ্যাভ্‌লক প্লেসে

আসিতেছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পলিন্ ষ্ট্রীটের সম্মুখে আসিতেই মুনি বলিল—একবার শান্তা দেবীর খবর নিলে হয় না?

কল্যাণী। বেশ যা হোক! এখন হয় ত সুপ্রকাশবাবু আছেন, আর তুমি তাঁর সময় নষ্ট ক'রে দিতে চাও? তার চেয়ে চল না কেন ঐ ষ্টক্ রোডের ভিতর দিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি—

বলিতে বলিতে শুরকিগঞ্জের মাঠ ডান দিকে রাখিয়া তাহারা সরু একটি অন্ধকার পথে ঢুকিয়া পড়িল। জন-মানব নাই। মুনি জিজ্ঞাসা করিল—এ-সব পথ তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

কল্যাণী। বাঃ আমরাও যে আগে এই দিকেই ছিলাম।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া অন্ধকার অত্যন্ত গভীর বলিয়া মনে হইল। কল্যাণী বলিল—এখানটায় অন্ধকারটা সব চেয়ে বেশী জমাট বেঁধে আছে, না?

মুনি চারিদিকে তাকাইয়া বলিল—তাই ত মনে হ'চ্ছে!

চারখানি হাত চারখানি ঠোঁট এবং দুইটি নাক যখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং অন্ধকারটা নিবিড়তর হইয়া চোখের সম্মুখে নামিয়া আসিতেছে এমন সময় মুনি এবং কল্যাণীর নিকট হইতে চার পাঁচ হাত দূরে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গেই মুনি এবং কল্যাণীর মিলিত হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। তাহারা দেখিল একটি ইংরাজ যুবক বেঞ্চে বসিয়া পাইপ ধরাইতেছে! অল্প আলোকে উদ্ভাসিত তাহার মুখের উপর দুষ্টামি এবং কৌতুকের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। তাহার পক্ষে হাসি থামান যেন কঠিন হইয়া উঠিতেছে!

কল্যাণীর মনে হইল ও যেন বলিতে চায়—টোমরা এইমাট্র যাহা করিলে টাহা সমষ্টই হামি ডেখিয়া লইয়াছে—'

পরক্ষণেই আলো নিভিয়া গেল, এবং যুবক ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল, যেন তাহাদিগকে শাসাইতেছে—সকলকে বলিয়া ডিব—

মুনিকে একটান মারিয়া কল্যাণী বলিল— —চল।

—২৩—

মানুষ যখন প্রতারিত হয় তখন সে রাগে, কাঁদে, অভিমান করে, কিন্তু এই সমস্ত মানসিক উচ্ছ্বাসগুলি যত মর্ম্মান্তিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক, ইহাদের মধ্যে কোনটিই লজ্জার মত ত... প্রতারকের উপর রাগ এবং অভিমান প্রকাশের দ্বারা মন অনেকখানি হাল্কা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষের মন ঐ উচ্ছ্বাসগুলিকেই আশ্রয় করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। অতি নিকটতম বন্ধুকে প্রতারক জানিয়া যে মুহূর্ত্ত হইতে মানুষ তাহাকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিতে শিখে সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবনের অনেকখানি অশান্তি কাটিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে এ সমস্তের প্রকাশ পায় না তাহাদের মত দুর্ব্বহ জীবন আর কাহারও নয়। তাহাদের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর লজ্জার শলাকা অবিশ্রান্ত বিদ্ধ হইতে থাকে। ইহার বেদনা প্রকাশ করিবার নয়।

এই লজ্জাকে বুকে করিয়া কয়েক মাস হইতে দীপ্তি আপনার আহত মনটিকে সবার দৃষ্টি হইতে কোন মতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। এত দিন কাহারো কাছে ধরা না পড়িবার প্রধান কারণ ছিল তাহার চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাসহীন কথা, হাব-ভাব ইত্যাদি। যে চিরদিন সংযত তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন বড় সহজে কাহারও

চোখে পড়ে না। দিনের পর দিন দীপ্তি হাসে না, বেশী কথা বলে না, কিন্তু তাহা কাহারও মনে কোন রেখাপাত করে না। কিন্তু একদিন মায়া চুপ করিলে বাড়ীর সকলে অস্থির হইয়া উঠে।

মায়া অনেক সময় দীপ্তিকে বলিত—তুই বেশ মানুষের নাকের ওপরই নিজের মনটাকে নিয়ে থাক্‌তে পারিস্, কিন্তু আমাকে চেঁচাতেই হবে। হাসিরও বিরাম থাক্‌বে না—কি শাস্তি!—

দীপ্তির গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল সেইদিন, যখন সে ধীরে ধীরে লজ্জাকে আপনার মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতে অনুভব করিল।

লজ্জাকে প্রথম মানুষ যখন অনুভব করে, তখন সে বলিয়া উঠে—ছি-ছি—' তাহার নিকট হইতে যখন আঘাত পায় তখন বলে—ওঃ—' এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হইয়া যায় কিন্তু মন জাগ্রতই থাকে। এই লজ্জার আঘাতে গত কয়েক দিন হইতে দীপ্তি যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ছিল, গোপন করিবার চেষ্টা করিবার ক্ষমতাটুকুও তাহার ছিল না। সকলে তাহাকে এই ভাবে দেখিয়াছে। বিকাশের কাছে সে একবার আপনাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। বোধ হয় সেই জন্যই সকলের অপেক্ষা বিকাশকেই বেশী সে ভয় করিত। তাহার কাছে আসিতে সাহস পাইত না। সে আসিলে 'মাথা ধরেছে,' 'শরীর ভাল নেই,' কিম্বা কোন কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত, আর আসিত না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার প্রয়োজনীয়তা সকলে বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই শুক্রবার সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন—মায়া আসিবে—সে-ই যেন একমাত্র আশা; দীপ্তির মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা যেন তাহারই কেবল আছে, আর কেহ

তাহা পারিবে না। এবং প্রত্যেকের উৎকণ্ঠাপূর্ণ কথা শুনিয়া শুধু একটি কথা সে বলিত—ওকে যদি বাঁচাতে চান, ওর দিক্ থেকে চোখ তুলে নিন্, কোন সান্ত্বনা, কোন সহানুভূতি ওর ওপর কেউ আপনারা দেখাবেন না।—

দিন যায়।

একদিন দীপ্তিকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখিয়া মায়া আর সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু কি উপায়ে যে তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বই কাগজ-পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেইদিনকার একখানি দৈনিকে কোন একটি বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিয়া হঠাৎ তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তখনই ঝড়ের বেগে আসিয়া দীপ্তির পাশে বসিয়া বলিল—এই পড়্, দেখ্—উঃ ভারী interesting!—

মায়ার এই আকস্মিক আক্রমণ দীপ্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বলিল—মরণ! কি দেখ্‌ব?

মায়া তেমনি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল—পড়্, পড়্—উঃ!

দীপ্তি। তুই পড়্, আমার চশমাটা কোথায় রেখেছি মনে নেই। কি বিষয়?—

মায়া কাগজখানি উঠাইয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। তাহার পর বিষয়টি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পড়িয়া কাগজখানি কোলের উপর রাখিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—মরণ আর কি! অত হাস্‌বার কি আছে?—

মায়া। হাস্‌বার নেই?—বলিস্ কি! উঃ! কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রী বল্‌ছে—আজ দশ বছর ধরে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি

আমরা, কিন্তু পার্‌লাম না!—আমাদের বিয়ে, বিয়ে নয়—বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি চাই আমরা—

জজ বল্‌ছেন—তোমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কি বল্‌বার আছে?

স্ত্রী বল্‌ছে—My husband has a taste for other man's wife—

স্বামী বল্‌ছে—And she for bachelors—জহান্নামে যাক্‌। আচ্ছা দীপ্তি, বল্‌ দেখি, যে স্বামী বা স্ত্রী বেশ জানে যে, সে প্রতারিত হয়েছে বা প্রতারণা করেছে, আর কোন দিনই তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে চল্‌তে পার্‌বে না, অথচ তারই অন্ন খেয়ে বেঁচে থাক্‌তে হবে, তারই ছেলে-মেয়ের—

দীপ্তি বিস্ময়রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—দিদি, তুই বল্‌ছিস্‌ কি সব?

মায়া আরক্তমুখে দীপ্তির দিকে তাকাইয়া বলিল—দুটো জীবন মিলিয়ে দেখ্‌ছিলাম। একজন পুরুষ আর একজন নারী। আর সে পুরুষ সুপ্রকাশ, সে নারী তুই। কিন্তু সুপ্রকাশের তুলনায় তোর দুঃখটা হাসির ব্যাপার বলে মনে হয়। আর কিছুদিন আগে সুপ্রকাশের পরিচয় যদি পেতাম, I would have given Shanta a hard run for her job বিশ্বাস কর্‌ দীপ্তি—আমি তাকে নিতাম। শান্তার মনটা যে এত বড় তা জান্‌তাম না! কি ক'রে সুপ্রকাশের জীবনটাকে সবাই মিলে নষ্ট করেছে তা শুন্‌লে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়!

—একজাতের মেয়ে আছে যারা martyr-এর মুখোস প'রে সময় সুবিধা আর লোক বুঝে সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, দিনের পর দিন তাদের তৈরী-করা সাজান কান্না দিয়ে তাকে ঘিরে রাখে। পুরুষের

প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা সে neglected woman সহ্য কর্‌তে পারে না—প্রথম সহানুভূতি থেকে আরম্ভ ক'রে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে অনেক দূর নেবে যায়, বিশ্বাস ক'রেই নাবে। এই নাবাকে সে গর্ব্ব ক'রে গায়ে মেখে নেয়, কিন্তু এ ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই। সমস্ত কুয়াসা কেটে যায়, বেশ তীব্র আলোকে সে দেখে—সে একা! তার বহু দুঃখের সাথীটি তার কাছে থেকে বহু দূরে বেশ নিরাপদে প্রজাপতির মত রং বদ্‌লে সুখ-সুবিধার ডালে ডালে আপনার জন্যে বাসা বেঁধে বেড়াচ্ছে! এই সুপ্রকাশের জীবন—দেখ্, নে মিলিয়ে নে।—আমার কি ইচ্ছে করে জানিস্ দীপ্তি? ঐ সমস্ত ভণ্ড তপস্বীদের ধ'রে বাইরে লট্‌কে দিই। কিন্তু কর্ত্তারা চোখ পাকিয়ে এই-সব প্রতারিত সুপ্রকাশ-দীপ্তিদেরই দোষ দেবে।

দীপ্তি হঠাৎ মায়ার বুকের উপর পড়িয়া ছোটমেয়ের মত কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত না হইতেই মায়া তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া সোজা দাঁড় করাইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল—কান্না! এত সস্তা, এত সহজ-লব্ধ, যে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটা প্রতারকও তা পাবে?—বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেল্‌তে পারে সে মানুষ? তার জন্যে জীবনের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতে হবে? একটা প্রতারণার কথা মনে চির-জাগ্রত রেখে মুখের হাসিকে বিদায় দিতে হবে?—

দীপ্তি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুই থাম্, অমন [illegible]স্ নি, আমার বড় ভয় করে। আমি ও-সব কোন কারণে মন খারাপ করি নি। কি জানি কি রকম একটা লজ্জা কর্‌ছে, শুধ্ এই—আর কিছু না, এটাকে আমি প্রতারণা ভাবি না। তার মন বদ্‌লেছে, তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। আমি তাকে দোষ দিই না। ভাল

লাগা ভালবাসার ওপর কোন হাত নেই—তবু ঐ লজ্জাটা মনে উঠে—

মায়া। বিদেয় কর্ ও লজ্জাকে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্—

দীপ্তি। আপনিই যাবে একদিন।

মায়া। এখুনি যাওয়া চাই। দূর ক'রে দে ঐ 'Mizpah' লেখা তার দেওয়া আংটিটা—সমস্ত লজ্জার ঐ ত মূল—আজও তুই ওটা হাতে রেখেছিস্?—প্রতারণা করে নি সে?—গ্লাস্‌গো থেকে তোকে যে শেষ চিঠি লিখেছে তার তারিখটার সঙ্গে সুধার বিলেতে গিয়ে পৌঁছানোর তারিখটা মিলিয়ে দেখ্—বুঝতে পারবি। অমল যখন এঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে ওখানেই এক জায়গায় কাজে ঢুকেছে তখন মিঃ রায়চৌধুরী সুধাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। তারপর প্রায় চার মাস ওঁরা তিনজনে নানা জায়গায় ঘুরে দেশে ফিরলেন। তোকে চিঠি লিখ্‌ছে—তোমার ছবিখানা আমার এখন একমাত্র সাথী . . . এমন কত সব কথা, আর অন্যদিকে সুধার সঙ্গে পুরোদমে সব চলেছে! তার এই সমস্ত কাজের মধ্যেই তার এঞ্জিনিয়ারত্ব স্পষ্ট রয়েছে। সুধাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তোকে সে এতদিন হাতে রেখেছিল, সুধা যদি বেঁকে বসে তোকে সে পাবেই! তোদের দুটোকেই সে একসঙ্গে প্রতারণা করেছে—তোকে যখন লিখ্‌ছে ঐ সব, সুধাকে তখন হয় ত সে বুকে নিয়ে চুমা দিচ্ছে . . . তারপর ফিরে এসেও সে তোকে কিছু জানায় নি। মেসোমশাই যখন জিগ্‌গেস করলেন—অমল এমন ক'রে ত ঠিক চল্‌তে পারে না—অমলের অভিমানে আঘাত লাগ্‌ল। বল্‌ল—আমি যত শীগ্‌গির পারি আপনার টাকাগুলো চুকিয়ে দেবো। তোর সঙ্গে কোনদিন যে তার কোন সম্বন্ধ ছিল, তা সে যেন বিশ্বাসই করতে চায় না।—একটা explanation-এরও

যে দরকার আছে, তা তার মনে হ'ল না! হাজার বার সে হাজার-জন মানুষকে ভালবাস্‌তে পারে, তা নিয়ে আমি মাথা ফাটাতে যাব না। তার রুচি তার প্রবৃত্তির ওপর আমি কিছু বল্‌ছি না—কিন্তু ঠকাবে কেন ?—যেদিন থেকে তার মন বদ্‌লাল, সেইদিন থেকে তোর সম্মান বজায় রাখা তার উচিত ছিল না কি ?—তা সে করে নি, কাপুরুষদের ধারাই এই।

দীপ্তি নিঃস্পন্দভাবে শুনিতেছিল। মায়া থামিতেই সে তাহার গালে হাত রাখিয়া তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—থাক্‌গে ভাই দিদি। সে কি—তা নিয়ে আমাদের না-ভাবাই উচিত। আমি তার বিচার কর্‌তেও চাই না। এই নে আংটিটা, যা হয় করিস্‌, বোধ হয় ফিরিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে।

মায়ার সহিত এই কথার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দীপ্তির শরীর ও মনের একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! বহু বৎসরের রোগজীর্ণ শরীর একদিনে সুস্থতা লাভ করিলে যেমন পরিবর্ত্তনটা অত্যন্ত বেশী করিয়া চোখে লাগে, দীপ্তিকেও সেইরূপ দেখাইতেছিল। মায়া বলিল—উঃ কি চোখের জলটাই তুই নষ্ট করেছিস্‌ দীপ্তি!—কাঁদ্‌ না কত কাঁদ্‌তে পারিস্‌, কিন্তু মানুষের মত মানুষের জন্যে কাঁদ্‌, তুই ধন্য হবি, সেও ধন্য হবে!—তা নয়, হাটের মাঝে মেঝে পা ছড়িয়ে কান্না সুরু করেছেন—

আমি বড় ঠকেছি গো—আমি বড় ঠকেছি—'

দীপ্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। মায়া ছড়া বলিবার সুরে বলিতে লাগিল—

আমি পাথর-বাটির গুড়অম্বল কাঁসায় টকেছি গো—কাঁসায় টকেছি!

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—বেরো উট-কপালি—উনুনমুখী, বেরো আমার ঘর থেকে—

মায়া তাহাকে শাসাইয়া বলিল—আজ কল্যাণীদের ওখানে যদি ফের্ তোর গোম্‌ড়া মুখ দেখি তাহ'লে আমিও হাটের মাঝে সুর ধর্‌ব।

সহস্র জনের সহস্র সহানুভূতিতে যাহা সম্ভব হইত না, মায়ার এই কয়টি কথায় তাহা হইয়া গেল! বলা বাহুল্য, সেদিনকার ব্যাপারে দীপ্তি, উমা-কমলার অপেক্ষা অধিক গম্ভীর ছিল না।

অনেক দিন পরে বিকাশ দীপ্তিকে কাছে পাইয়া জল-ভরা চোখে বলিল—পৃথিবীতে বন্ধুগুলো কি আপদবিশেষ দীপ্তি?—

দীপ্তি সলজ্জভাবে বিকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই মনটাও dull ছিল—যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি—

বিকাশ ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় বলিল—আমায় তফাতে রেখো না, আমায় বিশ্বাস কর; অনেক কথা বল্‌তে আমি শিখি নি, চেষ্টাও কর্‌ব না।

দীপ্তির চোখের জল তখন সবে শুখাইয়াছে কিন্তু তাহার মনের ব্যথা সম্পূর্ণ যায় নাই, সে শ্রান্তকণ্ঠে বলিল—আমি কিছু সময় চাই—আমায় কিছু বল্‌বেন না, কিন্তু আপনি যদি রোজ আসেন আমাদের বাড়ী, বড় ভাল লাগ্‌বে—

বিকাশ দীপ্তিকে দেখিতে দেখিতে বলিল—ইচ্ছে কর্‌ছে দুষ্টু ছেলের মত তোমার অবাধ্য হ'য়ে তোমার কপালটায় হাত বুলিয়ে দিই।

—২৪—

সেদিন রাত্রে ,কল্যাণীদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঘুম-ভরা চোখে বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে দীপ্তি বলিল—দিদি তুই বস্‌লি যে! শুবি না ?—

মায়া বলিল—তুই শো, আমি আস্‌ছি। চুলগুলো নুড়ো-নুড়ো হ'য়ে গেছে, একটু ঠিক ক'রে নেবো।

দীপ্তি বিছানার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—ঘুম-পাড়ানি মাসী-পিসীর কৃপা-দৃষ্টি আমার ওপর আজ কিছু বেশী দেখ্‌ছি !

সত্যই তাই। বহু-রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট তাহার চোখ দুটি আজ পরিশ্রান্ত মনটির দিকে আর তাকাইতে পারিতেছিল না।

দীপ্তি বলিল—কাপড় জামা সব ছড়ান রইল, তুই পারিস্ ত পাট্ ক'রে রাখিস্, নয় ত কাল সকালে করব।

মায়া তাহার নাগ্রা জুতাটি খুলিয়া স্যাণ্ডেল পায়ে দিতে দিতে বলিল—আচ্ছা।

কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পর সে যে চেয়ারটিতে আসিয়া বসিয়াছি[illegible] প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া যাইবার পরও তাহার সেখান তে উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দীপ্তি বহুক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া আয়নায় প্রতিফলিত আপনার চোখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া মায়া বলিল—পরশ-পাথর

চাস্ ?—পেলে চিন্‌তে পার্‌বি ? পার্‌বি ?—আর যদি পেয়েই থাকিস্, কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে পরশ-পাথরের ছোঁয়ায় লোহার মন তোর যদি সোনা হ'য়ে গিয়ে থাকে ?—

মায়া আপনার প্রতিচ্ছবির উপর বিস্ময় এবং প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া রহিল।

জীবনের সহিত কথা কহিবার পর হইতে মায়া আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক নারী-প্রকৃতির জন্মলাভ অনুভব করিতেছিল। চিরদিন যে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে, মানুষ সাধিয়া যাহাকে পূজা করিয়া যায়, তরুণ-হৃদয়ের ভালবাসা পাওয়া যাহার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে এবং পঙ্কা গোছের একটা স্নেহের আবরণ মুখে টানিয়া যে ঐ সকল মানুষের কাছে 'বন্ধু' ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বন্ধুত্ব সকলের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া যাহার ধারণা হইয়াছে, তাহারই পূজারীর মধ্য হইতে একজন যে এমন কথা শুনাইয়া যাইবে তাহা তাহার মনে হয় নাই। ইহার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। নিজের উপর অপরিসীম বিশ্বাস লইয়া একান্ত উদারভাবে তাহার বহুবার বহুজনকে-বলা বহু পুরাতন কথাগুলি সে আজ অভ্যাসবশত জীবনকে বলিয়া ফেলিয়াছিল।

স্থির-প্রকৃতি জীবনের সংযত কথার মধ্যে যে গোপন ইঙ্গিতটুকু ছিল, দিনের আলোকে তাহাকে সহজ বা কৌতুক বলিয়া মনে হইলেও রাত্রির অন্ধকারে তাহার কথা ভাবিয়া মায়ার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল।

মায়া আপনার ছবির দিকে বিদ্বেষপূর্ণ চোখে তাকাইয়া বলিল—তুই মায়া ? চির-বিজয়িনী মায়া ?—কিন্তু এ তোর পরাজয়, প্রচণ্ড পরাজয় !

যে প্রশ্ন এবং উত্তরকে লইয়া সমস্ত সন্ধ্যা তাহার কাটিয়া গিয়াছে, যাহাকে মন হইতে সরাইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পাইতেছিল না, সেই প্রশ্ন আয়নায় গায়ে যেন কে লিখিয়া দিয়া গেল—কবে বিয়ে কর্‌বেন ?—'

তাহারই নীচে উত্তর লেখা হইল—যেদিন বৌ খুঁজে পাব—'

মায়া বিমোহিত ভাবে বলিয়া উঠিল—বৌ !

মায়া একদিন গর্ব্ব করিয়া শ্রীশকে বলিয়াছিল—মেয়েদের কি ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হয়, তা আমি আমার জীবন দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

শ্রীশ হাসিয়া বলিয়াছিল—তার কি plan তোমার ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি ?

মায়া বলিয়াছিল—হাঁ। আর plan-টাকে executed ব'লেই জেনো।

আপনার শক্তিকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সে স্বর্ণকে একদিন বলিয়াছিল—'জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা না থাক্‌তে দিয়ে সহস্রদিকে সহস্র কাজের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চাই—'

নারীশক্তি-জাগরণের উত্তেজনা এবং উন্মাদনায় 'নারীত্ব'কে সে দেখিতে পায় নাই, পাইলেও 'দুর্ব্বলতা' বলিয়া উপহাস করিয়াছে।

এই উত্তেজনার প্রচণ্ড আবর্ত্তের মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে সে [illegible] শ্রদ্ধা পূজার অর্ঘ্যগুলিকে দুই পাশে সরাইয়া দিয়াছে, কেহই [illegible]হার গতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই।

'মানসী মায়া' . . . 'মায়া দেবী' . . . 'মায়া অসাধারণ' . . . ইহাই সে শুধু শুনিয়াছে। শ্রদ্ধা এবং পূজার কথা শুনিয়া শুনিয়া দিনে দিনে সে দেবীপ্রতিমার মতই নিশ্চল নির্ব্বিকার হইয়া উঠিতেছিল। তাহার

চোখে 'স্নেহ' এবং 'ক্ষমার' চাহনি, মুখে 'করুণার' হাসি, তাহার পূজারীবৃন্দের প্রতি চিরজাগ্রত ছিল। এই দেবীত্বকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল জীবন, তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি কথা বা শব্দের আঘাতে।—'বৌ' . . .

ঐ আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে 'দেবী মায়া' অনুভব করিল, সে 'নারী'। বিশ্ব-মানবের ব্যথা যাহার বুকে সাড়া জাগাইত, বিশ্বকে 'ঘর' করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার চারি পাশে কোন প্রাচীর রাখিবে না, সে উষ্ণ কঠিন পরিপুষ্ট দুখানি বাহুর নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে ধরা দিবার জন্য আজ আকুল হইয়া উঠিল!

একটা প্রচণ্ড বুভুক্ষার জ্বালা তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া যেন এক নূতন প্রাণ উচ্ছ্বসিত আবেগে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। সাধারণ নারীর মত অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক স্বপ্ন সে দেখিতে লাগিল—তাহাকে সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া, তাহাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া এবং সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া একান্ত স্বার্থপরের মত একজন বুভুক্ষিত লোভী পুরুষ তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে তাহার চেতনা লুপ্ত করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া মৃদু মৃদু বলিতেছে—বৌ—বৌ—বৌ . . .

এই সমস্ত স্বপ্ন এত মধুর, ইহার মাদকতা এত তীব্র যে, অনেক সময় মানুষের মনেই থাকে না যে, সে শুধু 'স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র' এবং বাস্তব জগৎ এ স্বপ্নের বাহিরে তাহার সমস্ত বাস্তবতা লইয়া বিরাজ করিতেছে।

এ স্বপ্ন-পুরীর অতল গহ্বরে বাস্তব জগতের একটি ছোট শব্দের তরঙ্গ আসিয়া মায়াকে দোলা দিয়া গেল—দিদি, তোর হ'ল কি?

মায়া চকিতভাবে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে হাসিয়া বলিল—ব'সে ব'সে ঢু'লে পিঠে ত ব্যথা হয়েইছে, ঘুমটাও চট্‌কে ফেল্‌লাম! এখন আস্ত ঘুম পেলে হয়।—তুই জাগলি যে?

মায়া বিছানায় আসিতেই দীপ্তি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আজ বিকাশ আমাকে বলেছে—'

মায়া ঐ কথার সম্পূর্ণ অর্থ জানিলেও মাথার বালিশটিকে ঠিক করিয়া লইতে লইতে নির্লিপ্তভাবে বলিল—বলেছে, কি ভূতের গল্প?—

দীপ্তি। যাঃ, ঠাট্টা করিস্ নি ভাই, কিন্তু আমি একমাস সময় চাইলাম, তা সে যে দিতে চায় না!

মায়া। Just like a man; দরকার থাক আর না-ই থাক্, vacancy দেখ্‌লেই apply ক'রে বসে।

দীপ্তি। কি কর্‌ব?—

মায়া। Application-এর ওপর দুটো জিনিষ করা চলে, একটা হচ্ছে decline with thanks, আর একটা granted—শেষেরটা I suppose?

দীপ্তির মুখখানি আপনার মুখের কাছে টানিয়া লইয়া মায়া দেখিতে লাগিল।

দীপ্তি বলিল—ওকে ফেরাবার আমার শক্তি নেই।

মায়া দীপ্তির মুখ ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যদি কখনও সে শক্তি তোর হয়, জান্‌ব তোর মত দুর্ভাগ্য আর কারো নেই।

দীপ্তি। সে ত আমার সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না, যদি জান্‌তে পারে, তখন?—

মায়া। তখন আরো বেশী ক'রে তোকে বুকে চেপে রাখ্‌বে। বিকাশকে তুই আজও চিন্‌লি না?

দীপ্তি ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু বহুক্ষণ সে যে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, তাহা মায়া বুঝিতে পারিতেছিল, কারণ সে-ও আজ আপনাকে লইয়া এমনি জাগিয়া আছে।

মায়া ধীরে ধীরে দীপ্তির উত্তপ্ত কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। দীপ্তি সহসা ফিরিয়া মায়ার গলায় মুখ চাপিয়া বলিল—ও আজ এম্‌নি ক'রে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আমার বারণ মানে নি—'

মায়া হাসিয়া বলিল—ইচ্ছে কর্‌ছে তাকে চুমু খেয়ে আসি। তুই তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিস্ তো ?—

দীপ্তি। না পারি নি।

মায়া দীপ্তিকে চুম্বন করিয়া বলিল—তার পাওনা চুমুটা আমি তোকে দিলাম, তুই আমার হ'য়ে ওটা তার কাছে deposit দিস্।

* * * *

প্রতিদিনের মত সেদিন সকালেও নিঃশব্দে বীরেন্দ্র, করুণা, স্বর্ণ বসিয়া ছিলেন যেন চা-পানরূপ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপারটা কোন প্রকারে সারিয়া লইয়া যে-যার আপন কাজে চলিয়া যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। এমন সময়ে চীৎকার করিয়া হাসিতে হাসিতে মায়া ও দীপ্তিকে নামিতে দেখিয়া তিনজনেরই মুখ একসঙ্গে পুলকে ভরিয়া গেল।

বীরেন্দ্র উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন—ওটা দীপ্তির গলা না ?—

করুণা ম্লান হাসিয়া বলিলেন—তাই ত মনে হচ্ছে !

স্বর্ণ। আমি কিছু কচুরী ভেজে আনি, কতক্ষণ আর যাবে। দীপ্তিটা খুব ভালবাসে বল্‌ছিলি না ?—

ঘরে ঢুকিয়া স্বর্ণের এই পক্ষপাতিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া মায়া বলিল—চাই না অমন একচোখো মা, আমরা সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছি।—

করুণা। বাবা রে কি হিঁস্কুটে মেয়ে! বেশ বাপু, আমি তোকে মাংসের সিঙ্গাড়া ভেজে দেবো বিকেলে চায়ের সময়, হবে ত?

মায়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তা হবে।

শ্রীশ তখন দাড়ি-কামান শেষ করিতেছিল। মায়া ও দীপ্তির হাসির শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে গিয়া খানিকটা কাটিয়া ফেলিল। একটু পাউডার ক্ষতমুখে টিপিয়া খাইবার ঘরে আসিয়া মুখখানিকে অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ করিয়া বলিল—তাই ভাল, আমি মনে করেছিলাম বুঝি ডাকাত পড়েছে!—লাভের মধ্যে আমার গালটাই কেটে গেল।

মায়া। ক্ষুরগুলো কি মাকু শ্রীশ-দা, যে, যেমন খুশী চালাবে?

দীপ্তি আঙ্গুল দিয়া শ্রীশের ক্ষতের পরিমাণ দেখিতে গিয়া রাগিয়া বলিল—কি মিথ্যেবাদী, এর নাম কাটা?—

শ্রীশ। না, তা হবে কেন? ওঁদের আঙ্গুলে একটু ছুঁচ্ ফুটলে চোখে অন্ধকার দেখেন, আর—

মায়া চায়ের কাপ্ মুখ হইতে নামাইয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ, ছুঁচটা ফোটে, আর ফোটাটা কাটার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দেয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই এ-কথা বল্‌বে।

শ্রীশ। মেয়েদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কে আজ পর্য্যন্ত জয়ী হয়েছে?

মায়া। কেউ না। এমন সাধ্যি কারো আছে?

এই তিন ভাই-বোনের সহজ কথায় বা অল্প কোন ..রহাসে বীরেন্দ্র এবং করুণা আত্মবিস্মৃত হইয়া আজ হাসিয়া উঠিতেছিলেন, সুবর্ণের মুখও অস্বাভাবিক প্রসন্ন ছিল। তিনি রান্নাঘর হইতে একবার আসিয়া সকলকে বলিয়া গেলেন—সকলে একটু আস্তে আস্তে চা খাও, ওগুলো ভাজা না হ'লে কেউ উঠতে পাবে না।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—কচুরীর নামে আমি শিকড় নামিয়ে দিয়েছি বড়-দি, অফিসের পেয়াদা হাজার টানাটানি কর্‌লেও নড়াতে পার্‌বে না।

এ-কথা মিথ্যা হয় নাই। শুধু তাহাই নয়—এত আনন্দ করিয়া সকলকে খাইতে দেখিয়া স্বর্ণ দুঃখ করিয়া বলিলেন—আহা এমন জান্‌লে আরো কিছু বেশী ক'রে তৈরী কর্‌তাম।

বীরেন্দ্র অত্যন্ত উদারভাবে বলিলেন—তা আর কি হয়েছে? ঐ যে করুণা বল্‌ছিল—বিকেলে কি কর্‌বে, সেই সঙ্গে দিলেও চল্‌বে।

সকলের মিলিত কলহাস্যে অনেকদিন পরে বাড়ীটি যেন আনন্দের হিল্লোলে ভরিয়া উঠিল!

শ্রীশ অনেকক্ষণ হইতে মায়ার দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইয়া হাসিতেছিল, হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল—মা, মানুষ কবে বড় হয়?

করুণা। যেদিন মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়।

শ্রীশ। আমার তা হয়েছে?—

মায়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—তোমার আজও আশা আছে শ্রীশ-দা?—

স্বর্ণ হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীশ বলিল—না হাসি নয়, বড়মাসী, সত্যি বলুন না আমি বড় হই নি?—

স্বর্ণ। তা হয়েছ বৈকি? এই জুলাই-এ ও সাতাশ হ'ল, না রে করুণা?

শ্রীশ। বড় হওয়ার একটা privilege ত আছে? তা আমি ভোগ কর্‌তে চাই এখন থেকে।

করুণা। মানে?

শ্রীশ। মানে আমি সকলকে জানিয়ে দেব যে, আমি বড় হয়েছি।

কথাটি শেষ করিয়া মায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া শ্রীশ পুনরায় হাসিল।

মায়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল!—তোমায় মান্‌বে কে?

শ্রীশ। তুই।

মায়া। বয়ে গেছে। আগে আমায় পাঞ্জায় হারাও ত দেখি।

মায়া তাহার হাতখানি শ্রীশের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

শ্রীশ। এ challenge আমি নিতে পারি না, আমরা দুজনে সমান নই। তা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে লড়াই ক'রে জিত্‌লে অপমান, হার্‌লেও অপমান। বলিতে বলিতে পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিল, তাহাতে লেখা আছে :—

Sm. Maya Roy,
C/o Sj. Srish Mitra,
55, Surkigunj, Circular Road,
Surkigunj, Calcutta.

চিঠিখানি যে কে লিখিয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। বিশেষ করিয়া স্বর্ণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—মায়া দেখ না পড়ে উনি কি লিখেছেন—'

মায়া অভিমানের সুরে বলিল—চাই না ও চিঠি—

শ্রীশ চিঠিখানি লইয়া পুনরায় পকেটে রাখিয়া গম্ভীরভাবে টেবিল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। দেবে না চিঠি?

শ্রীশ। 'কেয়ার অফ্' মানে জানিস্?

মায়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আচ্ছা ব্যাপনার মনে বলিল—
সবাই তোমার কেয়ারে।

শ্রীশ। আমার first order হ'চ্ছে মা, আঁা সমস্ত দিক হইতে
আর হোষ্টেলে না থাকে। ও আজ থেকে এথাপেশ্চিম সকলেই
ওর জিনিয-পত্তর সব বেলা দশটার মধ্যেই আমি এথকার। এখন
ফেল্ব।

মায়া টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিল—This is tyraছ বন্ধ করিয়া
তুমি এটা হ'তে দেবে? ছোটমাসী, তুমিও বারণ কর্বে শ্রয়, কিন্তু এ

স্বর্ণ। তা ওকেই ত master of the house বল?

বড়ছেলে—' ব সে কথন

মায়া। তা বলে জুলুম কর্বে? ব দরজার

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে দীপ্তির ব্যাকুল মূক নিবেদন মায়ার হা এবং
আঙ্গুলে আসিরা নিবেদিত হইল। সে যেন বলিতেছে—যাস্ নে
ভাই দিদি আমায় ছেড়ে—'

মায়া বলিল—বেশ, যাক্গে আমার লেখাপড়া সব চুলোয়!

স্বর্ণ। কেন, বাড়ীতে থাক্লেই সব চুলোয় যায়?

মায়া। এখানে আমার partner কোথায়? কার সঙ্গে
পড়্ব?

শ্রীশ। তার ভাবনাও আমি ভেবেছি। তিন জন দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিতের
ওপরে সে ভার আমি দিয়েছি—তারা তোমায় help কর্বে।
কিছু বল্বার আছে?—

মায়া। আছে। দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিতদের আমি বিশেষ ক'রেই চিনি।
তাঁরা যে আমায় দয়া ক'রে সাহায্য কর্তে চেয়েছেন এতেই আমি
নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ছি কিন্তু তাঁদের মিছিমিছি আর বিরক্ত কর্তে

কথাটি শেষ তুমি যদি অনুগ্রহ ক'রে কিছু সময় 'মাকুর' কথা
হাসিল। সঙ্গে পড়, যথেষ্ট হবে।

মায়া তা' হইল এবং সেই সঙ্গে মায়ার দিকে সকলে
মোড়ল!—যোগিলেন যেন নীরবে আপনার মনের কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ ।ন।

মায়া।

মায়া

শ্রীশ।

সমান নই।

হারলেও

বাহির

—২৫—

...রবেলা অসহ্য গরমে শ্রীশের আর কারখানায় থাকিতে ভাল লাগিল না। সে পথে বাহির হইয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় অগ্রসর হইল। শ্রীশ সাধারণত অত্যন্ত জোরে হাঁটে। পথে বাহির হইলে তাহার পাদুটি এমন অস্থির-আগ্রহে সামনের দিকে চলিতে চায় যে, মনে হয় যেন সে ছুটিতেছে। এবং এই চলার সময় পথ সম্বন্ধে সমস্ত সাবধানতার কথা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। বড়মানুষীর সমস্ত উপকরণ তাহার হাতের কাছে থাকিলেও জোর-করা একটা গরীবিয়ানা সে তাহার সমস্ত বিষয় এবং ব্যবহারে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল এবং এই ধরিয়া র... ...ার একান্তচেষ্টা বা জিদের জন্য যে দুঃখ সে পাইত, সেই ...কে সে উপভোগ করিত। দুঃখকে খুঁজিয়া বাহির করিবার খেয়াল তাহার জন্ম-গত।

পৃথিবী রৌদ্রে ঝলসিয়া যাইতেছে। পথে জনপ্রাণী নাই, দু' একটি কুকুর আহার অন্বেষণে বৃথা ঘুরিতে ঘুরিতে শুষ্ক জিহ্বা বাহির করিয়া

হাঁপাইতেছে। চৌমাথার কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীশ আপনার মনে বলিল—কোথায় যাওয়া যায়?

কথাটার স্বর এমনই যে মনে হয় যেন পৃথিবী সমস্ত দিক হইতে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকলেই বলিতেছে—'শ্রীশ, এস লক্ষীটি, তোমাকে আমার ভারী দরকার। এখন তুমি না এলে আমার চল্‌বে না—'

আবার মনে হয় এ পৃথিবী সমস্ত দ্বার তাহার কাছে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার পায়ের তলার পথ সেই শুধু তাহার আশ্রয়, কিন্তু এ যে পথ শুধু চলিবার, বিশ্রাম করিবার স্থান ইহাতে কোথায়?

নিরুদ্দিষ্ট ভাবে চলিতে চলিতে ব্যাণ্ডেল রোডের ভিতর সে কখন আসিয়া পড়িয়াছে তাহার খেয়াল নাই! এবং সুপ্রকাশের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া প্রথম মনে হইল—একবার ভিতরে গেলে হ'ত। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গেল—দুপুরটা এখানে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা কমলার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাবে। ইহারই সহিত একটা কৌতুকের কথাও তাহার মনে হইল—উমাটা যা হিংসুটে, আমি কমলার কাছে এসেছি, আর ওর কাছে আসি নি যদি জান্‌তে পারে, অভিমানে নাকখানাকে পটলের দোল্‌মা ক'রে ফেল্‌বে।

ভিজা একটা খস্‌খসের পর্দ্দা সরাইয়া সুপ্রকাশের ঘরে ঢুকিয়া শ্রীশ অবাক্ হইয়া গেল। সুপ্রকাশ তাহার ছবির portfolio খুলিয়া ছাপা এবং না-ছাপা সমস্ত ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে! শ্রীশ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাগিয়া বলিল—তুই পাগল হয়েছিস্ প্রকাশ?—

সুপ্রকাশ তাহার হাতের ছবিখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া হাসিয়া বলিল—না, পাগল ছিলাম এতদিন, এবার জ্ঞান হয়েছে।

শ্রীশ। মানে ?—

সুপ্রকাশ। কেন আমি caricaturist ? পৃথিবীর যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছুকে আশ্রয় ভেবে মানুষের প্রাণ বাঁচে, সে-সমস্তকে নিয়ে এমন বিযাক্ত-হাসির ভিতর দিয়ে একটা জালাভরা বিদ্বেষ দিনের পর দিন কেন ঢেলে দিচ্ছি শ্রীশ ?—

শ্রীশ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া সুপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুপ্রকাশ বলিল—শান্তা একদিন এখানে এসেছিল; সে আমার আঁকা ঐ landscape-গুলো দেখে বল্ল—যে চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে এত সুন্দর ক'রে দেখ্‌তে পেয়েছ, সেই চোখকে আর কেন ঐ সমস্ত আবর্জ্জনার ওপর এনে ফেল ?—ব'লে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে আমার চোখের ওপর—'

সুপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আর একখানি ছবি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—ওর সঙ্গে তোমার অনেক দিনের আলাপ, না ?

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—আলাপ মানে ? ওটা যেদিন [illegible] সেইদিন থেকে ওর সঙ্গে প্রেম ক'রে আস্‌ছি—মাঝখানে উমি কমলি আর ঐ রাক্ষুসী কল্যাণীটা থেকেই ত সব মাটি হ'য়ে গেল।

সুপ্রকাশ না হাসিয়া বলিল—আমি বল্‌ছি তুমি ওকে দেখেছ কোন দিন ?

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তুমি কি ভাব, তুমি আমার চোখে ওকে বেশী দেখে ফেলেছ ?

সুপ্রকাশ। না, তা ঠিক বল্‌তে চাই না। এত বড় একটা প্রাণের সন্ধান পেয়েও তাকে সরিয়ে রাখ্‌বার অর্থ আমি বুঝ্‌তে পারি না!

শ্রীশ। বিয়ে করলেই কি খুব কাছে রাখা যায় মানুষকে, প্রকাশ? আমার কথা শান্তা তোমায় কিছু বলেছে কি? যদি তোমার মনে কোন প্রশ্ন জাগে, বল, আমি পরিষ্কার ক'রে দেবো।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ, তা মোটেই ভাবি নি। আর ও বলছিল—শ্রীশ-দা'র হৃদয়খানায় টিকিট মেরে museum-এ রেখে দেবার মত। মানুষ দেখবে আর হাঁ ক'রে থাকবে। থাক্ বাজে কথা, তুমি আজ এসেছ ভালই হয়েছে, নইলে আমি নিজেই যেতাম তোমার কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুপ্রকাশ বলিল—শ্রীশ, আমাকে সমস্ত দিক দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্যে সে কেন এত আয়োজন করছে বলতে পার?

শ্রীশ। 'সে' মানে?

সুপ্রকাশ। 'সে' মানে 'সে', তার নাম করতে চাই না। আমার অপমান, আমার অশান্তি, আমার দুঃখের জন্যে আমি নালিস করছি না! সে আমার রাগের উপযুক্তও নয়।—

—বছরের পর বছর একা সহস্র দিক থেকে সহস্র আঘাত খেয়ে একটুখানি ধরবার মত অবলম্বন পেয়েছি, শ্রান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙ্গে আসছে। আর বাজের মত সে এসে আমার সব ভেঙ্গে দিতে চাইল, কিন্তু পারে নি শ্রীশ! উঃ আমার মনে যে কি হচ্ছে তোমাকে কি বলব!—

শ্রীশ স্তব্ধ হইয়া সুপ্রকাশের আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুপ্রকাশ বলিল—সে শান্তার কাছে এসেছিল—কাল সন্ধ্যাবেলা।

শ্রীশ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি?

স্বপ্রকাশ। হাঁ, আমি তখন সবে ফটকের কাছে এসেছি, তাড়াতাড়ি একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠে বস্‌ল! আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পারি নি, তাকে স্পষ্ট দেখ্‌বার মত আলোও তখন ছিল না।

—ভিতরে এসে দেখ্‌লাম শান্তা স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে! ও যখন কিছু ভাবে, মনে হয় ওর প্রাণ নেই! ঠিক এম্‌নি ক'রে আর একদিন ওকে বসে থাক্‌তে দেখেছিলাম। তার পাশে বস্‌তেই সে বল্‌ল—ওকে দেখেছ তুমি?—

—আমি বল্‌লাম—একটা মানুষের ছায়ামাত্র, আর কিছু না, কে উনি?—

—শান্তা বল্‌ল—একটা রাজত্বের চেয়ে বেশী দামী জিনিষ উনি আমায় দিয়ে গেলেন! তুমি ওঁকে চেন।

—আমি চিনি?—

—হাঁ।

—কি রকম তাকে দেখ্‌তে একটু বল ত?

—শান্তা বল্‌ল—অত্যন্ত পাত্‌লা কিন্তু রোগা নয়। সুন্দর বল্‌ব কি সাদা বল্‌ব তা জানি না। মনে হয় দেহের প্রত্যেকটি রক্তকণা কেউ বার ক'রে নিয়েছে! চোখ দেখ্‌তে পাই নি, কালো চশমায় ঢাকা ছিল। মুখের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ক'রে চোখে পড়ে তার ঠোঁট দুটি, সেই বোধ হয় একটুখানি প্রাণের আভাস জাগিয়ে রেখেছে! তার লাল্‌চে ভাবটা এখনও কাটে নি! অত্যন্ত আস্তে কথা বলে—যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা কইছে। আর গালে হাসির সঙ্গে সঙ্গে ছোট দুটি টোল্ খেয়ে যায়। চুলের রং তোমার মত ঈষৎ লাল্‌চে আর

কোঁক্‌ড়ান। আমার হাতে এই লকেট্‌টা দিয়ে বল্‌লেন—এর্‌ শুনিয়া একটা জিনিষ আছে, এখন খুলো না, সুপ্রকাশবাবু এলে দেখেন্ধকার আমার খুব আদরের ছিল। 'সিয়া

—আমি জিগ্‌গেস করলাম—তুমি পরিচয় চেয়েছিলে কি?

—শান্তা বল্‌ল—পরিচয় চেয়েছিলাম, তিনি বল্‌লেন, সুপ্রকাশবাবু আমার পরিচয় আপনাকে দেবেন। তাই তোমার জন্যে ব'সে আছি।

—আমি বল্‌লাম—মানুষটাকে আমি চিনি কিন্তু লকেটের ভিতরে কি আছে জানি না। তুমি খুলে দেখ্‌তে পার।

—শান্তা খুলে দেখাল তার মধ্যে আমার একখানা miniature; সেখানা সে গলায় পরে নিয়েছে, আর আমায় বল্‌ল—ওঁর বিচার তুমি কোন দিন কোরো না। বল এ-কথা আমার রাখ্‌বে?

—আমি বল্‌লাম—ও যদি তোমার কাছে না এসে এই মহত্ত্ব দেখাত, আমি আরও কৃতজ্ঞ থাক্‌তাম। অনেক পরিচয় তার পেয়েছি, সম্প্রতি আর একটি পেলাম, আর এটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় শান্তা—she is mean—

—শান্তা বল্‌ল—আমার মনের শান্তি কিছুতে আস্‌বে না যদি তুমি ওকে এত ছোট ক'রে দেখ। সে সত্যি বড়।

—হোক সে বড়। থাক্‌ সে তার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের আনন্দ বুকে নিয়ে শ্রীশ, আমাকে শান্তার পাশটিতে আমার জীবনের বাকী দিনক'টা কাটাতে সে আমায় দিক, এর মধ্যে কোন দিক দিয়ে তাকে যেন আমায় দেখ্‌তে না হয়। এই শ্রীশ, ছেঁড়্‌, ছেঁড়্‌, আমার আঙ্গুলে ব্যথা হ'য়ে গেল—ওটা কি রে?—কি লেখা আছে তলায়? 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়?'—আর এটা 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে',—আর

শ্রীশ্রে ! ও বাবা ! 'এ ত খেলা নয়, খেলা নয়, এ যে হৃদয়-দহন-সুখি'—বহুৎ আচ্ছা !

তাড়া শ্রীশ অনুনয় করিয়া বলিল—এই প্রকাশ, এগুলো আমায় দে ভাই, কিসের কি বুদ্ধি ! এ সব ত ছাপা হ'য়ে গেছে কাগজে, কত হাজার মানুষের ঘরে ঘরে রয়েছে, সব নষ্ট করতে পারবি ?

সুপ্রকাশ। তাও ত বটে। আচ্ছা কি করবি এগুলো নিয়ে ?

শ্রীশ। বুড়ো বয়েসে হাস্‌ব আমাদের কীর্ত্তির কথা স্মরণ ক'রে। তখন ত আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না। এইগুলো অনেক কথা মনে করিয়ে দিনগুলোকে একটু তাজা ক'রে হয় ত রাখতে পারবে।

সুপ্রকাশ। এখন থেকেই তার তোড়জোড় চল্‌ছে ?

শ্রীশ। এ সব সঞ্চয়ে বহুদিন মনোনিবেশ করেছি, হাজার খানেক শান্তার চিঠিই আছে। কেড়ে নেবে নাকি ?

সুপ্রকাশ। তার ওপর আমি কোন দাবী করতে চাই না। সে আগে কি ছিল, তা জান্‌বার এতটুকু আগ্রহ আমার নেই। পিছনে সে যা ফেলে এসেছে সে তার, সাম্‌নে যা রইল তা আমার।—ও শ্রীশ, মা বৌ-দি সকলে দেওঘর থেকে এসেছেন, যাও না ওপরে, তোমার কথা ওঁরা তখন বল্‌ছিলেন।

শ্রীশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—সত্যি ! আর তুমি এতক্ষণ আমায় কিছু বল নি ?

*　　*　　*　　*

জল্ হয়েছে ?—বাছালে ! মলে দাই ! দাক্তাল্ আছ্‌বে, ওছুদ দেবে, এক্কুনি ছেলে দাবে—'

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় অপার্থিব ঐ স্নেহের স্বর শুনিয়া শ্রীশ থামিয়া গেল। চারিদিকে তাকাইতেই সিঁড়ির নীচে অন্ধকার কোণে স্বরের উৎসকে সে দেখিতে পাইয়া অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ছয়মাস পূর্ব্বে যে মানব-শিশুটি স্বর্গের মাধুরী দিয়া এই গৃহটিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, যাহার হাসি আর অবিশ্রান্ত কল-কাকলী প্রতিদিন তাহাকে এখানে মন্ত্র-মুগ্ধের মত টানিয়া আনিত, তাহারই আদরের 'পুষি' একটি হাত-পা-ভাঙ্গা সেলুলয়েডের ডল্‌কে বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বনে সিক্ত করিয়া দিতেছে!

মাটির উপর হাত পা আকাশের দিকে তুলিয়া আর একটি পুতুল হাসি বা কান্নার নকল মুখে লইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গালে আঘাত করিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে পুষি বলিল—টিপ্‌ছি, তুমি ভালী দুত্তু, জিপ্‌ছিকে তুমি কেন মেলেছ?

শ্রীশ ডাকিল—পুষি-মা—

স্নেহময়ী জননী তাহার রুগ্ন কন্যাকে কোল হইতে ফেলিয়া, টিপ্‌সির বুকে একটি পা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—শিলিষ কাকা—

খেলাঘরের একটি কম্বলের আসনে শ্রীশ বসিয়া পড়িয়া পুষির সংসারের সমস্ত খবর ইত্যাদি লইতে লাগিল। তাহার ডাক্তারীতে জিপ্‌সির জ্বর সারিল। দুষ্ট টিপ্‌সি শান্ত-শিষ্ট হইল। হিমাংশু এবং কিটির উদ্বাহ ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতে চলিল!

পুষি বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা প্রভৃতির সমস্ত কর্ত্তব্য সারিয়া 'বর' ও 'কনের' পালাও লইল। শ্রীশের বলার সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—'তোমাল লিদয় আমাল হোক' 'আমাল লিদয় তোমাল হোক—'

কিটি ও হিমাংশু হাতে হাত দিয়া পাশাপাশি বসিয়া ছিল, কিসের একটু নাড়া পাইয়া হিমাংশু গড়াইয়া পড়িল ! বিবাহের সময় এই দুর্ঘটনায় পুষির মুখ ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীশ গম্ভীর ভাবে বলিল—এ বিয়ে হ'তে পারে না, ছেলের মত নেই।

পুষি রাগিয়া বলিল—হতভাগা ছেলে চাই না, আমি টিপ্‌ছির ছঙ্গে বিয়ে দেব।

সিঁড়ির রেলিং-এর উপর ভর দিয়া সুপ্রকাশের মাতা সুকৃতি এবং বৌ-দি লাবণ্য অনেকক্ষণ হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। হাসিয়া বলিলেন—ছেলের ত দোষ নেই, মেয়েই ত ওকে ঠেলে ফেলে দিল !

লাবণ্য হাসিয়া বলিল—ঠাকুর-পো কি আজকাল এতেই হাত পাকাচ্ছ না কি ?

শ্রীশ হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—আজ কাল অনেক বিষয়েই হাত পাকাতে হ'চ্ছে, কি জানি কখন কোন্‌টা দরকার প'ড়ে যায়। ঘট্‌কালিও ক'রে থাকি বৌ-দি—

লাবণ্য বলিল—পুষিকে ছেড়ে একবার ওপরে এস না, মা'র সঙ্গে আমার ভারী ঝগড়া হ'য়ে গেছে জিনিষপত্তর নিয়ে। ওঁর একেবারে পছন্দ নেই। যত সব সেকেলে ধরণের ভারী ভারী কাপড় আর গয়না বার করেছেন ! ঐ সব যদি আজকাল্‌কার মেয়েকে প[illegible]তে হয়, গেছি আর কি ! আমি ও-সব পর্‌তে চাই না ব'লে ঠিক [illegible]ছেন সব নতুন বৌকে দেবেন।—বেচারী নতুন বৌ, হাড়্ গোড়্ সব চূর্ণ হ'য়ে যাবে দেখ্‌ছি।—

সুকৃতি। বেশ বাবু তোমাদের খুশী মত সব ক'রে নাও, আমি তোমাদের কোন কথায় থাক্‌তে চাই না, কিন্তু এ-সব ভেঙ্গে নতুন গয়না

আমি করতে দেবো না কিছুতেই। এ আমার শাশুড়ী প'রে গেছেন। আর কি যে বাহারের ছিরি তোমাদের ঐ বোরোচ্ আর বেরেসলেটের, হাল্কি সোনা! ক' রত্তিই বা সোনা আছে?

শ্রীশ উভয়ের সহিত ঘরে আসিয়া দেখিল বিছানার উপর একরাশ কাপড় জামা ঈষৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং একটি হাতীর দাঁতের কাজকরা বাক্সে গহনাগুলি রহিয়াছে।

লাবণ্য বলিল—কাপড়গুলো আমার মনে হয় চল্‌তে পারে। অবিশ্যি নতুন-বৌ যদি পালোয়ান হয়—কোন্ রংটা তাকে বেশী মানাবে ঠাকুর-পো?

শ্রীশ ভাবিয়া বলিল—ঠিক বল্‌তে পারব না। তাকে কোন দিন এসব পরতে দেখি নি, তবে মনে হয় ঐ এমারেল্ড-গ্রীন্ আর পারপল্-গ্রে সাড়ী তাকে খুব মানাবে।

লাবণ্য। বেশ, মানাক্ তাকে। কিন্তু আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি আমি পরিয়ে দিতে পারব না।—

শ্রীশ। বাবা কি হিংসুটে তুমি!—

লাবণ্য মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কেন হ'ব না? আজ বার বছর একা একা খেটে খেটে আমার শরীর পিসে গেছে। আসুক না সে, এমন খাটাব—

সুকৃতির চোখদুটি ধীরে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ভারী গলায় বলিলেন—সেইদিন হোক্ মা, তোর কথাই আমার প্রকাশের মাথায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিক্।—সে কি কোন গয়নাই পরে না শ্রীশ?—

শ্রীশ। গয়না পরবার মত অবস্থা তাদের কোন দিন ছিল না। পরবার জন্যে আগ্রহও তার আছে ব'লে মনে হয় না। এ-সব যদি তাকে

পরাবার কথা মনে ক'রে থাকেন, তাহ'লে সেটা বাজে হবে মাসী। আসল মুক্তোর অভাবে নকল নিয়েও সাধ মেটায়, এমন মেয়ের অভাব আমাদের সমাজে নেই, কিন্তু শান্তা সে জাতের মেয়ে নয়!—তার কথা কিছু শুনতে চান্ মাসী?—

সুকৃতি। ইচ্ছে খুবই করে বৈকি শ্রীশ, কিন্তু ভাবছি, একেবারেই দুচোখ ভ'রে তাকে দেখ্‌ব।

লাবণ্য। একচোখো মা—

সুকৃতি হাসিয়া বলিলেন—শোন ক্ষেপীর কথা!—আমি যাই, কিছু আম পুড়িয়ে সরবৎ ক'রে আনিগে। শ্রীশ, তুমি এখুনি যেও না বাবা।

লাবণ্য তাহার অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানি একটি সবুজ বেনারসী সাড়ীর উপর রাখিয়া দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—হাঁ যাবে বৈকি, দিলে ত?—

শ্রীশ কাপড়গুলি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—গেলে ত?

লাবণ্য হাসিয়া বলিল—কি বুদ্ধি!

শ্রীশ। আমার বুদ্ধির তারিফ কর তা হ'লে?—

লাবণ্য হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা ঠাকুর-পো, ব্রাহ্ম-মেয়েদের শিং থাকে?—

শ্রীশ উচ্ছ্বসিত স্বরে হাসিয়া বলিল—শিং?

লাবণ্য। হাঁ, থাকে?—

শ্রীশ। না, আমার ত কোন দিন চোখে পড়ে নি, তবে মায়ার খোঁপা বাঁধ্‌বার ধরণ দেখে একদিন ভেবেছিলাম বটে পিছনের দিকে একটা নতুন-কিছুর জন্ম লাভ হয়েছে!

লাবণ্য। শিং নেই? কিন্তু তাদের খুর থাকে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

শ্রীশ। তোমার চোখ এবার কোন্‌দিন তাদের পাঁচপাও দেখ্‌তে পাবে।

লাবণ্য। হাসি নয় ঠাকুর-পো, সত্যি বল্‌ছি—চল্‌বার সময় খট্‌ খট্‌ শব্দ হয়।

শ্রীশ। তোমার চোখ খারাপ হয়েছে, সে তাদের জুতোর 'হাই হিল্‌'। কিন্তু মাভৈঃ! তোমাদের ছোট-বৌ-এর তা থাক্‌বে না।—আমি জামিন্‌ থাকৃতে রাজি আছি।

লাবণ্য। বাঁচালে ভাই! আমরা সেকেলে মানুষ—সদাই ভয়ে মরি, কি জানি কখন কোন্‌ দিক থেকে একালের মেয়েদের কাছে থেকে চাট্‌ খাই!

শ্রীশ। ধর যদি খাও, কি কর্‌বে?

লাবণ্য। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আবার দেওঘর পিট্টান দেবো।

শ্রীশ। তুমিও খুরে লাগাতে পার্‌বে না?

লাবণ্য। না, আমার কি খুর আছে?—

দুপুর বেলা সুপ্রকাশের বাড়ীতে কাটাইয়া শ্রীশ যখন হ্যাভ্‌লক্‌ প্লেসে আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কমলা বহুদিন হইতে একখানি সিল্‌ভার-গ্রে রং-এর পশমের ড্রেসিং-গাউন বুনিতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেটি কিছুতেই শেষ হয় না! কখনও শেড্‌ পছন্দ হয় না, কখনও বুনানি ঢিলা বা অত্যন্ত আঁট্‌ হইয়াছে বলিয়া খুলিয়া পুনরায় নূতন করিয়া আরম্ভ করে। গড়া জিনিষকে ভাঙ্গিয়া কিন্তু সে একদিনও

পরিশ্রান্ত হয় নাই, অধ্যবসায়েরও কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই!—এ যেন তাহার বিরহী-হিয়ার দিন গোণা! হাতীর দাঁতের কাঠিতে ফাঁস দিয়া টানিতে টানিতে কত সময় তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়ে, তাহার খেয়াল থাকে না!

শ্রীশ তাহার পাশে বসিয়া ডাকিল—কমল—'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রং-এ কমলার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভাঙ্গা গলায় বলিল—তবু ভাল! মনে পড়েছে—'

শ্রীশ পশমের গোলাটি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—হুগ্‌লি গিয়েছিলাম, সুধীরের সঙ্গে দেখা হয়েছে কাল।

জামাটিকে কোলের উপর রাখিয়া কমলা স্তব্ধ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীশ বলিল—জেলে যাবার সময় তার ওজন ছিল এক মণ আঠার সের, এখন হয়েছে এক মণ পচিশ সের!—তার বুকের মাপ ছিল ছত্রিশ ইঞ্চ, এখন হয়েছে চল্লিশ!

যে জলবিন্দু দুটি কমলার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল তাহা সহসা থামিয়া গেল। এবং তাহার ঠোঁটদুটিতে শিশু-সুলভ হাসির আভাস দেখা দিল।

শ্রীশ বলিল—মনে রেখো কমল, এ সমস্তই কুড়ি দিন hunger strike-এর পর হয়েছে। বাঁদর বল্‌ল কি জান? বল্‌ল—না-খেয়ে ক্ষতি যা হয়েছে, তার দাম উঠিয়ে নেবো না?—ঠেসে লপ্‌সী চালাচ্ছি—

এবার কমলার চোখের জল এবং মুখের হাসি এক সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আবেগে বাহির হইয়া আসিল।

শ্রীশ এই সমস্ত কৌতুকের কথা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—জেল্‌-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বল্‌লেন—Chowdry has a good

appetite. I wonder how hestruck for so many days'!—আর একমাস কমল—'

কমলা তাহার জলভরা বড় বড় চোখ শ্রীশের মুখের উপর তুলিয়া চাহিয়া রহিল, যেন সে তাহার প্রিয় বন্ধুর মুখখানি শ্রীশের মুখে প্রতিফলিত দেখিতেছে !

কিছুক্ষণ পরে ঈষৎ লজ্জার স্বরে বলিল—মামা মত দিয়েছেন, তিনি কোন আপত্তি কর্‌বেন না।

শ্রীশের মুখ হইতে যেন একখানি মেঘ কাটিয়া গেল। বলিল—কি ক'রে সম্ভব হ'ল ?

কমলা গাউনটা দেখাইয়া বলিল—তা ঠিক জানি না, প্রতিদিন যেমন এটা নিয়ে বুনি, তেমনি আজও ব'সে ব'সে আপনার মনে বুন্‌ছিলাম। তিনি এসে বল্‌লেন—আমার মত না পেলেও সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দেশের মানুষের হাসি-বিদ্রূপ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে ?

—আমি বল্‌লাম—পার্‌ব।

—তিনি বল্‌লেন—আমি মত দিলাম।

শ্রীশ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া ঘরের ভিতরে যাইতেছে দেখিয়া কমলা বলিল—কোথা যাচ্ছ শ্রীশ-দা ?—

শ্রীশ বলিল—সুধীরের হ'য়ে মামাকে একটা প্রণাম ক'রে আস্‌তে—

কমলা। তিনি ত নেই, অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন, বোধ হয় উমার বাবার কাছে।

শ্রীশ বসিয়া পড়িয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—So miss, you will marry your cousin ?—

কমলা মাথা নীচু করিল।

—২৬—

সেদিন শ্রীশ যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। বাহির হইতে ডাইনিং রুমের মিশ্রিত কোলাহল শুনিয়া শ্রীশ প্রমাদ গণিল। জলের গ্লাস, ডিস্ প্রভৃতির যে শব্দ হইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায়, আহার বহুক্ষণ হইতেই চলিতেছে। কিন্তু উপায় নাই। সমস্ত দিনের ধূলি-ধূসরিত কাপড়-জামার কথা মনে করিয়া সে খাইবার ঘরে যাইতে পারিল না। মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সে যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে আসিয়া বসিল, তখন নিবিষ্ট মনে সকলে পাতের দিকে চাহিয়া খাইয়া চলিয়াছে।

বর্ষীয়সী শিক্ষয়িত্রী যেমন চশমার ভিতর দিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করে, সেই ভাবে মাথা নীচু এবং চোখের তারা ভ্রূর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া শ্রীশের দিকে তাকাইয়া মায়া বলিল—দেরি হ'ল কেন—আঁ ?—

শ্রীশ। খাবার সময়টা তোমরা যদি নিজেদের ক্ষিদের সঙ্গে বদ্‌লাতে থাক, তাহ'লে দোষটা কি আমার ?

মায়া। অর্থাৎ ?

শ্রীশ। অর্থাৎ আটটা বাজ্‌তে এখনও সাত মিনিট।

মায়া। তোমার ঘড়িটা মিথ্যেবাদী। বাড়ীতে যতগুলো ঘড়ি আছে দেখে এস, সবাই তার সাক্ষী দেবে। ওটাকে reformatory-তে পাঠাও।

শ্রীশ সদর্পে ঘড়িটি মায়ার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া তাহার সত্যবাদিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া দেখিল সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডটি স্থির নিশ্চল-ভাবে পড়িয়া আছে! ঘড়িটিকে কানের কাছে আনিয়া তাহার হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে চেষ্টা করিল, সেও নীরব! বিপুল বেগে ঝাঁকানি দিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! মায়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—সম্ভবত ওর ক্ষিদে পেয়েছে রে, খেতে দে, খেতে দে। আমার ঘড়িটারও মধ্যে মধ্যে অমন ফিট্ হয়।

সে রাত্রে বিকাশ সকলের সহিত আহার করিবার জন্য আহূত হইয়া আসিয়াছিল। বলিল—ঘড়ি যদি মিথ্যে কথা বলে সেটা ততটা মারাত্মক হয় না, কিন্তু ঐ ঘড়িকে বিশ্বাস ক'রে যদি আর কারো ঘড়ি মিলিয়ে দেন—'

শ্রীশ চিংড়িমাছের কাট্‌লেটের খানিকটা মুখে পুরিয়া বলিল—দেন কি? দিয়েছি! মজাবে দেখ্‌ছি! সে আর কারো ঘড়ি নয়, উমার!

সকলে শ্রীশের এই ভ্রান্তি বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছিল।

মায়া বলিল—তোমাকে একটু জোরে মুখ চালাতে হবে, নইলে আমাদের ধর্‌তে পার্‌বে না, আমরা মাংসে এসেছি।

শ্রীশ। By neck জিতে যাব, দেখ্।

সুবর্ণ বকিয়া উঠিলেন—ও ভুটোতে যে কি করে, তার ঠিক নেই! না শ্রীশ, তাড়াতাড়ি ক'র না। পালিয়ে যাচ্ছে না ত কিছু।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এমন সহজ স্নেহের সুরের কথা সুবর্ণের নিকট হইতে কেহই আশা করিত না। খাইবার সময়ে পাছে কোন অসংযত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সকলে বিশেষ উৎকণ্ঠিত থাকিত। মুখে 'চপ্ চপ' না শব্দ হয়। 'কোঁৎ কোঁৎ' করিয়া কেহ জল না

খাইয়া ফেলে। খাইবার সময় মেয়েদের গা-চুল্‌কান, এবং ছেলেদের আহারান্তে পেটে হাত বুলান, ঢেঁকুর তোলা—কোন দিন তিনি সহ্য করিতেন না।

তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া বিবাহের অব্যবহিত পরেই চির-উচ্ছৃঙ্খল চন্দ্রকুমার শুধ্‌রাইয়া গিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ আজও সাধ্যমত চেষ্টা করেন। অসাবধান হইয়া পড়িলে 'I am sorry, excuse me' প্রভৃতি বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন। কিন্তু নগেন্দ্র-নাথকে এ যাবৎ তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পেটে হাত বুলান, আহারান্তে পান মুখে দিয়া উদ্গার তুলেন, এবং এ সমস্ত গর্হিত কর্ম্মের সময় তিনি বড়-দি'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। কিন্তু এ সমস্তই বহু পূর্ব্বের কথা। তখনকার স্বর্ণ এবং এখনকার স্বর্ণের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বলিল—জানেন বড়মাসী, প্রিয়মামা কমলার বিয়েতে মত দিয়েছেন।

শ্রীশের এই কথাটি স্বর্ণের কাছে একদিন হয় ত অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিত, এবং তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু এখন বলিলেন—প্রিয়বাবুর অপরাধ? মত না দিয়ে তিনি কি কর্‌বেন? যে সব ধিঙ্গী হ'চ্ছ তোমরা, কোন্ দিন বল্‌বে আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও, আমি নিয়ে খেলা কর্‌ব। এবং কথা কয়টি বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন। পূর্ব্বেও হয় ত তিনি ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিতেন কিন্তু তাহার স্বর শুনিয়া সকলের হৃৎকম্প হইত।

শ্রীশ আড়চোখে একবার স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া ছেলে-মানুষী স্বরে বলিল—ওটা বুঝি আকাশের চাঁদ চাওয়া?—

স্বর্ণ। নয় ত কি ?—কি বাপু এই সব ভাই-বোনে বিয়ে, দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। তোমার কি মত বিকাশ, এ সব ভাল ?—

বিকাশ। বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন সোনামাসী। ভাল মন্দ বলা কি সহজ ? তবে মনে হয় এ সব বিয়ে বেশী হবে না। দুএকটা হ'লে তাকে ক্ষমা ক'রে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া এ সব দেশাচার বৈ ত আর কিছুই নয়, এই ধরুন না, দ্রাবিড়ি ভদ্রলোকেরা ভাগ্নিকে পেলে আর কাকেও বিয়ে করতে চায় না, সেটা তাদের খুব উঁচু ধরণের বিয়ে। মেয়েটির অন্য কাকেও বিয়ে করবার ইচ্ছে হলে মামাকে জিগ্‌গেস করে—মামা, আমি কি 'অমুক'কে বিয়ে করতে পারি ?—

দীপ্তি তখন সবে জলের গ্লাসটি মুখে তুলিয়াছে, হাসির ধাক্কায় তাহার বিষম লাগিল এবং একমুখ জল লইয়া কাশিতে কাশিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে স্বর্ণ প্রভৃতির মুখও রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মায়া বলিল—বাবারে! বিকাশবাবু, এখুনি দীপ্তিটাকে মেরে ফেলেছিলেন! হাস্‌তে হাস্‌তে মারা গেলে লোকে বল্‌বে কি ?

দীপ্তি চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া পুনরায় তাহার চেয়ারে বসিতেই বিকাশ বলিল—এত হাসি পাবে তা জান্‌তাম না, মায়া-দি।

শ্রীশ। কিন্তু কোন দেশের প্রথাকে নিয়ে এমন ক'রে হাস্‌তে দিতে পারি না। হাসিগুলো তোমরা চেপে নাও মায়া।

গম্ভীরভাবে এই আদেশ করিতে গিয়া শ্রীশ নিজেও পুনরায় হাসিয়া ফেলিল।

করুণা। তুই নিজে নিজেই হাস্‌ছিস্ আবার পরের ওপর 'তম্বি'।

শ্রীশ। বিকাশ অমন কথা বলে কেন? আমাদের বাঙ্গালীর নাড়ী স্বভাবতই একটু ঢিলে, ওর সে কথা ভাবা উচিত ছিল।

মায়া। বিকাশবাবুর দোষ নেই, তুমিই আজ কিছু অতিরিক্ত খোস্-মেজাজে আছ, আর তার কারণও আমি জানি। কিন্তু বল্‌ব না।

'জানি।—কিন্তু বল্‌ব না' বলিলে শ্রোতাদিগের মধ্যে যে অশান্তির উদ্রেক হয়, তাহা প্রত্যেকের মুখেই ফুটিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র বলিলেন—কি হয়েছে রে মায়া?

মায়া। আচ্ছা, শুধু আপনাকেই বল্‌ছি মেসো-মশাই। এবারকার এশিয়েটিক সোসাইটির জার্‌নেলে শ্রীশ-দা'র একটা নির্ঘণ্ট বেরিয়েছে—

শ্রীশ। তোর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে মায়া।

মায়া বিশেষ বিচলিত না হইয়া বলিল—আর জানেন মেসোমশাই, ডাঃ বুশে সেই নির্ঘণ্টের তারিফ ক'রে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়ে শ্রীশ-দা'র উর্ব্বর মস্তিষ্কের ঘিলু, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন করেছেন। তাঁর মতে এমন মাথা নাকি বাংলাদেশে আর নেই!

মায়া ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলিয়া শ্রীশের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল—নির্ঘণ্টের বিষয়টা কি জানেন মেসো-মশাই, র‍্যাম্‌ফিশিস্‌কি-আমস্‌লোপোঘিয়াস্ যখন ইজিপ্টের রাজা, তখন প্রবল পরাক্রান্ত ডেবানাগাঙ্গিনোলোসোকোপোঅসুর এসিরিয়ার সিংহাসনে ছিলেন। উভয়ের রাজত্বকাল যে ঐতিহাসিকগণ ৬০০০ বি, সি, ব'লে নির্দ্ধারিত করেছেন, শ্রীশ-দা'র মতে, তা আসলে হচ্ছে ৪৯ এ, ডি। আর সেই সময়ে ঘনরিংরিংদ্রাড়িম্বকাসুর ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একছত্র অধিপতি। ইনি এসিরিয়া হ'তে বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পরে রামচন্দ্রের সেনার হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে গতাসু হন।

এই স্ব-কপোল-কল্পিত অত্যন্ত উদ্ভট ব্যাপারটি এমন ভাবে মায়া বলিয়া গেল যে, বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুই ধরিতে পারিলেন না এবং বর্ণনার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—Quite interesting! সত্যি ঐ Egyptology জিনিষটা আমাদের দেশে আজও কেন যে সম্মান পেল না, তাই আশ্চর্য্য লাগে।

মায়ার হাতের একটি ছোট চিম্‌টি খাইয়া বিকাশও এই প্রত্নতত্ত্বে নামিয়া পড়িল। বলিল—কিন্তু ডাঃ বুশে কি তারিখ সম্বন্ধে শ্রীশবাবুর মতই sanguine? কিন্তু ডাঃ সিন্‌টারনিট্‌জ্‌-এর একটা লেখায় যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে যে, রামায়ণের রচনা-কাল ঠিক না পাওয়া গেলেও মোটামুটি ভাবে ৪০০০ বি, সি-র পূর্ব্বে বলা যেতে পারে। এ, ডি, নয়।

মায়া। তা হবে। আমার তারিখটা ঠিক মনে নেই শ্রীশ-দা কি দিয়েছে। আর জানেন মেসো-মশাই, আমাদের ওরিয়েণ্টাল আর্টে যে 'স্যারাসেনিক' প্রভাব আমরা দেখ্‌তে পাই, তা ঘনরিংরিংদ্রাড়িম্ব-কাস্থরের আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ-দা দেখিয়েছে যে, গান্ধার, বারহুৎ প্রভৃতির অতি প্রাচীনতম শিল্পে এই স্যারাসেনিক প্রভাব আজও জীবন্ত রয়েছে।

এত বৃহৎ একখানি ঐতিহাসিক তথ্য সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া একটি সন্দেশ মুখে পুরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মায়া শ্রীশের দিকে তাকাইল।

বিকাশ মায়ার দিকে একবার তাকাইয়া তাহার চোখের ইঙ্গিতে উৎসাহিত হইয়া বলিল—কিন্তু পৃথ্বীশ ঠাকুর প্রমুখ ওরিয়েণ্টাল আর্টের মহা মহা পাণ্ডারা শ্রীশবাবুকে এর জন্যে সহজে ছাড়্‌বেন না মনে হয়। তাঁদের মতে ওটা একেবারে বিশুদ্ধ জিনিষ। বিশুদ্ধকে ভেজাল বল্‌তে—

বীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—ভেজাল কথাটা ঠিক নয় বিকাশ। influence বলা যেতে পারে। Oriental Art-এ যদি Greek বা Saracenic influence থাকে তাতে লজ্জা পাবার কি আছে? তা ছাড়া New School of painting-এর অনেক ছবিতেই আমি ত 'চাইনিজ ইন্‌ফ্লুএন্স' দেখ্‌তে পাই। অবশ্য আমি যদিও কিছু বুঝি না। শ্রীশের লেখাটা আমাকে একবার দেখ্‌তে হবে।

বিকাশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া মিনতি-পূর্ণ চোখে মায়ার দিকে তাকাইয়া জানাইল—আর বেশী দূর গিয়ে কাজ নেই—

মায়া বলিল—শ্রীশ-দা ঠিক Oriental Art-এর ওপর যে ঝোঁক দিয়েছে তা মনে হয় না, art-টাকে সঙ্গে রেখেছে মাত্র দৃষ্টান্তের জন্য। আর এ দৃষ্টান্তটা ডাঃ বুশেও মেনে নেন নি। তিনি লিখেছেন—I don't quite agree with Mr. Mitra about the Assyrian prince who settled in India, and don't think the prince has anything much to do with the art. Rather I believe the foreign influence came with the Greeks during and after the reign of Chandra Gupta.

বীরেন্দ্রনাথ। There you are! 'Influence'! ডাঃ বুশেও স্বীকার করেছেন সে কথা।

বিকাশ। ডাঃ সিন্‌টারনিট্‌জ্‌-ও করেন।

মায়া। কিন্তু এই সব বিদেশী পণ্ডিতরা যেমন—I don't quite agree—' ব'লে ছেড়ে দিলেন, আমাদের অজয়চন্দ্র, গোপালদাস প্রভৃতি দেশী পণ্ডিতরা তাঁদের মতের সঙ্গে না মিল্‌লে Ancient civilization'-র নথি আর Ancient coins-এর তোড়া শ্রীশ-দা'র নাকের ওপর ছুঁড়ে মেরে দেবেন—'মূর্খ', 'অর্ব্বাচীন', 'বাতুল'! আর যদি একান্ত স্নেহের

চক্ষে দেখেন, তাহ'লে বল্‌বেন—'অজাত-শ্মশ্রু'। শ্রীশ-দা, বেশ ত ছিলে এতদিন, আবার কেন ঐ সব শিলালিপির মধ্যে গিয়ে পড়্‌লে? শেষ কালে প্রফেসর্ মূচেল্‌করের মত উল্টো ক'রে শিলালিপি পড়ে thesis লিখ্‌বে, আর লোকে বল্‌বে—

তাঁতি খাচ্ছিল বেশ তাঁত বুনে
কাল হ'ল তার ষাঁড় কিনে!

মায়ার এই মন্তব্য প্রকাশের পর টেবিলে উপবিষ্ট সকলের উচ্চ হাসির সঙ্গে ঘরখানি ভরিয়া গেল।

বীরেন্দ্রনাথ, Bad—bad, Very bad মায়া, বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাসিতে লাগিলেন। এবং মায়ার কৌতুক করিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া স্বর্ণ হাসিতে উছলিত মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—বাঁদর মেয়ে, ও না তোর দাদা?

বীরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন—না বড়-দি, I support মায়া। But this is puzzling, very puzzling indeed! You are all pulling my legs or what?—কি বিকাশ, মাথা নীচু কর্‌ছ যে?

বিকাশ মায়ার দিকে তাকাইল। মায়ার মুখ নির্ব্বিকার! সে চাম্‌চে করিয়া 'কাষ্টার্ড' মুখে দিতেছে। নিরুপায় হইয়া বিকাশ বলিল—শ্রীশবাবু Ancient civilization-এর ওপর যে thesis লিখেছেন তা সত্যি, আর তা নিয়ে antiquarian-দের মধ্যে বেশ যে একটা আন্দোলন চল্‌ছে তাও সত্যি কিন্তু মায়া-দি যা বল্‌লেন, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মায়া। You traitor!

বীরেন্দ্র উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিয়া বলিলেন—You scamps, but don't fight. I will sleep better to-night! অনেক দিন এমন ক'রে হাস্‌তে পাই নি। কিন্তু কি নাম বল্‌লি রে ঐ রাজা তিনটের? আর একবার বল্ ত।

মায়া হাসিয়া বলিল—মনে নেই।—শ্রীশ-দা রাগ হ'ল?

শ্রীশের রাগিবার কোন কারণ নাই। সে এই মায়াবিনী, এই কৌতুক-রসের উৎসকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার অফুরন্ত হাসি-কোলাহল দিয়া নিরানন্দের জগদ্দল শিলাটিকে সংসারের বুক হইতে ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই। হাসিয়া বলিল—না, রাগ হবে না, ইচ্ছে কর্‌ছে তোর জুল্‌পি ধরে ঘোড়্‌দৌড় করাই। বিকাশের সঙ্গে আগে থেকে ষড়্‌যন্ত্র করা হয়েছিল!

মায়া। কখন না।

দীপ্তি। কখন না? না দাদা, বিকেল থেকে দুজনে মিলে পড়্‌ছিল তোমার লেখাটা, তারপর দিদি বল্‌ল—

মায়া। 'দিদি বল্‌ল,'—উনুনমুখী! আমি কি বিকাশবাবুকে শিখিয়ে দিয়েছি কি বল্‌তে হবে? উনি ত নিজে থেকেই বলেছেন।

বিকাশ ধরা পড়িয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিল—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে।

বীরেন্দ্রনাথ। আরে কি বলে তার ঠিক নেই! এ রকম অন্যায় রোজ রোজ কিছু হ'লে আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচ্‌ব, with my tooth in the head.

আহারান্তে সকলে ড্রইং রুমে আসিয়া বসিতেই, দীপ্তিকে বাহিরে লইয়া গিয়া মায়া বলিল—এই শোন্, তুই গেটের কাছে ঐ হেনা গাছটার পিছনে লুকিয়ে থাক্ গিয়ে, শ্রীশ-দা'কে জব্দ করবার একটা

plan করেছি। কিন্তু খবরদার, আমি না আসা পর্য্যন্ত নড়বি না।

দীপ্তি। তোর জ্বালায় আর পারি না। কি আবার plan মাথায় এল ?

মায়া টানিয়া দীপ্তিকে পথে নামাইয়া দিয়া বলিল—যা ছুটে, বেশী কত্তাত্তি করতে হবে না।

দীপ্তি তাহার দিদিকে ভাল করিয়াই চিনে, সে আর প্রতিবাদ না করিয়া যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মায়া ড্রইং রুমে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কি বিকাশবাবু, আপনার ঘড়িতেও আটটা বেজে সাত মিনিট হ'য়ে আছে নাকি ?

বিকাশ তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাইল—দশটা বাজিতে তুই মিনিট বাকি! দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ইঃ, অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আসি।

করুণা বলিলেন—তুমি কি ক'রে যাবে ? আমাদের গাড়ীটা—

বিকাশ। কিছু না, কোন দরকার নেই, এইটুকু হেঁটে গিয়ে সারকিউলার রোডের মোড় থেকে একটা কিছু নিয়ে নেবো, আসি।

মায়া বিকাশের সহিত গাড়ীবারান্দার নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—আর পিছনে তাকাতে হবে না, দীপ্তি ওপরে গেছে। আচ্ছা এক অকবির পাল্লায় পড়েছেন, বিদায়-বেলার শেষ চাহনির মর্ম্ম পোড়ারমুখী বোঝে না! দেখুন, আপনি যাবার সময় ঐ ডানদিককার হেনার ঝাড় থেকে কিছু ফুল নিয়ে যাবেন, ঘরে রাখলে রাতে বেশ গন্ধ দেয়। নমস্কার, ফুল নিয়ে যাবেন কিন্তু, ভুলবেন না—

বিকাশ নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইতেই মায়া উঠিয়া আসিয়া একটি থামের আড়ালে দাঁড়াইল।

মায়ার আদেশমত বিকাশ হেনা গাছের ঝাড়ের নিকট আসিয়া দীপ্তির উপরের ঘরের দিকে তাকাইয়া আন্‌মনে ফুল ছিঁড়িতে গিয়া বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিয়া ফেলিল।

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—পোড়ারমুখী কি শয়তান! আমায় বল্‌ল—

বিকাশ এক গুচ্ছ ফুল ছিঁড়িয়া দীপ্তির হাতে দিয়া ফুলসুদ্ধ তাহার হাতখানি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহা আপনার মুখের কাছে তুলিয়া আনিয়া মুখ রাখিতে গিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া ত্রস্ত পদে ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিকাশের এই বালক-সুলভ দ্বিধা বা লজ্জা দীপ্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে হাতখানি আপনার মুখের কাছে তুলিয়া কম্পিত বক্ষে ফুলগুলিকে চুম্বনে অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা বিকাশ তাহাকে বলিয়াছিল, জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কিছু নেবো না, তুমি দিলে তবে নেবো।

পুরুষ কেন এমন হয়? শক্তি, সুযোগ, সুবিধা তাহার আয়ত্তের মধ্যে থাকিতেও কেন সে তাহা ব্যবহার করিবে না? দীপ্তির মনে হইল বিকাশ এমন করিয়া তাহার অনুমতির অপেক্ষায় না থাকিয়া যদি—হাঁ যদি আজ তাহাকে চুম্বন করিত, সে একটুও রাগ করিত না, অসন্তুষ্ট হইত না।—খুব ভাল লাগিত।

দীপ্তির চিন্তার মধ্যে মায়া কখন্ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহার চমক ভাঙ্গিল মায়ার কথা শুনিয়া—ঢের হয়েছে, আর সঙের মত দাঁড়িয়ে কি হবে?

দীপ্তি। আমি ইচ্ছে ক'রে ওকে—

মায়া। ইচ্ছে অনিচ্ছে জানি না, ওকে তাড়ালি এটা ত ঠিক?

দীপ্তি। ও চ'লে গেল যে!

মায়া। ন্যাকা! যাবে না? সারা রাত্তির তীর্থের কাকের মত হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? কখন তোমার দয়া হবে—ওকে চাস, না—না?

দীপ্তি হাসিয়া ফেলিল। মায়া বলিল—বল্ শিগ্‌গির—'

দীপ্তি। চাই।

মায়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—'চাই' আমাকে বলে কি হ'বে? আর দু-মিনিট আগে সে কথা ওকে বল্‌তে পার্‌তে না? তাড়িয়ে দিয়ে এখন মাথা খুঁড়ে মর্‌লে কি হবে? যা বেরো, ঘুমোগে যা।

দীপ্তি। তুই যাবি না?

মায়া। না, এখন আমার বর আস্‌বে, তাকে আদর কর্‌ব। সমস্ত দিন তাকে দেখি নি। যা পালা—

মায়া ধীরে ধীরে শ্রান্তভাবে একটি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। দীপ্তি মায়ার পাশে বসিয়া তাহার মাথাটি আপনার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—সমস্ত দিন দস্যি-বিত্তি কর্‌বি! খুব tired লাগ্‌ছে ত এখন?

মায়া তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া চোখ বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিল—উঃ disgusting! নরম নরম jelly হাত! থু-থু, মোটা চওড়া হাত, কাজ ক'রে ক'রে চামড়া শক্ত হ'য়ে গেছে, সেই হাত চাই। আমার কপালের ওপর সে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেবে, তার মনে ভয় জাগ্‌বে পাছে আমার কপালটা ফেটে যায়, আর আমি এম্‌নি ক'রে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাক্‌ব—'

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—মরণ আর কি! তোকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে! আমি পালাই বাবা—

দীপ্তি চলিয়া গেল। মায়া তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত মায়া প্রতিদিন এমনি অবিশ্রান্ত ভাবে আপনাকে সকলের সহিত মিশাইয়া, সকলের দিনগুলিকে আনন্দপূর্ণ করিয়া, রাত্রের অন্ধকারে আপনার শ্রান্ত শরীর ও মনটিকে লইয়া বাগানে বসিয়া থাকে। এ সময়ে সে দীপ্তিকেও কাছে রাখিতে চায় না। সে থাকিলে তাহার শ্রান্তি যেন দূর হয় না। রাত্রের এই স্তব্ধ নীরব মুহূর্ত্তগুলি আপনার ইচ্ছামত সে উপভোগ করিতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়,—একা।

দিনের বেলা দর্শন-শাস্ত্রের শুষ্ক পত্রগুলি চর্ব্বণ করিতে করিতে সে ছুটিয়া করুণা বা সুবর্ণের কোলে গিয়া বসে, কিছুক্ষণ তাহাদের আদর করিয়া বা আদর লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করে। পড়িতে পড়িতেই সে দীপ্তি এবং শ্রীশকে সহস্র প্রকারে বিরক্ত করে—দীপ্তি তোর গালে যে 'থোবা' 'থোবা' মাংস হয়েছে লো! শ্রীশ-দা'কে কিছু ধার দে না। শ্রীশ কাছে থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাটিয়াল সুরে গান ধরে :—

কার জন্যে ভাব রে মন
কার জন্যে ভাব?
তোমার জন্যে কেউ কি ভাবে?
ভূতের বেগার খেটে মর—
নাহি জান কি ভাবনা!—

শ্রীশ-দা, কৃচ্ছ্র-সাধন একটু কমাও না? কিম্বা কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার সময় শ্রীশের পরাজয় হইলে চীৎকার করিয়া সেই সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেয়—শ্রীশ-দা'টা হেরে গেল!

বীরেন্দ্রনাথেরও নিস্তার নাই। মায়া হাসিয়া বলিয়া উঠে—অ মেসো-মশাই, আপনার পায়ে দু'রকম মোজা! একটা সবুজ আর একটা নেভি-ব্লু! তাও আবার একটা উল্টো! হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া এক রঙের মোজা লইয়া আসিয়া বীরেন্দ্রনাথের জুতার ফিতা খুলিয়া ঠিক করিয়া পরাইয়া দেয়।

যখন তখন গান গাহিয়া উঠা তাহার স্বভাব। গান যখন গায়, তখন গানের কথা সম্বন্ধে কোন বাচ-বিচার করে না, কোন সঙ্কোচও তাহার মনে থাকে না। করুণা স্বর্ণ প্রভৃতির সম্মুখেই সে গাহিয়া উঠে :—

ভালবাসি ব'লে তাই তোমারে
দেখ্‌তে আসি প্রাণ।

স্বর্ণ বকিয়া উঠেন—আঃ মায়া, কি করিস্? লজ্জা করে না তোর?

মায়া বলে—সুরটা বেশ মা। সেদিন একটা গাড়োয়ান গাইছিল:—

দয়া মায়া নেই কি রে তোর
হ'লি রে পাষাণ!

যাই বল মা 'গজল'-এর মত প্রাণ-মাতান সুর খুব কম আছে।

মায়া কোন দিনই বাদ্যযন্ত্রের পক্ষপাতী নয়। তাহার বিশ্বাস, সমস্ত যন্ত্রই হয় নিজ গুণে, নয় বাদকের গুণে বেসুরা বাজে। তাহার

এই ধারণা বিকাশ বহু কষ্টে কিছু পরিমাণে সরাইয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু গানের সময় সে কোন যন্ত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন বোধ করে না। তাহার গলা কোন 'মজলিসে' যেমন তীব্র হইয়া উঠে, ছোট ঘরে তেম্‌নি শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া মানুষকে আকুল করিয়া তুলে। করুণা সময়ে অসময়ে বলেন—মায়া, একটা গা না মা—

হাসি, গান, কৌতুক, বিদ্রূপ, আলোচনা সমস্ত বিষয়ে মায়াকে চাই। আহারে বিশ্রামে মায়া না থাকিলে কাহারও মন উঠে না। মায়া সকলের, শুধু সে নিজের নয়। নিজের কথা ভাবিতে হইলে তাহাকে এমনি করিয়া চুরি করিয়া রাত্রের অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

এখন তাহার মুখে হাসি নাই, চোখে বিদ্যুৎ খেলে না, গালে লালিমা নাই! এই মায়াকে হয় ত কেহ চিনেও না।

সাম্‌নের জমাট অন্ধকারে শ্রান্ত দুটি চোখ মেলিয়া দীর্ঘশ্বাসের শব্দের মতই সে বলিয়া উঠিল—সমস্ত দিন নিজেকে দিয়েছি, এখন আমাকে কে নেবে ?—

কিছুক্ষণ পরে কঠিন হাসি হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে আপনিই তাহার উত্তর দিল, যম। এখন শুবি চল, নইলে ভোর থেকে রসের জোগান্ দিবি কি ক'রে ?

—২৭—

ভোর হইল। মায়ার নিত্য নবরসের জোগানও বন্ধ হইল না। এই ধনী পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা যে 'হাসির' অভাব ছিল, সে হাসিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হাসি, হাসি, হাসি! কাহারও না-হাসিয়া

উপায় নাই। হাসিতে হাসিতে এখন সকলে অভিযোগ করে—আর হাস্‌তে পারি না রে বাবা! পেটে ব্যথা ধরে গেল—' সমস্তদিনের আনন্দ উপভোগ করিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া সকলে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে। সবাই তৃপ্ত, সকলের মনে আনন্দের রেশ অম্লান হইয়া বিরাজ করিতেছে। বীরেন্দ্রনাথ কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন—'Life worth living', করুণা নীরবে মায়ার মাথায় আশীর্ব্বাদ্ বর্ষণ করেন। সুবর্ণ তাঁহার গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া একদিন চন্দ্রকুমারকে চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন—ওগো তোমার মেয়েকে একবার দেখে যাও। ঠিক যেন ছোটবেলাকার তুমি—' দীপ্তি বলে—দিদি পোড়ারমুখী, তুই মর্।
দিনের পর দিন কাটিয়া যায়।

কিন্তু একদিন আর কাটিল না! সেদিন গোধূলি লগ্নে যে অন্ধকার নিবিড় হইয়া মিত্র-পরিবারের বুকে আশ্রয় লইল তাহা আর উঠিল না!

যে মায়াবিনী মায়া এতদিন মাকড়সার নিপুণতা এবং অধ্যবসায়ে এই পরিবারের চারি পাশে সুখের জাল বুনিতেছিল, সে শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল—সমস্ত বৃথা হইয়া গিয়াছে! কোথায় একটি গ্রন্থি, কোন্ অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে শিথিল হইয়াছিল, তাহার সমস্ত সাবধানতার দৃষ্টির অন্তরালে সে জানিতে পারে নাই, সহসা তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! এই সুখ-জালে যাহাদের যত নিবিড় ভাবে সে বাঁধিয়াছিল তাহারা তেম্‌নি ভীষণ ভাবে বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া অশান্তির কঠিন শিলায় আছাড়িয়া পড়িল!

বীরেন্দ্রনাথের চীৎকার শোনা গেল—Man—man! am I to believe my ears?—তুমি বিকাশ? তুমি বল্‌লে এ কথা?—

পিছনের দিকে দুই হাত বদ্ধ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বিকাশ ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল, শান্ত আবেগহীন কণ্ঠে বলিল—আজ বল্‌বার সময় হয়েছে, তাই বল্‌লাম আপনাদের কাছে।

বীরেন্দ্রনাথ শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—এই কথা ?—

বিকাশ। হাঁ।

সুবর্ণ বিকাশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—কি লজ্জা!

বিকাশ মুখ তুলিয়া করুণার দিকে তাকাইয়া বলিল—সব চেয়ে বড় সত্য ব'লে যা অনুভব করেছি, সত্য ব'লে যা বিশ্বাস করি, তাই বলেছি মা, আপনাদের অপমান কর্‌বার জন্যে নয়।

বীরেন্দ্রনাথ। নয়? এর চেয়ে জঘন্য অপমানের কথা আর হ'তে পারে?

বিকাশের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রাণ-পণে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল—কথা দিয়ে আপনাদের বোঝাবার শক্তি আমার নেই। দীপ্তিকে একবার ডেকে দিন্, সে হয় ত বুঝ্‌তে পার্‌বে আমার কথা—

বীরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—Shameless—relentless brute! You want to kill her!

ভক্ত-বিশ্বাসীর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায় উদ্ভাসিত মুখে বিকাশ বলিল—সে আমায় ভুল বুঝ্‌বে না, একবার তাকে ডেকে দিন্।

বীরেন্দ্রনাথ। আমার সাম্‌নে, করুণার বুকের ওপর তাকে অপমান কর্‌বে!—তুমি মানুষ!

বিকাশ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আশঙ্কা উদ্বেগে মাঝে মাঝে তাহার পা কাঁপিয়া যাইতেছিল।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ, তাই হোক। I won't be a tyrant father,—I love you, I love my children—বেয়ারা, ছোট দিদিমণিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

কথা কয়টি বলিয়া তিনি তাঁহার চেয়ারের মধ্যে এমন করিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন যেন বাহিরের এই একান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চান্।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—সে যদি এটাতে লজ্জার কিছু না দেখ্‌তে পায়, তার খুশী-মত কাজ সে করুক, আমি বাধা দেবো না করুণা।

বিকাশ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের বাহিরে যেন কাহার পাত্‌লা চটি জুতার শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে! কাহার চুড়ির শব্দ শোনা গেল! ঘরে কে আসিল! বিকাশের চোখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার হাত দুটি পিছনের দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গলাটিকে চাপিয়া ধরিল, যেন তাহার নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছে!

বীরেন্দ্রনাথ কাহাকে বলিয়া উঠিলেন—না, ঐ খানেই দাঁড়াও—বিকাশের সাম্‌নে—আমাদের কাছ থেকে আরো স'রে যাও।

বিকাশ মাথা তুলিয়া চাহিল।

দীপ্তি বিবর্ণ মুখে ভীতভাবে সকলকে দেখিয়া বিকাশের মুখের দিকে প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—বল বিকাশ, তোমার কি বল্‌বার আছে, শেষ কর—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ শাস্তি বেশীক্ষণ সহ্য হবে না আমার—'

বিকাশ দীপ্তিকে কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বা শব্দ বাহির হইল না। সে আবার মাথা নীচু করিল।

বীরেন্দ্রনাথ। পার্‌লে না?—you are ashamed?—আমি বল্‌ব সে কথা—I—a father?—বেশ। শোন দীপ্তি, বিকাশ বল্‌ছে—কোন সমাজের কোন পদ্ধতি বজায় রেখে ও বিয়ে কর্‌বে না। registration ও বিশ্বাস করে না, ওটাকে বিয়ের অপমান ব'লে মনে করে। ও শুধু তোমার হাত ধ'রে ওর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। আমার মত নেই। করুণার কি মত তা তুমি জিগ্‌গেস ক'রে নিতে পার। আমি তোমায় বাধা দিতে চাই না। খুশী হ'লে তুমি যেতে পার and live as X and Y living—living dead to the world. Have your choice, girl, you are free—'

এতগুলি কথা হাঁফাইতে হাফাইতে বলিয়া তিনি পিতৃত্বের অধিকার এবং অভিমানকে আপনার বক্ষে চাপিয়া পুনরায় তাঁহার চেয়ারে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন।

করুণা এতক্ষণ নিঃশব্দে বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। এখন ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখানি বীরেন্দ্রনাথের হাতের উপর রাখিলেন। বীরেন্দ্রনাথ তাহা লইয়া অন্যমনস্কভাবে দুইহাতে এমন করিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন যেন তাহা একখণ্ড কাগজ কিম্বা কিছু!

প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে একদিন সুচারু এবং সন্ধ্যাতারা যেমন সকলের সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ বিকাশ এবং দীপ্তি ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

করুণা দেখিলেন—বিকাশের সর্ব্ব শরীরে সন্ধ্যাতারার অণু-পরমাণু যে নিদ্রিত ছিল এত দিন, তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া সুচারুর তেজস্বিতা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে!

বিকাশ ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দীপ্তির চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—বাবা-মা'র আশীর্ব্বাদের চেয়ে বিবাহের আর কোন বড় বন্ধন

আমি মনে ঠাঁই দিই না। যা বিশ্বাস করি না, লোকের মন রাখ্‌বার জন্যে তাকে এতখানি পবিত্রতার মাঝখানে এনে ফেল্‌তে পার্‌ব না। আমার মা-বাবা তা পারেন নি। এস দীপ্তি—

কিন্তু ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সন্ধ্যাতারা যেমন করিয়া সুচারুর দিকে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছিল আজ দীপ্তি তেমনি করিয়া বিকাশকে ধরিতে পারিল না। সে মুখখানিকে এমন সঙ্কুচিত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যেন লজ্জায় সে মরিয়া যাইতেছে। মাথাটিকে বুকের কাছে ঝুলাইয়া টলিতে টলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেই সঙ্গে বিকাশের প্রাণও যেন তাহার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র, করুণা, সুবর্ণ আপন আপন আসনে বসিয়া আছেন এবং বিকাশও তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পা দুটি যে তাহার শরীরের ভার আর বহিতে পারিতেছে না, তাহা তাহার মনে নাই!

পিছন হইতে আসিয়া বিকাশের দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মায়া ডাকিল—বিকাশ—'

প্রথম ডাকে কোন সাড়া না পাইয়া তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া মায়া পুনরায় ডাকিল—বিকাশ—'

বিকাশের ঘোর কাটিয়া গেল। নিমজ্জিত মানুষ যেমন করিয়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথম নিশ্বাস ফেলে, তেমনি করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যাকুল ভাবে সে মায়ার চোখের দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি, চেতনার তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিতেছে!

মায়া সুবর্ণের তীব্র ক্রোধের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বিকাশের একটি হাত এক হাতে জড়াইয়া অপর হাতখানি তাহার হাতের উপর বুলাইতে বুলাইতে বলিল—বিকাশ, তোমার এখান থেকে যাবার সময় হয়েছে—যাও।

মায়ার কথার প্রতিধ্বনির মত বিকাশ বলিল—যাবার সময় হয়েছে ?

মায়া। হাঁ বিকাশ। যে দুঃখ তোমার বুকে আজ বাসা বাঁধ্‌ল, তাকে অভিশাপ মনে ক'র না বিকাশ।

বিকাশ ম্লান হাসিয়া বলিল—না।

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় বীরেন্দ্র ও করুণার দিকে তাকাইয়া বিকাশ কি বলিতে যাইতেছিল, মায়া তাহার মুখ চাপিয়া মাথা অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিয়া বলিল—চরম বোঝা-পড়া হ'য়ে গেছে বিকাশ, করুণামাসী তোমার আর মা নয়, আমার মা তোমার সোনামাসী নয়। মেসো-মশাইকে তুমি অপমান করেছ।

বিকাশ দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল—তবু—

মায়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—না—না—না। কোন 'তবু' নেই, এর মধ্যে থাকতে পারে না। আমি এখনও তোমার পাশে আছি, যে মুহূর্তে তুমি অপরাধীর মত এঁদের কাছে এসে দাঁড়াবে, সেই মুহূর্তেই আমি তোমায় ছাড়্‌ব।

বিকাশ নত হইয়া মায়াকে প্রণাম করিয়া বলিল—এই শেষ আশ্রয়-টুকু আমার থাক্‌, আর কিছু চাই না। আমি বাঁচ্‌ব—পার্‌ব সইতে।

বিকাশের মাথার চুলের ভিতর হইতে আঙ্গুল তুলিয়া লইয়া মায়া বলিল—যাও।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে যতক্ষণ বিকাশকে দেখা গেল ততক্ষণ মায়া স্থির চোখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল। আর হাসিল না, গাহিল না, কৌতুকের একটি কথাও কাহাকেও বলিল না।

সে রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আহারে বসিবার সময় সকলের মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশের বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার আহারে রুচি চলিয়া গেল। কোন মতে কয়েক মিনিটকাল ডিসে রক্ষিত দ্রব্যগুলি নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিল। এবং অল্পক্ষণ পরে একটি ছোট রেকাবিতে করিয়া ভাজা মশ্‌লা লইয়া মায়া আসিয়া বলিল—মশ্‌লা না খেয়ে চলে এলে যে?

সে নিজেও কিছু তুলিয়া মুখে দিল।

শ্রীশ মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—হ'ল না, না?

মায়া। না। তোমাদের 'principle' আর 'honour' মায়ার সমস্ত মায়াকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ীর হাসিও চিরবিদায় নিল শ্রীশ-দা।—ভাল কথা, তোমাকে একটি কাজ কর্‌তে হবে, আমাদের কর্পূরীটোলার বাড়ীটা সারান শেষ হয়েছে কি?

শ্রীশ। হয়েছে—কেন?

মায়া। কাল ভোরেই আমি সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে চাই। এখানে আমার পড়াশোনার ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে শ্রীশ-দা।

শ্রীশ আরক্ত চোখে অন্যমনস্কভাবে বলিল—তুই যাবি মায়া?—

মায়া। আর উপায় কি? পরীক্ষার আর ক'দিনই বা বাকি আছে!

শ্রীশ। কিন্তু একা থাক্‌বি কি ক'রে?

মায়া। এই ক'টাদিন কোন মতে কাটাতেই হবে। বাবা সম্ভবত সাতাশে তারিখের আগে আস্‌তে পার্‌বেন না, লিখেছেন।

এই ক'দিনের জন্যে কমলাকে আমার কাছে রেখে দেবো ভাব্‌ছি। সুবিধে হ'লে তুমি রাতে গিয়ে ওখানে থেকো।

শ্রীশ। বেশ যা। আর কতদিন তোকে ভাঙ্গিয়ে খাব বল্‌?

কথা কয়টি বলিয়া শ্রীশ হাসিয়া উঠিল। সে হাসি এত শুষ্ক যে মায়াও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে সরিয়া আসিয়া শ্রীশের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—তুমি যাবে ত?

শ্রীশ। নিশ্চয়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলেই ছুট্‌ব তোর কাছে।

মায়া। আমি আরো যাচ্ছি শ্রীশ-দা, এখানে থাক্‌লে বিকাশকে দেখ্‌তে পাব না। আমি ছাড়া তার আর কে আছে বল?

মায়ার চোখ হইতে জল গড়াইয়া তাহার গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

শ্রীশ মায়ার হাতখানি আপনার উত্তপ্ত কপালে একবার চাপিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যা, একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর্‌ গে। আমিও শুয়ে পড়ি, আর পার্‌ছি না—'

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইল দীপ্তি! সকালে চা খাইবার পর সে করুণার আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া আপনার আঁচলে বাঁধিল। ভাঁড়ার ঘরে আসিয়া বাবুর্চ্চিকে রন্ধনের সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া নূতন গৃহিণীর মত ভারি ভারি পা ফেলিয়া চাবি ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ করিতে করিতে উপরে কি করিতে আসিয়া দেখিল মায়া তাহার জিনিস পত্র বাছিয়া লইতেছে। ঘরের মেঝেয় দুইটি ট্রাঙ্ক খোলা রহিয়াছে। সে কোন কথা না বলিয়া সেইখানে বসিয়া একটি ট্রাঙ্কে মায়ার সমস্ত বই খাতা ভর্ত্তি করিল। অন্যটিতে মায়ার কাপড়-জামা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজাইয়া দিল।

কমলা এবং তাহার সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া শ্রীশ আসিলে চাকরদের ডাকিয়া দীপ্তি মায়ার দ্রব্যগুলি একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বোঝাই করিবার আদেশ দিল। তাহার পর মায়ার মুখচুম্বন করিয়া দীপ্তি হাসিয়া বলিল—যদি এর পরও ফেল্ হয়ে মরিস্ তোর মুখ দেখ্‌ব না।

মায়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই স্বর্ণ কঠিন স্বরে বলিলেন—এর মানে?

মায়া। ও বাড়ীতে যাচ্ছি মা।

স্বর্ণ। উনি আসা পর্য্যন্ত সবুর সইল না?

মায়া। সবুর কর্‌লে ফেল্ হ'য়ে মর্‌ব। এখানে আমার অসুবিধে হচ্ছে মা পড়া-শোনার।

স্বর্ণ। কিন্তু আমি এখন এখান থেকে যেতে পার্‌ব না—কি ক'রে থাক্‌বি?

মায়া। কমলা রইল আমার সঙ্গে। রাতে শ্রীশ-দা থাক্‌বে।

স্বর্ণ। খাবি কি? হাওয়া?

মায়া। শ্রীশ-দা'র কার্‌খানার একজন লোক সব বাজার-হাট কর্‌তে গেছে। রাঁধ্‌বার লোক যত দিন না পাই, কমলাই কর্‌বে সব।

স্বর্ণ। টাকার দরকার আছে, না, না?

মায়া। নেই আবার?—দাও না মা কিছু।

স্বর্ণ। আমার কাছে এখন কিছুই নেই।

মায়া। তাহ'লে শ্রীশ-দাই উপস্থিত আমার banker হ'ল। শ্রীশ-দা, payable, when 'able', কেমন?

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

স্বর্ণকে চুম্বন করিয়া করুণার মুখের নিকট মুখ বাড়াইয়া দিতেই তিনি মায়ার মাথাটি আপনার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

বীরেন্দ্রনাথের ঘরে আসিয়া মায়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহার খাতাপত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাগিয়া বলিলেন—কোথায় যে রাখে সব, কিছু ঠিক পাওয়া যায় না! আমার pencil-টা ?—

মায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, প্রাণপণে হাসিয়া সহজ স্বরে বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ঐ ত তোমার হাতে মেসো-মশাই।—আমি যাচ্ছি।

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে শেল্‌ফ্ হইতে কি বই আনিতে ছুটিলেন।

মায়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে যদি ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে দেখিত, বীরেন্দ্রনাথ একটি চেয়ারে বসিয়া হাত দুটিকে মুচ্‌ড়াইয়া যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার চোখ হইতে অজস্রধারে জল ঝরিতেছে।

* * * *

বিকাশ এবং মায়া মিত্র-পরিবার হইতে বিদায় লইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই 'মিসেস্ ডি—' সম্প্রদায়ভুক্ত জীবগুলির মধ্যে আবার এক নূতন চাঞ্চল্যের আভাস দেখা গেল। তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেক সহৃদয়া আপনা হইতে ঘন-ঘন করুণার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। পাশে যে ছোট বাক্সটিতে Dr. and Mrs. Mitra not at home লেখা ছিল তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

এবং দেখা করিয়া ফিরিয়া গিয়া সমাজের সুনাম রক্ষায় অধীর আগ্রহে বলিতে লাগিলেন—দিনে দিনে সব হ'ল কি ? আরো কত দেখ্‌তে হবে কে জানে ! ওমা কি ঘেন্নার কথা। মায়াটা ওদের বাড়ীতে একা আছে, আর যে ছোঁড়াটাকে ডাক্তার মিত্তির জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই ছোঁড়াটা সেখানে রোজ যায় ! সোনার সঙ্গে মায়ার ত মুখ দেখা-দেখি নেই !

এই আলোচনা শুধু মিসেস্ ডি—' সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না। সাধারণেও শুনিল এবং আপন আপন মতামতও প্রকাশ করিল।

একদিন খাইবার সময় কমলা মায়াকে বলিল—শুনেছিস্ ?

মায়া। কি ?

কমলা। লোকের কথা ?

মায়া জলিয়া উঠিয়া বলিল—Gossip rats! লোক ?—মানুষ ওরা ? ওরা যদি মানুষ হ'ত, বাড়ীতে গিয়ে ওদের ঝেঁটিয়ে আস্‌তাম।

কমলা কোন উত্তর দিল না।

মায়া বলিল—ঐ মা-হারা ছেলেটার আমি মা। তারামাসী ওকে অসহায় ফেলে গেছে, কিন্তু ও অসহায় নয়। আমি আছি এখনও বেঁচে ! যে মা কলঙ্কের ভয় করে, সে মা নয়। লাগুক কত কলঙ্ক লাগ্‌বে আমার গায়ে, ওরা আমাকে একেবারে কালো করে দিক্। আমার এতটুকু দুঃখ নেই কমলা। আগে বিকাশকে বাঁচিয়ে তুলি, ও বেঁচে উঠুক—ও নিজের হাতে আমার গায়ের কলঙ্ক মুছে দেবে। যদি না বাঁচে, মায়ের কলঙ্ক বুকে নিয়ে আনন্দ ক'রে আমিও মর্‌ব।—আমার কাছে থাক্‌তে তোর সঙ্কোচ হয় ?—

মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা বলিল—তুই জানিস্ আমাকে তবু বল্‌বি ঐ সব—'

সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মায়া হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—আর বল্‌ব না, আমার ওপর অভিমান করিস্ নি কম্‌লি—'

—২৮—

গ্রীষ্মকালে কলিকাতা শহরে, উষাদেবীর স্নিগ্ধ-ছবি বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার কনকাঞ্চলখানি নীল আকাশের গায়ে মেলিবার বহু পূর্ব্বেই যেন জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা সহস্র জিহ্বা দিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে! ভোরের পথিক পথ চলিতে চলিতে আতঙ্কে শিহরিয়া বলিয়া উঠে—'রাত না পোহাতে পোহাতেই রোদ উঠেছে দেখেছ? যেন খাই খাই কর্‌ছে! এখনও সমস্ত দিনটা প'ড়ে রয়েছে।' এই ভোরের বেলাতেই তাহারা পথের ধারের গাছগুলির ছায়ায় ছায়ায় যাইবার জন্য একদিক হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতে থাকে, মাঝ-পথের ধূলা ইহারই মধ্যে তাতিয়া উঠিয়াছে!

এমনই এক সকালে মিত্র-পরিবারের চায়ের পাট্ ব[illegible]ছিল বাড়ীর পিছন দিককার একটি বারান্দায়। ঘরের ভিতরকার পাখার বাতাস অপেক্ষা এখানকার খোলা হাওয়া বেশী শীতল বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সাম্‌নে টেনিস্‌-কোর্ট, ছাঁটাই-করা ডুরেণ্টা গাছের বেড়া এবং ঘন-সবুজ আম গাছের পিছনে একটি সঙ্কীর্ণ লাল খোয়া-বিছান পথ, এই পথের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এক জলাভূমি। তাহাতে জলের লেশ মাত্র নাই, স্থানে স্থানে মাটি ফাটিয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট বাঁশ ঝাড়, নারিকেল গাছ, এবং দু-একটি লতা-গুল্মের ঝোপ। পথের এক পাশে একটি সরকারী কল, সেখানে ভীড় করিয়া সর্ব্বদেশীয়া এবং দেশীয় নারী ও পুরুষ কলসী বা লোটা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা বাল্‌তি ভরিয়া জল লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া প্রাতঃস্নান সারিয়া লইতেছে। কোনও শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীর মনে হইয়াছে ঐ জল বুঝি তাহার শরীরে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে এবং মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে তীব্র ভাবে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার বহু দূরে ঘটিলেও মিত্র-পরিবারের এই বারান্দা হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং কলহ ইত্যাদির শব্দও আসিয়া পৌঁছে।

চা পান শেষ করিয়া করুণা এবং সুবর্ণ অন্য কোন কাজে গিয়াছেন। শ্রীশ কিছু দিন হইতে বাড়ীতে নাই, বিশেষ প্রয়োজন হইলে আসে, কাজ কর্ম্ম সারিয়া বেশীর ভাগ সময় কারখানায় কাটায়, রাত্রে মায়া এবং কমলার চৌকিদারী করে। আর একটি জিনিষ প্রায়ই সে করিয়া বসে, তাহার জন্য সুবর্ণের নিকট সে তীব্র মন্তব্য শ্রবণ করিয়াছে, এবং শ্রবণ করিবার পর হইতেই সে অনেকটা সাবধান হইয়াছে। সাধারণত যখন সকলের আহার শেষ হইয়া যায় সে গৃহে ফিরে। এই বদ্‌ অভ্যাস তাহার বহুকাল হইতেই আছে। মায়া যখন ছিল তখন সুবর্ণ বা করুণার নিকট হইতে তাড়া খাইয়া হাসিয়া বলিত—আমি খেয়ে এসেছি মা—লাবু বৌ-দি কিছুতে ছাড়্‌লেন না।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক হাতে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে আর এক হাত পেটে রাখিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সাবধানে একটু চোখ টিপিত। ইহাতেই তাহার ক্ষুধার শান্তি হইতে বিলম্ব হইত না, অবশ্য এই ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনেই হইত।

বীরেন্দ্রনাথ উপরি উপরি শ্রীশের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দীপ্তিকে বলিলেন—শ্রীশটার কি হ'ল? থাকে কোথা, খায় কি, জানিস্ কিছু?

নানা রং-এর কাজ করা চীনা মাটির পাত্র ভাঙ্গা দিয়া চিত্রিত ভূমির উপর একটি কুশন্ পাতিয়া বীরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসিয়া দীপ্তি খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছিল। মাথা তুলিয়া বলিল—পরশুদিন দুপুরে একবার এসেছিল তার পর আর আসে নি।

বীরেন্দ্রনাথ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উদাসভাবে লাল পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপ্তি পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

এই সময় বেয়ারা একখানি ট্রেতে করিয়া একটা কার্ড বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিল। বীরেন্দ্রনাথ তাহা লইয়া দেখিলেন লেখা আছে—

Osit Coomar Biswas.

ইহারই নীচে ছোট ছোট বাঁকান ইংরাজী বর্ণমালার বহু বর্ণের সহিত (Edin); (Cantab.), (Lond.); প্রভৃতি বহু সাঙ্কেতিক শব্দ আগন্তুকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত বলিয়া দিতেছে।

কার্ডখানি হাতে করিয়া চিন্তিতভাবে পিতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীপ্তি বেয়ারাকে বলিল—বল্, এখন দেখা হবে না।

বীরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে কি বলে তার ঠিক নেই! যাও সাব্‌কো স্লাম্ দেও—দীপ্তি, তুই একটু যা, এইখানেই দেখা করব, আর উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

দীপ্তি অপ্রসন্ন মুখে কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে বলিল— কিন্তু যদি বেশী দেরী কর আমি বেয়ারাকে দিয়ে তোমায় ওপরে ডেকে পাঠাব।

পাশের ঘরে এই সময় একটি অপরিচিত ভারী জুতার শব্দ শুনিয়া দীপ্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, কিন্তু উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সে বিনয় সহকারে বীরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম হয় ত?—

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—কিছু না—কিছু না, বসুন।

বীরেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশিত চেয়ারটি আরো একটু কাছে সরাইয়া লইয়া উপবেশন করিয়া হস্তস্থিত কালোচামড়ার একটি portfolio সাম্‌নের টেবিলে রাখিয়া পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বীরেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া আগন্তুক বলিল—মিঃ এন্‌, এন্‌, হাল্‌দার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার নাম অসিত।

বীরেন্দ্রনাথ খামখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে হাসিয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন ঃ—

Dear Doctor,

The bearer of this letter is a miracle man. He seems to have dropped from the sky! But as I am not the suitable ground for him, I pack him off to you . . . Hope you will appreciate him better, I mean, his schemes. He is very rich in them . . . '

বীরেন্দ্রনাথ যখন পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন সেই অবসরে অসিত তাহার পোর্টফোলিও হইতে কাগজ-পত্রগুলি ধীরে ধীরে বাহির

করিতেছিল। বীরেন্দ্রনাথ পত্রখানি খামে বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই অসিত একখানি 'টাইপ'করা কাগজ বাহির করিয়া বীরেন্দ্রনাথের সাম্‌নে ধরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এই দেখুন, সাঁওতাল পরগণায় মুড়াকাটি জায়গাটা প্রায় সমস্ত বিনা খাজনায় দশবছরের জন্যে গবর্ণমেণ্ট আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছে, প্রায় দশ হাজার একর জমি, দরকার হ'লে আরও পাঁচ হাজার একর দেবে।—একেবারে সোনা ফলাবার জমি! আমার main crop হবে তুলো। ধার্‌ওয়ার আর গুজরাট অঞ্চলে যে তুলো হয়, আমার মনে হয় এখানে তার চেয়ে কিছু কম হবে না। অন্য কোন crop-এর কথা আমি এখনও ভাবি নি। আমার motto হ'চ্ছে, one at a time—জমি আমি পেয়েছি, লোকও আমি পাব, কিন্তু অভাব হচ্ছে দুটো জিনিষের, একটা হ'চ্ছে জল, দ্বিতীয় আর প্রধান হচ্ছে টাকা।

কথাগুলি বলিয়া অসিত তীক্ষ্ণভাবে বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি ডাঃ মিত্র, এ হ'তে বাধ্য, অবশ্য প্রথম বছর কিছুই আশা করতে পারি না, কারণ জমি তৈরী আর জলের ব্যবস্থা করতেই কেটে যাবে, কিন্তু second year থেকে চাষ হ'তেই থাক্‌বে।

বীরেন্দ্রনাথ বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। নাতিদীর্ঘ ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটি, মোটা মোটা হাতের আঙুল, দেখিলে মনে হয় অতিরিক্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডগার [illegible] ক্ষয়িয়া চৌকোন্‌ হইয়া গিয়াছে। বর্ণ কালো নয় কিন্তু রৌদ্রতাপের একটা ঝল্‌সানো ভাব আছে। মাথার চুল জার্ম্মান ধরণে ছাঁটাই করা। বেশ-ভূষা অত্যন্ত পরিপাটি এবং সাবধানতার সহিত পরিহিত, নড়িতে ফিরিতেও বিশেষ সতর্কতার ভাব দেখা যায়। প্রত্যেকটি crease-এর

কটপর যেন সর্ব্বদা তাহার দৃষ্টি আছে। দাড়ী গোঁফ কামান, চোখের দৃষ্টি কঠিন এবং সর্ব্বদাই যেন লোভনীয় কিছু দেখিতে পাইতেছে, যাহার অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই। কথা সংযত হইলেও উত্তেজনা এবং সময় সময় অধৈর্য্যের আভায় দেয়।

শিকারী যেমন তীব্র উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখে শিকার জালের দিকে আসিতেছে কি না, সেই ভাবে অসিত বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া অত্যন্ত ধীরে এবং হাল্কাভাবে বলিল—ডাঃ মিত্র, to float this I must have eighty laks, and in ten years I guarantee eight times eighty—

লক্ষপতি বলিয়া বাজারে পরিচিত হইলেও, বীরেন্দ্রনাথ আশি লক্ষের নামে যেন বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন। বলিলেন আশি লক্ষ! সে যে অনেক টাকা!—

অসিত। অনেক! বলেন কি? আশি লক্ষ অনেক টাকা? কিন্তু ডাঃ মিত্র, এ কথা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। আমি ইউরোপের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে দেখেছি। এ-রকম একটা কোন enterprising কাজে তাদের দেশে টাকার অভাব হয় না। তাই তাদের পক্ষে কাজটা সহজ, তারা সব কাজ করতে পারে, সব কাজে হাত দেয়। You won't be surprised Doctor, if I say, that I have already received twenty-five laks and it is safely deposited in the bank, twenty-five more have been promised by the princes and chiefs. কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা সকলেই বিদেশী। আমি আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙালীর sympathy পাই নি। কেউ বিশ্বাসও করে না আমায়, সম্ভবত আমাকে বোঝ্‌বার ক্ষমতা তাঁদের নেই ব'লেই। আপনি আজ পর্য্যন্ত famine, আর

flood relief committee-তে যত টাকা দিয়েছেন তার এ মোটামুটি account আমি যোগাড় করেছি, এর মধ্যে আপ উদারতার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি ব'লেই আপনার কাছে এসেছি কিন্তু ডাঃ মিত্র, ভিক্ষে দিয়ে মানুষকে কতদিন বাঁচাতে পার্‌বেন ভিক্ষের চাল কতদিন থাকে? তাদের কাজ দিন, তাদের খাটতে দিন; ঐ যে লোকগুলিকে এতদিন আপনারা সবাই মিলে বসি বসিয়ে খাওয়ালেন, কি লাভ হ'ল? আজও আবার তাদের খিদে পাচ্ছে, খেতে না পেলেই তারা আপনাদেরই গালাগাল দিচ্ছে! আপনার মত আমার যদি টাকা থাক্‌ত, আমি তাদের কাজ দিতাম, আমার সঙ্গে তারা কাজ কর্‌ত। দশ হাজার একর জমিতে তিন হাজার লোকের দিন রাত্রি পরিশ্রমের ফল ছয় মাসের মধ্যেই পাওয়া যেত। তখন আরো তিন হাজার লোককে কাজ দেবার কোন অসুবিধেই হত না। আমি sentiment-এর বাজে খরচ সহ্য কর্‌তে পারি না।

বীরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ভৃত্য একটি ছোট চিঠির কাগজে কি কয়টি লেখা আনিয়া তাঁহার সাম্‌নে ধরিল।

অসিত বলিল—আমি বোধ হয় আপনার সময় নষ্ট কর্‌ছি—

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—মোটেই তা নয় আপনি বসুন, ঠিক আপনার type-এর লোক এর পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। এ সব কথা ঠিক একদিনে ব'লে শেষ করা সম্ভব নয়। আ আস্‌বেন আবার, সকালেই সুবিধে—agriculture-ই আপনার এখন প্রধান কাজ তাহ'লে?—

অসিত হাসিয়া বলিল—প্রধান কর্‌তে চাই, কিন্তু বেঁচে থাক্‌বার জন্যে আরো দুএকটা কর্‌ছি—বলিতে বলিতে অসিত আর একখানি

কাগজ বাহির করিল, তাহাতে তূলা, কয়লা, লোহা, পিতল, চিনি, পাট, এমন কত জিনিষের বাজার-দর আছে, এবং প্রত্যেকটির গায়ে দরের ওঠা-নামা অর্থাৎ শতকরা কি ভাবে কম-বেশী প্রতিদিন হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা আছে।

Share market-এ বহুদিন হইতে বীরেন্দ্রনাথের মন বিকাইয়া ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলেন।

অসিত বলিল—সমস্ত গুলোতেই risk করা যায়, শুধু কয়লা ছাড়া। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, আজকাল railway কি ভাবে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। আপনার কেনা মাল বার ক'রে বাজারে আন্‌তে পার্‌বেন না—গাড়ী পাওয়া এক সমস্যার কথা। এই গোলমাল না থাক্‌লে খুব সুবিধে হ'ত। চিনির দর এখন নেমেছে, এই বেলা কিছু কিনে রাখ্‌তে পার্‌লে—

বীরেন্দ্রনাথের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—এখন বাইশ টাকা না?

অসিত। হাঁ, কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই সাতাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

বীরেন্দ্রনাথ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অসিতের সঙ্গে কথায় মাতিয়া উঠিলেন এবং ইহার মধ্যে আরো দুইখানি পত্র তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

সমস্ত সকাল অসিতের সহিত এই ভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বীরেন্দ্রনাথ আপনার মনের মধ্যে অত্যন্ত শান্তি পাইতেছিলেন। অসিত উঠিলে তিনি তাহাকে আবার কোন দিন আসিতে বলিলেন এবং তাঁহার যে এই প্রস্তাবগুলি বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাও বলিলেন।

বিদায় লইয়া যাইতে যাইতে অসিত ফিরিয়া আসিয়া বলিল—By the way ডাঃ মিত্র, আস্‌বার সময় আপনার garrage-এ ছুটো গাড়ী দেখ্‌লাম, খুব old model ব'লে মনে হ'ল। আমার কাছে কতকগুলো খুব ভাল up-to-date French car আছে, আমি যেটা এখন use কর্‌ছি সেটা একবার দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, জিনিষ কি রকম—আসুন না, আপনার গেটেতেই আছে।

বীরেন্দ্রনাথ অসিতের সহিত চলিতে চলিতে বলিলেন—আমি গাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। দরকার ছিল কিনেছি, কাজও চলে যাচ্ছে—তাই ত ভারী সুন্দর দেখ্‌তে ত আপনার গাড়ীটা!

অসিত। কিন্তু ওর গুণ ওর চেহারার চেয়েও ভাল। খুব কম তেল পোড়ে আর একেবারে troublesome নয়। খুব strong আর durable, আমি অনেকগুলো গাড়ী এ পর্য্যন্ত use করেছি কিন্তু এটাই সব চেয়ে ভাল লাগল—বলিতে বলিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া পায়ের নীচে একটি স্প্রীং-এ ঈষৎ চাপ দিয়া steering wheel-সংলগ্ন একটি যন্ত্র কয়েকবার নাড়িয়া দিল—এঞ্জিন চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করিয়া গাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

অসিত হাসিয়া বলিল—Good-bye Doctor.

বীরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিতেই দীপ্তি রাগিয়া বলিল—গেটের গায়ে আমি লিখে দেবো—Trespassers will be prosecuted—কি ছিনেজোঁক রে বাবা, তিন ঘণ্টা ধ'রে বকিয়ে মার্‌লে! Eighty laks গেল ত share market এল, তাতে সুবিধে হ'ল না ত মটর দালালি এল; আর কিছুক্ষণ থাকলে হয় ত বলত—আমি জমী বিক্রী করি, নয় ত—race-এর tip ব'লে দিই! কে ও লোকটা?

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—Man who knows himself.

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল অসিত মিত্র-পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন উপরি উপরি বীরেন্দ্রনাথের সহিত সকালে চা-পান করিল, তাহার পর করুণা ও সুবর্ণের সহিত পরিচিত হইল। কিন্তু দীপ্তিকে সে যেন দেখিয়াও দেখিল না! ইহার মধ্যে কোন তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল না, কিন্তু সে যে business man এবং 'আদব-কায়দা' ইত্যাদিতে সে যে একেবারে অনভিজ্ঞ ইহা সে বার বার স্বীকার করিত যদিও তাহার ব্যবহারে তাহা ছিল না।

করুণাকে উদ্দেশ করিয়া সে এক সময়ে বলিল—এক একটা দিন চ'লে যাচ্ছে আর আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি আমার কাজের কতখানি সে ক্ষতি ক'রে যাচ্ছে। Energy ক্রমেই যত কমে আস্‌ছে, difficulties-গুলো ততই প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে! কিন্তু আর দেরী করব না ভাব্‌ছি, খুব small scale-এ এই কাজ আরম্ভ করব এই গরমটা একটু কম পড়্‌লেই। আমি ওখানকার মাটি analyse ক'রে দেখেছি, তূলো ছাড়া, আরও কিছু হ'তে পারে; চিনেবাদাম, আলু, ডাল এ-সবও হবে মনে হয়, local market-টা যদি ঐ দিয়ে বজায় রাখ্‌তে পারি তাহ'লে অনেকটা সুবিধেও হবে।

এই সমস্ত কথার সঙ্গেই exchange বা share market-এর বিষয়েও অনেক কথা হইত এবং সপ্তাহ না যাইতে যাইতেই দেখা গেল বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন গাড়ী বেচিয়া নূতন গাড়ী খরিদ করিয়াছেন, চিনির কারবারে কয়েক হাজার টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং প্রতিদিন অসিতের সহিত অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কি সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা বীরেন্দ্রনাথকে বলিতে আসিয়া অসিত শুনিল, সকলে বাহিরে গিয়াছেন।

কথাটি অত্যন্ত 'জরুরী' ছিল সেই জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল।

কয়েকদিনের আসা-যাওয়াতে এবং মিত্র-পরিবারের সহজ ব্যবহারে অসিত আপনাকে এখানে অসঙ্কোচে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং তাহার এই সঙ্কোচহীনতার মধ্যে আত্মীয়তার আভাষও পাওয়া যাইত, বিশেষত চাকর বা বাহিরের লোকের সাম্‌নে সে এমন ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিত যাহা হইতে বুঝা যায় যেন তাহার বিশেষ কোন দাবীও আছে।

চাকরের দ্বারা মাঠে একটি চেয়ার লইয়া গিয়া সবেমাত্র সে তাহার সোনাবাঁধান হোল্‌ডারটিতে একটি সিগারেট সংলগ্ন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে এমন সময় রুক্ষমূর্ত্তি খদ্দরপরিহিত একটি লোককে বাড়ীতে ঢুকিতে এবং ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—কাকে চান?

রক্ষমূর্ত্তি মাথা তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল—আজ্ঞে না, কাকেও বিশেষ চাই না, তবে প্রায়ই এখানে আসি—

অসিত একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—আসেন? কৈ আমি ত আপনাকে কোন দিন দেখি নি!

রক্ষমূর্ত্তি। আমার দুর্ভাগ্য।

কথাটি অসিতের ভাল লাগিল না, বলিল—আপনি বোধ হয় খুব স্বদেশী? চেহারায় ত তার trade mark রয়েছে দেখ্‌ছি। আপনি smoke করেন? অসিত পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া রুক্ষমূর্ত্তির সম্মুখে ধরিল।

কিন্তু এমন সুন্দর জিনিষটির দিকে না তাকাইয়া রুক্ষমূর্ত্তি বারান্দার দিকে অগ্রসর হইয়া বেহারাকে বলিল—ওরে দিদিমণি ওপরে আছেন? —নেই, কি আশ্চর্য্য অথচ আমায় আজ এখানে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখেছে!

এই কথা কয়টির ফল ফলিল, এবং ফলিবে বলিয়াই রুক্ষমূর্ত্তি বলিয়াছিল।

অসিত বলিল—আপনি একটু অপেক্ষা কর্‌তে পারেন, আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা ফির্‌বেন। নয় ত আপনার নাম আমায় দিয়ে যান, আমি তাঁদের বল্‌ব।

রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—ধন্যবাদ। কিছু বল্‌বার নেই, এমন কোন দরকারও ছিল না, এমনি দেখা কর্‌তে এসেছিলাম। আপনি বুঝি এখানে প্রায়ই আসেন?

অসিত। হাঁ, আজ একটা বিশেষ দরকারী কাজের জন্যে wait ক'রে আছি। Dr. Mitra-কে আজ আমার চাই-ই। নইলে তাঁর business ভারী suffer কর্‌বে।

কথা কয়টি বলিয়া বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে রুক্ষমূর্ত্তির দিকে অসিত খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।

এই সময় বাবুর্চ্চি মহম্মদ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবু, ছোটা দিদিমণি আপনাকে একটু থাক্‌তে ব'লে গিয়েসেন, আপনি এখুনি যাবোন না।

রুক্ষমূর্ত্তি কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল—কিন্তু আমার ত আর দেরী কর্‌লে চল্‌বে না। মায়াকে পড়াতে হবে। আচ্ছা চল্, একটা slip লিখে যাচ্ছি।

বাবুর্চ্চির সহিত ঘরে আসিয়া রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—ও কে রে মহম্মদ?

মহম্মদ। কা জানি বাবু, লেকেন বড়া ভারী আদ্‌মী, সাহেবের সাথে কি কারবার করছেন! মটরগাড়ী ভী মোল্‌ দিয়া—

রুক্ষমূর্ত্তি হাসিয়া একটি কাগজে কি লিখিয়া মহম্মদের হাতে দিয়া বলিল—আচ্ছা এটা দীপ্তিকে দিস্‌।

মহম্মদ। কিছু খাবোন না বাবু?—

রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—না আমার দেরী হ'য়ে গেছে। আর একদিন আস্‌ব'খন, সবাই ভাল ত?

মহম্মদ। হাঁ হুজুর।

রুক্ষমূর্ত্তি বাহিরে আসিতেই অসিত গৃহকর্ত্তার মত হাসিয়া বলিল—আপনি চল্‌লেন তা হ'লে? কিন্তু excuse me, আপনার নাম ত জানি না, তাঁদের কি বল্‌ব?

রুক্ষমূর্ত্তি। বল্‌বেন কপূ'রীটোলা থেকে শ্রীশ এসেছিল। তা হ'লেই হবে। নমস্কার।

তখন একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে গৃহে ফিরিলেন এবং তখনও অসিতকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন—আপনার খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়, এক জায়গায় আট্‌কা পড়েছিলাম।—

অসিত। আপনাকে একটা খবর দেওয়া বিশেষ দরকার মনে হ'ল তাই ব'সে আছি।

বীরেন্দ্রনাথ করুণাকে বলিলেন—তাহ'লে এক কাজ [illegible] না করুণা, আজ Mr. Biswas-কে এখানেই খাইয়ে দাও, সেই বেশ হবে, চলুন আমার ঘরে।

করুণা হাসিয়া বলিলেন—ওঁর অসুবিধে না হলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

অসিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিল—না, আমার কাজ ছিল ডাক্তারের সঙ্গে—কোনই অসুবিধে হবে না। একটি নোংরা গোছের ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে Miss Mitra, খদ্দর পরা, খুব রুক্ষ চুল, আর পায়ে পেশোয়ারীদের মত জুতো, হাতে একটা মোটা লাঠিও ছিল। নাম বললেন শ্রীশ, কর্পূরীটোলা থেকে—

অসিতের কথা আর শেষ হইল না, বীরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, দীপ্তিও হাসিতেছিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—My son, Mr. Biswas, I am proud of him.

অসিত অবাক্ হইয়া বলিল—আপনার ছেলে? কিন্তু তিনি এমন ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করলেন যেন এ বাড়ীর তিনি কেউ নন্! বললেন, বিশেষ কোন দরকার ছিল না, এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। কি করেন উনি?

বীরেন্দ্রনাথ। কিছু না। I mean আমরা যাকে 'করা' বলি, ও তার ধার ধারে না। প্রথমে ছিল, Archaeological department-এ, Govt.-এর কাজ ব'লে কিছুদিন ক'রে ছেড়ে দিল। তারপর Ancient Civilization-এর ওপর এক লম্বা thesis লিখে university থেকে একটা chair পেল, তাও refuse করেছে। ওর এক খদ্দর তৈরী করবার কারখানা আছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।

অসিত গম্ভীর ভাবে বলিল—Funny!

বীরেন্দ্রনাথ। No doubt.

তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন।

করুণা প্রভৃতি সকলে চলিয়া গেলে, বীরেন্দ্রনাথ অসিতকে লইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া বলিলেন—Dinner-এর প্রায় এক ঘণ্টা দেরী আছে, এর মধ্যে আমরা আমাদের কাজটা সেরে নিতে পারি।

অসিত মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া একখানি নোটবুক বাহির করিয়া দেখাইল—এই সাতদিনের মধ্যে চিনি বাইশ টাকা হইতে তেইশ টাকা সাত আনা ন'পাই-এ উঠিয়াছে।

বীরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—তাহ'লে?

অসিত। আমার মনে হয় আর দেরী করা উচিত নয়।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ—thirty-five thousand, কি বলেন?—

অসিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার উদ্বেলিত বক্ষ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মন্দ কি? প্রথমটা দেখাই যাক্ না! আমি যেটা এঁচে আছি তাতে উঠ্‌লেই ওটা বেচে দেবো।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ আমি আপনার নামে cross cheque দিচ্ছি, আপনি draw ক'রে নেবেন—

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার ড্রয়ার খুলিয়া চেকবই বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

অসিতের দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার হাত দুটি প্রবল বেগে ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক একটি হাস্য-রেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। এবং চেকখানি হাতে পাইতেই তাড়াতাড়ি তাহা নোট কেসের মধ্যে পুরিয়া জামার ভিতরের পকেটে রাখিয়া হাসিয়া বলিল—I will let you know to-morrow doctor.

* * * *

সে রাত্রে ডিনার শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া অসিত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর

তাহার মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি একবার শূন্যে মেলিয়া অক্টোপাসের মত ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনিতে আনিতে বলিল—Half a kingdom ?—and why not the princess ?

পরের দিন সে আর বীরেন্দ্রনাথের কাছে আসিল না কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফোনে জানাইল—আজকের market price আরো এক টাকা দশ আনা তিন পাই বেশী হয়েছে, কিন্তু সবাই বল্‌ছে, দু একদিনের মধ্যেই আবার পড়্‌বে। আমরা বোধ হয় একটু বেশী দেরী ক'রে ফেলেছি, যাই হোক আপনার যদি না আপত্তি থাকে আমি একটু wait কর্‌তে চাই, কারণ কেন্‌বার পরই যদি দাম পড়ে যায়—

বীরেন্দ্রনাথ জানাইলেন—কিছু ব্যস্ত হবার দরকার নেই—stake it in the right moment.

ফোন্ ছাড়িয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া অসিত একরাশ ফাইল বাহির করিয়া কি সব দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে সমস্ত সরাইয়া রাখিয়া আপনার মনে যেন কোন একটি ছবি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—Yes, to put the legitimate right on the kingdom, I must win the princess and after that ?—long live my Schemes—

—২৯—

একদিন সমাজ-প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র একটি কথা ছড়াইয়া পড়িল—Dr. Mitra has fished a millionaire—the fish has tons of money . . .'

তাহার পরই রব উঠিল—কে-কে? কোথা থেকে এল? কার ছেলে—এবং তাহার সহিত আপনাদের অবিবাহিতা কন্যাদিগের প্রতি তাকাইয়া তাঁহাদের জনান্তিকে দীর্ঘশ্বাসও পড়িল।

কথাটি মায়ার কাছেও আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। কমলা বলিল—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। তুই দীপ্তিকে লিখে দেখ্।

কিন্তু লিখিতে হইল না, দীপ্তির একখানি চিঠি এই সময় মায়া পাইয়া সমস্তই জানিতে পারিল।

দীপ্তি লিখিতেছে :—

'দিদি আমি বিয়ে কর্‌ছি। মা বাবার মত আছে কি না ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না। বাবা বল্‌লেন—Do what you consider best. মা বল্‌লেন —ভেবে দেখ্ দীপ্তি। মাসীমা বল্‌লেন—আমি কোন কথায় নেই। কিন্তু মিসেস্ ডি—সেদিন খুব help করেছেন; তিনি বল্‌লেন, 'ঐ ছেলেগুলো যে অপমানের কালি তোমার গায়ে দিয়েছে তা বিয়ে না কর্‌লে যাবে না'—আমিও পুরুষের খেয়ালের খেলার পুতুল হ'য়ে থাক্‌বার ইচ্ছে মন থেকে বিদেয় দিয়েছি।

অসিতের কথার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই, কোন মিথ্যে উচ্ছ্বাস বা sentiment-ও না। বল্‌ল—আমি জীবনটাকে একটা business ব'লেই মনে করি। তুমি আমায় শান্তি দাও, আমি তোমার জন্যে সুখ খুঁজে এনে দেবো। তোমাকে পেলে আমার ভারি উপকার হবে, আমার কাজের উন্নতি হবে।

আমি মত দিয়েছি।'

মায়ার চোখ হইতে ধীরে ধীরে জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—ভেবে কি কর্‌বি?

কমলা বলিল—ভাব্‌ব না ? বলিস্‌ কি মায়া ? ও যে দীপ্তি ! ও যে জগতের কিছু জানে না, ওকে যে সবাই মিলে চালিয়ে এসেছে এত দিন, আর আজ তাকে 'Do what you consider best' ব'লে ছেড়ে দেবে ?

মায়া। হাঁ। চিরদিন কি চালান যায় কম্‌লি ? ও যে চল্‌তে আরম্ভ করেছে এবার নিজের থেকেই।

কমলা। দিস্‌ নি চল্‌তে।

মায়া। কেন ?

কমলা। ভুল পা ফেল্‌বে—ভয়ানক ভুল।

মায়া। ফেলুক, ভুল্‌কে ও চিন্‌বে। নইলে সত্যকেও চিন্‌তে পার্‌বে না।

মায়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটি কাগজে লিখিল—

দীপ্তি, আমি তোকে মেসো-মশাই-এর কথাটাই লিখ্‌ছি—Do what you consider best—

নাম স্বাক্ষর করিয়া মায়া কমলাকে বলিল—Let us think of the best—

কমলা উত্তেজিত ভাবে মায়ার হাত ধরিয়া বলিল—তুইও ছাড়্‌লি ওকে ?

মায়া। না, আমার একটা স্বার্থ আছে, সেটা পূর্ণ কর্‌তে চাই।

কমলা। কি স্বার্থ ?

মায়া। আমার ছেলেকে ও চিন্‌বে।

কমলা। এমনি ক'রে বাধা গ'ড়ে তোল্‌বার সহায়তা ক'রে ? তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ মায়া।

মায়া হাসিয়া বলিল—পুরুষের খেয়ালের খেলা . . . কি স্পর্দ্ধার কথা ! বিকাশের খেয়াল ?—আমি মা হ'য়ে সহ্য কর্‌ব এত বড় অপমান ?

মায়ার চোখ দুটি ধীরে ধীরে আবার রাঙ্গা হইয়া আসিল।

কমলা বলিয়া উঠিল—আমার ভাল লাগ্‌ছে না ভাই।

মায়া। আমার কি খুব ভাল লাগ্‌ছে? 'ভাল লাগা' বোধ হয় জন্মের মত চ'লে গেল!

কয়েক মাস ধরিয়া পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে করিতে মায়াব চোখ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন হইতে সে নিজে আর পড়িতে পারে না, দুপুর বেলা বিকাশ এবং সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীশ পড়িতে থাকে, মায়া শুনিয়া যায়। তাহার এই অসুস্থতার জন্য মায়া কিন্তু একেবারেই দুঃখিত নয়, তাহার মন তাহার শরীরের কাছে ইহার জন্য অনেকখানি কৃতজ্ঞ ছিল। এই অসুস্থতার সাহায্যে সে বিকাশ এবং শ্রী[illegible]কে অনেকখানি সময় কাছে পাইত। একজন ভাগ্যহত আর এ[illegible]জন ছন্ন-ছাড়া। দুইজনেই তাহার অত্যন্ত প্রিয়।

মায়ার জন্য যতটুকু সময় বিকাশ দিত সেই সময়টুকু দিন দিন তাহার কাছে অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া মনে হইতেছিল। ঐ সময় সে আপনার মনের সমস্ত ব্যথা বেদনা এবং গ্লানির হাত হইতে নিস্তার পাইত। শ্রীশ পাইত অনাবিল শান্তি।

কিন্তু সেদিন যথাসময়ে বিকাশ মায়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মায়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এ কি বিকাশ! নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে?—

বিকাশ ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল—কৈ না, আমি ত কিছু [illegible]র পাই নি—'

বিকাশকে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া মায়া তাহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া বলিল—কিচ্ছু খাওনিও নিশ্চয়?—

বিকাশ হাসিয়া বলিল—জ্বর হলে বুঝি খায়?

আ। বকিয়া উঠিল—রুগীর মুখে ডাক্তারীর ডেঁপোমি আমি সহ্য করতে রাজি নই,—কম্‌লি—

কিনা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—হুকুম করুন মহারাণী, কিছু গরম পর্দাঃ আলু, পেঁয়াজ ভাজা, খান দুই মাছের ফ্রাই আর এক বাটি দুধ-কষায়, আর—

বিকাশ ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তাহলে ঠিক মারা যাব! I am a sinner, not prepared to die—

মায়া গম্ভীরভাবে কমলাকে আদেশ করিল—নিয়ে এসো—

তিনজনেই এক সঙ্গে হাসিয়া ফেলিল। বিকাশ অনুনয় করিয়া কমলাকে বলিল—কিছু কম আন্‌বেন।

কমলা বলিল—বাপ্‌রে তা কি পারি! ক্ষুধার অন্ন চুরি ক'রে রাখ্‌ব, আমার তাহলে নরকেও জায়গা হবে না।

সে চলিয়া গেল। এবং অল্পক্ষণ পরে সমস্ত দ্রব্য একটি ট্রেতে করিয়া সাজাইয়া আনিয়া বিকাশের সম্মুখে রাখিল।

দুইদিক হইতে দুইজনের তাড়া খাইয়া বিকাশ আহার করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, সে মারা গেল না, উপরন্তু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল এবং বালকসুলভ সরলতার সহিত ইহা স্বীকার করিতে গিয়া দেখিল, মায়া তাহার আরক্ত চোখ দুটি অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইতেছে!

বিকাশ বলিল—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক্‌?—

মায়া বলিল—না, আজ আমার ইচ্ছে নেই।

এই সময়ে বাড়ীর দরজার কাছে একটি মটর থামার শব্দ এবং দরজায় মৃদু আঘাত শুনিয়া মায়া নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দীপ্তির সহিত তাহার চোখোচোখি হইল।

মায়া দুইটি কবাটে হাত দিয়া উন্মুক্ত স্থানটুকু জুমায়া, ইয়া রহিল। কোন কথা বলিতে পারিল না। বৃতে

দীপ্তি বলিল—সর্ ভেতরে যাই, বাড়ীতে ঢুকতে দিকিমল বোধ ক?

মায়া ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইতেই দীপ্তি ভিতরে অুচি, ঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে বলিল—তোর চিঠি পেয়েই চ'লে এলো, ওপরে চল্, আমার কিছু জান্‌বার আছে।

মায়া ছুটিয়া আসিয়া সিঁড়ির পথ আট্‌কাইয়া বলিল—তুমি একটু এখানে দাঁড়াও, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এস না।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় দীপ্তি শুনিল, মায়া তাহাকে 'তুমি' বলিল। সে কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে মায়া বলিল—আমি না আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ক'রে এখানে অপেক্ষা করলে বিশেষ বাধিত হব।—আমার বেশী দেরী হবে না।

কান্নায় এবং অভিমানে দীপ্তির বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে কোন উত্তর না দিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

উপরে আসিয়া একটা বিরক্তির ভাব মুখে আনিয়া মায়া বলিয়া উঠিল—আর পারি না বাবা, বাঁচা দায় হয়ে উঠেছে! বিকাশ, তুমি কিছুক্ষণের জন্যে বাবার পার্কের দিকের ঘরে গিয়ে ব'স না। আমার একটি বন্ধু এসেছেন দেখা করতে; অল্পদিন হল তাঁর বিয়ের ক হয়েছে, না জানি তার প্রেম-সাগরের নোনা ঢেউ কতই মায় খেতে হবে!—কমলার এস্রাজটাও ওখানে আছে, ইচ্ছে হলে বাজাতে পার।

বিকাশ যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—ইচ্ছে করছে আপনার বন্ধুটিকে ব'লে দিই—আর এ বাড়ীতে আসবেন না—বেচারী

কত আশা ক'রে আস্‌ছেন, আর আপনি তাঁর সম্বন্ধে ঐ মত প্রকাশ কর্‌লেন ? আমি হলে—

বিকাশ চলিয়া যাইতেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার উপর পর্দ্দা টানিয়া মায়া কমলাকে বলিল—দীপ্তি এসেছে তাকে এখানে নিয়ে আস্‌ছি।

কমলা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মায়া বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে দীপ্তিকে লইয়া ঘরে আসিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল—ব'স।

দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—আমি তোর কাছে থেকে ভদ্রতা শিখ্‌তে আসি নি, আমি এসেছি তোর মুখ থেকে শুন্‌তে চিঠিতে যে কথাটা লিখেছিস্ তার বাংলা অর্থটা।

মায়া হাসিয়া বলিল—ঠিক ঐ কথাটার বাংলা অর্থ যে কি হতে পারে তা জানি না। তবে একটা সাধু উক্তি আছে, আমার মনে হয় সেটা কতকটা পরিষ্কার ক'রে দিতে পার্‌বে।—শুন্‌তে চাও ?—

দীপ্তি। যথা ?—

দীপ্তির চোখের দিকে তাকাইয়া মায়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—'কর্ত্তব্য ভাবিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা,—যায় যাক্, থাকে থাক্ ধন, প্রাণ, মান রে—'

মায়ার এই কথার পর দীপ্তির অভিমান কমিয়া গিয়া মন অনেকখানি কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ, তা'হলে সকলেরই মতামত আমি পেলাম, তবে আমার ধারণা ছিল তুমি সকলের থেকে কিছু আলাদা, তোমার কাছ থেকে কিছু নতুন কথা শুন্‌তে পাব—আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে, তুমি আর দশ জনের থেকে কিছু আলাদা নও। কমলা, তুই আমাকে একটা কথা বল্‌বি ভাই ? মনে রাখিস্,

আমি এখন যে-জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে ভালমন্দ বিচার কর্‌বার শক্তি মানুষের থাকে না।

কমলা। কিন্তু বিচার ত তুই করেছিস্ দীপ্তি।

দীপ্তি। না বিচার নয়, কাজ, একটা কাজ ক'রে ফেলেছি, সেটাকে যদি বিচার বল আমি নিরুপায়—আমি জান্‌তে চাই সেটা কি অন্যায় হয়েছে?—

কমলা। সে কথা বলা কি সম্ভব দীপ্তি?

দীপ্তি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—নয়? কিন্তু ঐ কথাটাই ত আমার জান্‌তে হবে।—আচ্ছা ধর্‌, যার হাতে তুই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দিলি নিজেকে, সে যদি ঐ রকম জঘন্য একটা প্রস্তাব করে—

কমলা। ঐ ত দীপ্তি তোর বিচারের ঝোঁক লেগেই আছে বরাবর। কথাটা তোর জঘন্য মনে হয়েছে।

দীপ্তি। সত্যিই ত তাই। আমার অবস্থায় পড়্‌লে তুইও বল্‌তিস্ নাকি ও কথা?

কমলা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—না। আচার বা পদ্ধতিকে আমি মানুষের ওপরে যেতে দিই না। অন্য দেশের বিয়ের পদ্ধতি দেখে আমরা যেমন হাসি, আমাদের বিয়ের পদ্ধতি দেখে তারাও তেমনি হাসে। যাকে নিয়ে বিয়ে আমার সার্থক হবে,—পদ্ধতির বাঁধনে সে বাঁধা আছে কি না আছে তা ভাবার দরকার মনে করি না।

দীপ্তি। পরিণামে যদি—

কমলা। যদি সে আমার বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে, আইনের প্যাঁচে ফেলে তার কাছ থেকে আমার বা আমার ছেলে-মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পার্‌ব এই ত? কিন্তু কথাটা ভাবতেই লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করে।

কমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই মায়া তাহার পাশে বসিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল—আমি আমার বন্ধুদের 'জানি' বা 'বুঝি' ব'লে খুব বেশী একটা গর্ব্ব ছিল কিন্তু তোকে নিয়ে এই দু'বার আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ হ'ল কম্‌লি,—তুই আর শান্তা, তোদের আমি কিছুই চিন্‌তাম না। এত ভাল লাগ্‌ছে—

বলিতে বলিতে কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়া তাহার মুখখানি চুম্বনে সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

অদূরে দীপ্তি বসিয়া আছে, তাহার বুকের মধ্যে ক্রমেই অশান্তি এবং সংশয়ের ঝড় বাড়িয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মনে হইল যেন বহু দূর হইতে কাহার ক্রন্দনের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে! তিন জনেই এক সঙ্গে অধীরভাবে শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। শুনিতে শুনিতে দীপ্তি একবার শিহরিয়া উঠিল। ঐ স্বর তাহার পরিচিত, ঐ স্বরের মধ্যে যে কথা লুকানো আছে তাহাও সে জানে, ঐ স্বর যে তুলিতেছে তাহাকে সে নিজেই একদিন শিখাইয়াছিল!

অতি কষ্টে আপনার উদ্বেলিত মনকে সংযত করিয়া দীপ্তি মায়ার মুখের দিকে ব্যাকুল দুটি চোখ তুলিয়া বলিল—দিদি, তুই শুধু বল্‌—তুই ব'লে দে, আমি নিজে নিজে এত বড় একটা সংশয়ের সঙ্গে আর লড়্‌তে পার্‌ছি না, তুই ব'লে দে আমি কি কর্‌ব—

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শান্ত আবেগহীন কণ্ঠে বলিল—তোর বাবা, মা, ভাই, বোন, সমাজ, সমস্ত জগৎকে এক পাশে ঠেলে ফেলে, তাদের অশান্তি অসন্তোষ উপহাস সমস্ত তুচ্ছ ক'রে, সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন ঐ মানুষটার কাছে গিয়ে বল্‌তে পার্‌বি—তোমার যে কাজ তাই আমার কাজ, তোমার যে বিশ্বাস তাতেই আমি বিশ্বাস

করি, তোমার যে ধর্ম্ম তাই আমার ধর্ম্ম।—[illegible]রিস্ ঐ দরজাটা খুলে ওর কাছে যা।

দীপ্তি মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া দাড়াইল। মূর্চ্ছাহতের ভাবহীন অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখ দুটি দিয়া একবার রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিল, তাহার পর ফিরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

মায়া তাহার চেয়ারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কমলা ছুটিয়া গিয়া দীপ্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভুল করলি দীপ্তি, ভয়ানক ভুল করলি—

দীপ্তি ম্লান হাসিয়া বলিল—অন্যায়ের চেয়ে বো[illegible] হয় ভুল করাই ভাল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে দীপ্তি রেলিং ধরিয়া একবার দাড়াইল। তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন স্বর উঠিতেছে :—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌ব যখন
আলোক নাহিরে!

কমলা বলিল—দীপ্তি আমি শেষ মানুষ, আমি তোর শেষ বন্ধু, তোকে বল্‌ছি তুই ফের্, এখনও সময় আছে—

দীপ্তি আর একবার চেষ্টা করিয়া তাহার অবশ পা দু'টি ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এ যেন সমস্ত রূপ-হাসি-গানের জগৎ হইতে কোন্ অন্ধতম বর্ণ-গন্ধ-চেতনাহীন গহ্বরে সে নামিতেছে!

কিন্তু তাহার থামিবার শক্তি নাই। কমলার শেষ ব্যাকুল আহ্বানও মিলাইয়া গেল! অবশ পা দু'টিকে কোনমতে ফেলিতে ফেলিতে সে গাড়ীতে আসিয়া বসিল। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে?

দীপ্তির যেন সমস্তই গোলমাল হইয়া গিয়াছিল, কিছুরই ঠিক ছিল না। কিছুতেই সে মনে আনিতে পারিল না কোথায় যাইতে হইবে। বাড়ীর কথাও তাহার মনে হইল না। বলিল—একটু ফাঁকা জায়গার দিকে কোথাও নিয়ে চল।

তখন রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। আশে-পাশে অনবরত বিভিন্ন আকারের যান ছুটিয়া চলিয়াছে, লোকের ভিড় সরাইয়া দীপ্তির গাড়ী ধীরে ধীরে চলিয়াছে। চারিধারের কর্ণভেদী শব্দের মধ্যেও তাহার কানে যেন সেই গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল :—

তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙ্‌ল, হৃদয়
বীণায় গাহিরে॥

গাড়ী তখন গঙ্গার ধার দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল; শীতল বাতাসে দীপ্তির শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। সে চোখ বন্ধ

করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহাকে এইরূপ অবসন্ন দেখিয়া ড্রাইভার আপনার মনে কিছুক্ষণ পথে পথে গাড়ী ঘুরাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া থামিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দীপ্তির যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

অসিত তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি আস্‌বার একটু আগেই এঁরা সকলে এলিসন্‌ রোডে গেছেন শুন্‌লাম, তুমি ওখানে যাও নি?

দীপ্তির শুষ্ক কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, সে শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

দীপ্তিকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া অসিত বলিল—এখানটায় বেশ হাওয়া আছে একটু ব'স না, তোমাকে আজ আমার কতকগুলো কথা বল্‌বার আছে—

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া অসিত আবার আরম্ভ করিল—এর আগেও অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু—ব'স, এই চেয়ারটাতে, তোমাকে খুব tired দেখাচ্ছে, অনেক ঘুর্‌তে হয়েছে বুঝি?

অসিত দীপ্তির পাশে বসিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

দীপ্তির বক্ষের স্পন্দন এত দ্রুত হইয়া উঠিল যে, তাহার মনে হইতেছিল বুঝি এখনই তাহা ফাটিয়া যাইবে। সে চোখ চাহিয়া থাকিতেও পারিতেছিল না। তাহার এই নীরবতাকে নারীর স্বাভাবিক লজ্জা বা সম্মতির চিহ্ন মনে করিয়া অসিতের আশা বাড়িয়া চলিয়াছিল। অসংবদ্ধ ভাবে মনের আবেগে কথা কহিতে কহিতে একটি আংটি দীপ্তির আঙ্গুলে পরাইয়া দিয়া সহসা তাহাকে আপনার বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর অজস্র চুম্বন ঢালিয়া দিল। দীপ্তি

একবার একটু কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল। সে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল না, কাঁদিল না, মনের আনন্দে চুম্বনের প্রতিদান দিল না, অসিতকে বাধা দিয়া ক্রোধের একটি কথাও বলিল না; বাহির হইতে তাহাকে মৃতের মত বোধ হইতেছিল। কিন্তু জ্ঞান তাহার লুপ্ত হয় নাই, প্রতি চুম্বনে সে আপনার বক্ষে মৃত্যুর স্পর্শ পাইতেছিল। অসিতের কঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন তাহার অস্থির হইয়া উঠিলেও শরীর নিশ্চল হইয়াই রহিল—

পত্র-পুষ্প-শোভিত তরু প্রচণ্ড কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া যেমন শ্রীহীন হইয়া যায়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিকাশকেও সেইরূপ দেখাইতেছিল। তাহার কথায়, কাজে, মনে, সর্ব্ব শরীরে, সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃতির এক তীব্র পরিহাসের চিহ্ন যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ঢাকা দিবার মত কিছুই তাহার ছিল না। তাহার এই অনাবৃত নগ্ন-বেদনা ধরা পড়িল প্রথম জীবনের কাছে।

যে দীপ্তির কথা বলিয়া বিকাশ শেষ করিতে পারিত না, যাহার কথা ভাবিতে বা বলিতে তাহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সহসা তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে ছবিখানি বিকাশের শিয়রের কাছে টেবিলের উপর একটি ছোট ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া ছিল, তাহাও সহসা তিরোহিত হইয়াছে!

প্রথম দুই দিন সে নীরবে বিকাশকে দেখিল, তৃতীয় দিনে কি একটা বলকারক পেটেন্ট ঔষধ আনিয়া বিকাশকে বলিল—তোমাকে এটা খেতে হবে, দিনে বার চারেক ক'রে।

শিশিটি হাতে লইয়া বিকাশ কয়েক বার নাড়া চাড়া করিয়া বলিল—আচ্ছা।

জীবন। আর ভাব্‌ছি তোমায় এক জোড়া মুগুর present কর্‌ব। যাদের health খারাপ হয় ওটা তাদের ভারি কাজে লাগে, বিমলের খুব উপকার হয়েছে।

ম্লান হাসিয়া বিকাশ বলিল—বেশ, নিয়ে এস, ঘোরাব।

কিন্তু জীবনের সহস্র চেষ্টাতেও বিকাশের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। জীবন বিশেষ অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন সে কি মনে করিয়া বিকাশকে বলিয়া ফেলিল—দেখ, কিছুদিন আগে মিস্ রায়কে পড়াবার জন্যে শ্রীশ আমায় বলেছিল, কিন্তু জান ত আমার একেবারেই সময় নেই। তুমি যদি কিছুক্ষণ ক'রে তাঁর কাছে কাটাও বোধ হয় খুব ভাল হবে।

জীবনের এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ তাহার চোখের সাম্‌নে যেন এক আশার আলোক দেখিতে পাইল, এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই মায়াকে প্রণাম করিয়া সে একদিন বলিয়াছিল—এই শেষ আশ্রয়টুকু আমার থাক্। আশ্রয়! এই ত আশ্রয় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এতদিন তাহা কথা তাহার মনে হয় নাই! মাতৃত্বের তেজ গর্ব্ব এবং করুণাভরা সেই বালিকার চোখের দৃষ্টি একদিন তাহাকে একান্ত আপনার করিয়া যে কাছে টানিয়া লইয়াছিল, তাহা কি একেবারে মিথ্যা হইতে পারে?

বিকাশ বলিল—আমার মনেই ছিল না সে কথা! মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল। আজ বিকালেই যাব তাহ'লে—

জীবন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ইহার পর হইতে প্রতিদিন বিকাশ মায়ার কাছে যাইতেছে। ক্রমে মায়ার কাছে যাওয়ার তাহার আর সময়-অসময় রহিল না, ইচ্ছা হইলেই যাইত।

একদিন ভোরের বেলাতেই সে মায়ার কাছে আসিয়া বলিল—আজ ভাব্‌ছি সমস্ত দিনটা এখানেই থাক্‌ব। আর সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে খাটব।

মায়া খুশী হইয়া অনেক দিন পরে একটা হাসির গান গাহিয়া ফেলিল। তাহার পর চা'পান ইত্যাদি শেষ করিয়া বলিল—আজ চারদিন শ্রীশ-দা ফেরার, তার টিকি দেখ্‌বার জো নেই! মেসোমশাই বোধ হয় তাকে ধ'রে রেখেছেন। আমাদের পাহারা দেবার জন্যে রোজ রাতে দরোয়ান পাঠান। এমন হাসি পায় ওঁদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখে—কম্‌লি, তুই চট্‌পট্ ঠাকুরকে রাঁধা-বাড়ার সব ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে আয়, আমি সকাল বেলাটা একটু পড়ি, তারপর দুপুরটা উমি, আর কল্যাণীকে এনে খুব খানিক হুল্লোড় করা যাবে।

তাহাদের এই সব পরামর্শ চলিতেছে এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তি পক্ক-কেশ এক বৃদ্ধকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিকাশ ঈষৎ ভীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং পরক্ষণেই মায়াকে ছুটিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার এই বৃদ্ধকে চুম্বন করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া অভিমানেভরা গলায় মায়া বলিল—আড়ি, যাও কি দুষ্টু বাবা তুমি! তোমার সঙ্গে আমার কথা নেই।

মায়াকে বক্ষে চাপিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রকুমার বলিলেন—আগে আমার সব কথা শোন্ তার পর রাগ করিস্ পাগ্‌লী—

মায়া। কোন কথা শুন্‌তে চাই না, আমি শুনব না—

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত না যাইতেই মায়ার অভিমান গলিয়া গেল। পিতাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার কোলে বসিয়া বলিল—কেন জানাও নি তুমি আস্‌ছ ?

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—বুড়ো মানুষ যদি একটা দোষ ক'রে ফেলে তাঁর জন্যে কি এত বকৃতে হয়? কমল মা, তুমিই বল না।

চন্দ্রকুমারকে প্রণাম করিয়া কমলা বলিল—ও আজকাল খালি সবাইকে বকে, সবার ওপর ও সর্দ্দারি আরম্ভ করেছে।

চন্দ্রকুমার বিকাশের দিকে তাকাইয়া মায়াকে বলিলেন—ঐ বুঝি তোর ছেলে? দিব্যিটি ত! সর্ ওকে একটু দেখি—

মায়া। হাঁ, ঐ আমার ছেলে, কিন্তু এক বারও মা ব'লে ডাকে না, খালি বলে মায়া-দি—ভারী দুষ্টু, না বাবা?

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—তা ও একই কথা।

তিনি উঠিয়া আসিয়া বিকাশের দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ নয়নে দেখিয়া বলিলেন—সেই চোখ, সেই মুখ, সেই সব! সুচারুকে আজ নতুন ক'রে যেন দেখ্‌লাম! শুধু একটি জিনিষ পাচ্ছি না বিকাশ, সুচারুর ছেলের ও স্বাস্থ্য নয়।

বিকাশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। আপনা হইতেই তাহার মাথা বৃদ্ধের পায়ের কাছে নত হইয়া আসিল। তাহার সম্বন্ধে চন্দ্রকুমার সব কথাই যে জানেন ইহা মনে করিয়াও তাহার কোন সঙ্কোচ হইতেছিল না; অপরিচিত বলিয়াও নিজেকে মনে হইল না। সে

চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া অপরাধীর মত হাসিতে লাগিল।

মায়া বলিল—একটু ব'কে দাও ত বাবা, মোটে ও আমার কথা শোনে না।

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—তোর চেয়ে আমি কি ওকে ভাল ক'রে বকতে পার্‌ব?—যে পথ দিয়ে সুচারু চ'লে গেছে সে পথে এসে দাঁড়াবার যে স্পর্দ্ধা রাখে তাকে বল্‌বার মত কোন কথা আমার ত মনে আসে না। উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমার দুঃখের পাত্রটি যদি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বিকাশ, জগতের কোন কিছুর ওপর যেন অশ্রদ্ধা তোমার মনে না আসে এই প্রার্থনা করি।—ওরে মায়া, কমলা, বেশ যাহোক তোরা সব! আজ তিনদিন ট্রেণে আস্‌ছি, তাও কয়েক ঘণ্টা গাড়ী লেট্! বাড়ীতে পা না দিতেই সার্‌মন্ দেওয়াতে লাগ্‌লি?—পেটের মধ্যে যে আর এক সার্‌মন্ শুন্‌ছি রে!

কথা কয়টি শুনিয়া বিকাশের চোখ দুইটি যেমন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বুকখানি তেমনি শান্তিতে ভরিয়া গেল। এই ত এতখানি স্নেহ, এতখানি মমতা, এই রহস্যময় পৃথিবীতে তাহার জন্য আজও সঞ্চিত রহিয়াছে, ইহার খবর সে ত রাখে নাই! আজও সে দুঃখ করে! যে বন্যা একদিকে ধ্বংস বহিয়া আনে, অন্যদিকে সেই বন্যাই নূতন সৃষ্টি সুরু করিতে থাকে। নিষ্ঠুরতা আর স্নেহ, ও যে ভিন্ন নয়। দুইটির ভিতরই পরিপূর্ণতা তাহার পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে।

কৃতজ্ঞ দুইটি চোখ তুলিয়া বিকাশ বলিল—আজ এখন আসি, আপিসে আজ কিছু কাজ করব, অনেক দিন কিছুই দেখ্‌তে পারি নি।

মায়া। দেখ্‌লে বাবা, ও কি দুষ্টু! পরিচয় পেলে ত?—হাঁ যাবে বৈ কি, কত দিন পরে বাবা এসেছেন, আজ আর তোমায় ছাড়্‌ছি না বিকাশ।

*　*　*　*

অল্প কয়েকদিন পর একদিন ভোরের বেলা মিত্র-পরিবারে সানাই-এর সুরের মধ্য দিয়া যে মিলন-সঙ্গীত আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল, সেই সুরেই বিকাশের প্রতি শিরা প্রতি রক্তবিন্দুও শুখাইয়া উঠিল।

মায়া বলিল—বিকাশ, আমি দিন দুই এখানে থাকৃতে পারব না।

বিকাশ শুষ্ক হাসিয়া বলিল—বেশ ত আমি ত আর কচি খোকা নই, অত ভয় পাবার কি আছে?

মায়া। ভয় পাবার নেই, সত্যি বলছ?

বিকাশ। তোমার সন্দেহ হয়?

মায়া। হাঁ।

বিকাশ। যাও, আমি ঠিক আছি।

মায়া। আমার মনে হয়, এই দু'দিন তুমি যদি কোথাও একটু বেড়িয়ে আস্‌তে ভাল হ'ত।

বিকাশ। না, তার কোন দরকার নেই।

আর কোন কথা হইল না। মায়া কমলার সহিত বিবাহ বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। এবং বীরেন্দ্রনাথ ও করুণার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে মানুষ হাসিতেছে, চারিদিকে আত্মীয়স্বজনের আনন্দের কল-হাস্য শুনা যাইতেছে, তাহার মধ্যে এই দুইজনে কষ্ট এবং চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে সকলের সহিত মিশাইতেছেন। দীপ্তির যেন কোন বিষয়েই

চেতনা নাই! সে সবই করিতেছে, কিন্তু সেই করার মধ্যে দীপ্তিকে পাওয়া যায় না! স্থবর্ণ প্রাণপণে ক'নের জন্য লাল সিল্কের ব্লাউজ সেলাই করিয়া চলিয়াছেন। এত বড় উৎসবে তাঁহার যেন আর কিছুই ভাবিবার নাই! শ্রীশ, অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু সে যে কি করিতেছে তাহা বুঝা কঠিন!

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতে পরিপূর্ণ গৃহে যখন রব উঠিল—বর—বর—

নববধূর সাজে সজ্জিত দীপ্তি কাঁপিয়া উঠিয়া মায়াকে একবার জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিল—দিদি—'

আচার্য্য, বর প্রভৃতি সকলে সভায় বসিয়াছে, এই বার ক'নেকে যাইতে হইবে। মায়া বলিল—চল্ দীপ্তি, আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

মায়ার পায়ের সঙ্গে পা ফেলিয়া দীপ্তি অগ্রসর হইল, পিছনে ছোট ছেলে এবং মেয়ের দল একান্ত উৎসুক হইয়া চলিয়াছে।

দীপ্তি বিবাহ-বেদীতে আসিয়া বসিল। চারিদিকে সহস্র সহস্র মানুষ তাকাইয়া আছে! তাহাদের সেই চাহনি সে সমস্ত দেহ দিয়া যেন অনুভব করিতেছিল। মিলন-সঙ্গীত সুরু হইল।

মায়া ভাবিয়াছিল বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত দীপ্তির পাশে থাকিবে কিন্তু কি কথা মনে হওয়াতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। কল্যাণী, কমলা এবং উমাকে দীপ্তির পাশে রাখিয়া সে বাহির হইয়া আসিয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত জন তাহাকে তাহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কেহই কোন উত্তর পাইল না। মায়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া সমস্ত জায়গায় চোখ বুলাইয়া লইতেছে।

সভা হইতে কিছু দূরে এবং নিমন্ত্রিতদের নিকট হইতে ঈষৎ পৃথক্-ভাবে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার উপর চোখ পড়িতেই মায়া

অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় যেন এক[illegible] মুখ সে দেখিয়াছে। সেই চাহনি, সেই চাপা ঠোঁটের কোণ, সে[illegible] শরীর, দিনের পর দিন যাহারা তাহার সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে!

মায়া ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া আপনার উদ্বেলিত বক্ষ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল—মুকুলবাবু!

অপরিচিত নারীকণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া চকিত ভাবে মুকুল ফিরিতেই মায়া বলিল—একবার আমার সঙ্গে একটু আস্‌বেন? ভয়ানক দরকার—আমি মায়া, আমায় চিন্‌তে পার্‌লেন না?

মুকুল হাসিয়া বলিল—না পারার ত কোন কারণ নেই, তবে প্রথমে আমি বুঝ্‌তে পারি নি কে ক'নে? আপনি ওঁকে ছেড়ে চ'লে এলেন যে?—

মায়া সহজ স্বরে এবং হাল্কা ভাবে বলিল—আমি একজন লোক খুঁজ্‌ছিলাম আমার একটি কাজ ক'রে দেবার জন্যে, কাকেও মনের মত লাগ্‌ল না আপনি ছাড়া—তাই আপনার কাছে এসেছি।

মুকুল অবাক্ হইয়া বলিল—বলুন কি কর্‌তে হবে, খুব কি দরকারী?

মায়া। হাঁ, ভয়ানক দরকারী—আপনাকে একটা বাড়ীর নম্বর ব'লে দেবো, সেখানে আপনাকে যেতে হবে।

মুকুল। বলুন, সেখানে গিয়ে কি কর্‌ব?

মায়া। আমার একটি বন্ধু আজ ভয়ানক অসুস্থ আছে, তার কাছে আপনি আজ থাক্‌বেন।

মুকুল। কেউ কি আর তাঁর কাছে নেই?—

মায়া। না। কেউ নেই তার কাছে আজ—আপনি যাবেন?

মুকুল তাহার জ্বালাভরা তীব্র দৃষ্টি দিয়া একবার বেদীর দিকে চাহিল, তাহার পর মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আমায় ঠিকানা দিন্, নইলে বেশী দেরী হয়ে যাবে।

মায়া। একশ একান্ন নম্বর Sandhurst street—

মুকুল কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—বাড়ীটা আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে—ওটা কি কয়লা-কুঠির বাড়ী?

মায়া। হাঁ, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?

মুকুল। ওখান থেকে আমার কিছু প্রাপ্য টাকা আন্‌তে গিয়েছিলাম। মিসেস্ সেন-এর একটা plaster bust আমি করি।—সেখানে আমি কাকে পাব?

মায়া। বিকাশ। তারই কাছে আপনাকে পাঠাচ্ছি।

বর ও বধূর দিকে তাকাইয়া মুকুল বলিল—আমায় তিনি যদি না আজ সহ্য করেন?

মায়া। বল্‌বেন, আপনার মা আমায় পাঠিয়েছেন।

মুকুল একবার ভাল করিয়া মায়াকে দেখিয়া লইয়া বলিল—তাহ'লে আসি?—

মায়া। কিন্তু আপনার খাওয়া হ'ল না যে?

মুকুল। কিছু দরকার নেই।

মায়া। না সে হবে না, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

মায়া চলিতে আরম্ভ করিল। মুকুলও আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার সহিত আসিয়া শ্রীশের ঘরে বসিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু ফল সন্দেশ ইত্যাদি লইয়া মায়া পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিল—আপনার ওপর অত্যাচার কর্‌লাম মুকুলবাবু, খুব কষ্ট হবে আপনার—

মুকুল। এত লোকের মধ্যে আমাকে বিশ্বাস ক'রে এই কাজের ভার দিয়েছেন শুধু এই কথা মনে ক'রে সে কষ্ট আমি সহ্য কর্‌তে রাজী আছি। ভয়ানক একটা গর্ব্বও হচ্ছে মনে মায়াদেবী,—আমিও কারো কাজে লাগ্‌তে পারি!—আপনাকে কোন খবর দিতে হবে কি?

মায়া। না, আজ আপনি তার কাছে আছেন এই কথা মনে হলেই আমি অনেকখানি হাল্কা বোধ করব।

আহার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া মুকুল বলিল—আমার তখন মনে হ'ল ক'নেরও শরীর [illegible] ভাল নেই।

মায়া চম্‌কিয়া মুকুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন মনে হ'ল ও কথা?

মুকুল। তা ঠিক জানি না, এমনি মনে হ'ল, হয় ত আমারই দেখার ভুল।—আসি তা হ'লে?—

মুকুল চলিয়া গেল।

তখন বিবাহ শেষ হইয়াছে। বরের পাশে পাশে চলবার চেষ্টা করিতে করিতে দীপ্তি ক্রমেই মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। মায়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

দীপ্তির শুষ্কপ্রায় ঠোঁট দুটি আর একবার কাঁপিয়া উঠিল—'দিদি—'

মানুষ তাহার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা কতকগুলি চিন্তা বা কাজকে—'অন্যায়' 'ভুল' 'অসত্য' 'পাপ' প্রভৃতি নাম দিয়া রাখিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারে এই সমস্ত হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই বিচার-বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা স্বার্থ, প্রবল একটা আত্মাভিমানও বিশেষভাবে জড়ান আছে। 'ভুল করিব না' 'অন্যায় করিব না' এই কথার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে,—শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। এই অভিমানের সম্মোহনে পড়িয়া মানুষ অত্যন্ত নিবিড় সম্বন্ধগুলিকেও ছিঁড়িতে উদ্যত হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা প্রেম বা স্নেহ একবার যেখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাকে সেখান হইতে তাড়ান মানুষের ক্ষমতার বাহিরের জিনিষ। তাহাকে অস্বীকার করা যায় কিন্তু নির্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলা যায় না। স্বার্থ বা অভিমানের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত প্রাণ রক্তের প্রবাহের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলে—ছেঁড়া যায় না।—ছেঁড়া যায় না... এই কান্না কোন কিছু দিয়াই থামান যায় না।

বিকাশ তাহাকে অপমান করিয়াছে এই কথা শুধু যতদিন দীপ্তির মনে ছিল ততদিন সে তীব্র একটা অশ্রদ্ধার পর্দ্দা আপনার মনের উপর ঝুলাইয়া আপনাকে বিকাশের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। এই অশ্রদ্ধার মধ্যে সে এক প্রকারের শান্তি ও তৃপ্তি পাইত। কিন্তু যেদিন ঐ অপমান হইতে বাঁচিবার বাসনা মনে প্রবেশ করিয়াছে সেইদিন হইতেই সম্পূর্ণ এক নূতন ভয় ধীরে ধীরে তাহার মনটিকে অধিকার করিয়া বসিতেছিল। এ অপমান হইতে তাহাকে বাঁচাইবে—আর একজন পুরুষ; তাহার নিজের বাঁচিবার সাধ্য নাই! এই ত্রাণকর্ত্তাকে সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহাকে চিনিবার কথা তাহার মনে আসে নাই,—কোন পরিচয়ও তাহার লয় নাই এবং সে আপনি এক প্রকার সাধিয়াই নীরবতার সাহায্যে প্রকারান্তরে তাহার সম্মতি দিয়াছে।

অসিত প্রথম হইতেই এমন ভাব দেখাইয়া আসিয়াছে যেন দীপ্তি তাহার ব্যবসা-সংক্রান্ত একটি 'জয়' বা 'লাভের'ই সামিল। দীপ্তিকে

সে যে পাইবে তাহা যেন সে প্রথম হইতেই জানিত বা ধরিয়া লইয়াছিল। এবং কোন দিক হইতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া একদিন সন্ধ্যায় সে যখন দীপ্তিকে আপনার বুকের উপর চাপিয়া তাহার জীবনের উপর বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিল, দীপ্তি সেই মুহূর্তে প্রথম অনুভব করিল—আশ্চর্য্য আর এক নূতন অনুভূতি! প্রেম, স্নেহ, ভক্তি কি তাহার নাম সে জানে না। তাহার মনে [illegible]—বিকাশ তাহার হাতের উপর একগুচ্ছ ফুল রাখিয়া ফুলসুদ্ধ তাহার হাতখানি আপনার মুখের কাছে আনিয়া তাহাতে মুখ রাখিতে গিয়া সহসা ছাড়িয়া দিয়া অপরাধীর মত সরিয়া গেল!

অসিত তখন দীপ্তির মুখের উপর আপনার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, দীপ্তির হৃদয়-স্পন্দন কয়েকবার অতি দ্রুত উঠিল পড়িল। সে স্পন্দনে যেন আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল—বিকাশ—বিকাশ—বিকাশ—'

ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিল, বিবাহের দিন সকালে তাহা করুণার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মা'র গলা জড়াইয়া দীপ্তি ভীত শুষ্ককণ্ঠে বলিল—এ বিয়ে বন্ধ ক'রে দাও মা—আমি পারব না, ম'রে যাব।

করুণা শান্তভাবে বলিলেন—আয়োজন সব শেষ হয়েছে; নেমন্তন্নও বাকি নেই, তুই বলিস্ কি?—

দীপ্তি। তা হ'ক, বন্ধ ক'রে দাও মা।

করুণা। হয় না।

দীপ্তি। কেন? তবে ওরা আসুক,—খেয়ে যাক্।

করুণা। হয় না।

দীপ্তি। কেন?—

করুণা। ওরা আস্‌ছে এই বিয়েটাকে উপলক্ষ্য করেই,—তুই নিজেই ওদের ডেকেছিস্‌।

দীপ্তি কতকটা আপনার মনেই বলিল—ওদের নেমন্তন্ন-রক্ষার জন্যেই আমাকে বিয়ে কর্‌তে হবে?—

করুণা। আজ অন্তত তাই হোক; পরে এ বিয়েকে সত্য কর্‌তে চেষ্টা করিস্‌।

বিবাহের দিন দীপ্তিকে এত ভীত ও অবসন্ন দেখিয়া তাহার বিবাহিত কয়েকটি বন্ধু হাসিয়া কুটি-পাটি হইল। দীপ্তির কানের কাছে মুখ আনিয়া একজন বলিল—অমন ভয় আমাদেরও হয়েছিল—ও কিছু না।

আর একজন তাহার অভিজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি দীপ্তির মুখের উপর তুলিয়া বলিল—এখন ভাবছিস্‌ জুজু, তেরাত্তির এক বিছানায় শু'লে অন্য কথা বল্‌বি—'

দীপ্তি ভিতরে বাহিরে একবার কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া আপনার শরীরটাকে সে সকলের হাতে ছাড়িয়া দিল। আজ তাহার নিজের কিছু করিবার অধিকার নাই। বন্ধুরা তাহাকে স্নান করাইল, চুল শুখাইয়া বাঁধিয়া দিল, পোষাক পরাইল, পায়ে অলক্ত-রেখা আঁকিয়া দিল, খাওয়াইল, তাহাকে ঘিরিয়া সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত কলহাস্য বিদ্রূপ চলিতে লাগিল কিন্তু দীপ্তির মন রহিল এ-সমস্তের বাহিরে—যেখানে মায়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে।

বিবাহের কিছু পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথের শরীর হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় নগেন্দ্রনাথকে তিনি বলিলেন—আমি বোধ হয় অতক্ষণ ব'সে থাকৃতে পার্‌ব না, সম্প্রদানটা তুমিই ক'র।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—আরে সর্ব্বনাশ! চিরটা কাল পেটপূজো ক'রে এসেছি, হঠাৎ আমাকে এতখানি বৈরাগী হ'তে দেখ্‌লে ভগবান হেসেই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌বেন।—ঐ ত শ্রীশ রয়েছে—সব ঠিক হয়ে যাবে'খন—চন্দর-দা, তোমার ত কিছু অসুখ করে নি? দেখো—

চন্দ্রকুমার ম্লান হাসিয়া বলিলেন—পাদ্রী হওয়া একটা সংক্রামক ব্যাধি। একবার ধর্‌লে আর ছাড়ে না! বারে বারেই পাল্‌টে পাল্‌টে ফেলে দেখ্‌ছি।

বিবাহ-সভায় আচার্য্য এবং অভ্যাগত-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া কন্যাকর্ত্তার স্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীশ বিবাহ-পদ্ধতি হাতে লইয়া যখন বলিল—আমার ভগিনী কল্যাণীয়া দীপ্তি, শ্রীমান্ অসিতকুমার বিশ্বাসের পাণিগ্রহণেচ্ছু হওয়ায়, আমি শ্রীশ্রীশ মিত্র, উক্ত শ্রীমানের সম্মতিক্রমে আমার ভগিনীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। আপনারা সকলে 'স্বস্তি' বলুন।

সভামণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইল—স্বস্তি-স্বস্তি—

যথারীতি সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইবার পর আচার্য্য কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—কল্যাণীয়া দীপ্তি, তুমি কি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া কল্যাণীয় শ্রীমান্ অসিতকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল তাহার কথা শুনিবার জন্য।

দীপ্তির ঠোঁটদুটি শুধু একবার নড়িল মাত্র। কোন কথা বাহির হইল না। সাক্ষীত্রয় বলিলেন—একটু জোরে বল মা-লক্ষ্মী, আমাদের শুন্‌তে হবে।

এ কি নিদারুণ পরিহাস! এ কি অভিনয় . . . পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই সাক্ষী রাখিয়া দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিতে হইবে—'স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রস্তুত হইয়াছি . . . বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্য-গ্রন্থিটি ফুলের মালার আকারে তাহার চোখের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে! উহারি মধ্যে আপনার মাথা গলাইয়া দিতে হইবে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কেহ সহিবে না . . . দীপ্তির বুকের মধ্যে আর এক বার আর্ত্তনাদ জাগিল—বিকাশ—বিকাশ . . . মুখ দিয়া বাহির হইল—প্রস্তুত হইয়াছি।

* * * *

বিবাহ বাড়ীর স্বাভাবিক এবং যথারীতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আনন্দের কলরব তখন শেষ হইয়াছে। পান-ভোজনান্তে একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। করুণার আদেশমত মায়া, বর ও বধূকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে আনিয়া বলিল—অসিতবাবু অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়ুন। আমি একবার নীচে গিয়ে শ্রীশ-দা'দের দেখে আসি।

মুহূর্ত্তেই সে বাহির হইয়া গেল এবং দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া শ্রীশের ঘরে আসিয়া দেখিল—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহ মেলিয়া জীবন, মুনি, সুপ্রকাশ ও শ্রীশ চারিখানি চেয়ার দখল করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। সে ধীরে ধীরে পুনরায় উপরে আসিয়া আপনার ঘর হইতে কয়েকখানা বিছানার চাদর ও বালিশ লইয়া শ্রীশের ঘরে আসিয়া অতি সন্তর্পণে মেঝের কার্পেটের উপর সে সমস্ত পাতিয়া চারজনের মুখের উপর কিছুক্ষণ গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—শ্রীশ-দা, ও শ্রীশ-দা শুনছো?

মুনি, স্বপ্রকাশ ও শ্রীশ একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল। শ্রীশ বলিল—কি রে, এখন নেমে এলি যে?

মায়া। দেখতে এলাম তোমরা কি করছ। ঐ রকম ক'রে শোয়? নাও ওঠ। বিছানা পেতে দিয়েছি।

মুনি, স্বপ্রকাশ ও শ্রীশ উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু জীবন যেমন ঘাড় কাৎ করিয়া শুইয়াছিল তেমনই রহিল।

মায়া বলিল—আহা, উনি একবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন! মুনিবাবু, ওঁকে তুলে এনে এখানে শুইয়ে দিন না।

মুনি। হাঁ, কচি খোকা কি না! থাক্‌গে, ঘাড়ে লাগ্‌লে আপনি উঠে আস্‌বে—ওর ওপর আমি আজকে হাড়ে চটে গেছি।

পরিবেশনের সময় মুনি ও কল্যাণীর মধ্যে যে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, মায়া তাহা কল্যাণীর নিকট হইতে কিছু পূর্ব্বে শুনিয়াছে। এবং তাহার জন্য জীবনই দায়ী।

মায়া হাসিয়া বলিল—কিন্তু অপরাধটা ওঁর স্বেচ্ছাকৃত নয়, ওঁকে ক্ষমা ক'রে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিন্।

কথাগুলি বলিতে বলিতে মায়া জীবনের মাথার কাছে আসিয়া মুখ ঈষৎ নত করিয়া ডাকিল—জীবনবাবু—

জীবনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মুনি হাসিয়া বলিল—ওটা কুম্ভকর্ণ মায়া-দি। কাঁসর-ঘণ্টা কানের কাছে না বাজালে ওর জাগবার আশা নেই।

মায়া হাসিয়া জীবনের কপালের উপর হাত রাখিয়া তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিল—জীবনবাবু—

এবার এক আলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। জীবন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চেয়ার হইতে একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেহখানিকে

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল—সকাল হ'য়ে গেছে নাকি রে ?—

মুনি প্রভৃতি সকলে হাসিয়া উঠিল। মায়া পলাইবার জোগাড় করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। এমন সময় জীবন চোখ মেলিয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া কি করিবে যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অপরাধীর মত বলিল—আমার ঘুমটা দেখে ফেলেছেন তা'হলে ?

মায়া। হাঁ, চমৎকার। ঐ রকম ঘুমই সবার হওয়া উচিত। কিন্তু ভারী দুঃখ হ'চ্ছে আপনাকে জাগিয়ে।

মুনি। মোটেই দুঃখিত হবেন না মায়া-দি। ও শুয়ে পড়ুক, তারপর আর এক মিনিট দাঁড়ান, দেখ্‌বেন ও আগেকার থেকে ভাল ঘুমচ্ছে।

জীবন। না, ঘুমবে না। আমি কি তোর মত পাপী না চোর, যে ঘুমতে পারব না ? খালি চুরি-মত্‌লব মাথায় থাকলে কি ঘুম হয় ? —বলুন ত মায়াদেবী—

মায়া হাসিয়া বলিল—সত্যিই তাই—নিন্, শুয়ে পড়ুন, আমি আসি।—শ্রীশ-দা, কাল সকালে না হয় বিকালে এখান থেকে পালাতে চাই—কেমন ?

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা।

মায়া চলিয়া যাইতেই সুপ্রকাশ, জীবনকে বলিল—কি হয়েছে রে ? মুনিটা তোর ওপর অত চ'টে গেল কেন ?

জীবন। অপরাধ যেন আমারি ! সেই তুই যখন বল্‌লি—চাট্‌নী কিছু কম পড়বে, আমি ভাঁড়ার থেকে কিছু কিস্‌মিস্ আন্‌তে গিয়ে দেখি—আরে ছ্যা !—

মুনি প্রতিবাদ করিল—এত বড় একটা করুণ-রসাত্মক ব্যাপারকে যে অশ্রদ্ধা করে, সে জানোয়ার। আমিই বলছি প্রকাশ, জানই ত উনি ছিলেন ভাঁড়ারের চার্জ্জে, আমি কর্‌ছিলাম পরিবেশন। সন্দেশের চুব্‌ড়ীটা নিতে গিয়ে দেখি, বেচারী একলাটি অশোকবনে সীতার মত ব'সে আছে! আমি বল্‌লাম—সন্দেশ চাই। সে আমার হাতে সন্দেশের ঝুড়িটা তুলে দিয়ে আঁচল দিয়ে আমার মুখটা মুছিয়ে—এমন সময় হতভাগা গন্ধমাদনের মত একটা চ্যাঙ্গারী মাথায় ক'রে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কিস্‌মিস্! বাদশাজাদীর ঘরে যেন হাব্‌সী নকীব danger-signal দিয়ে গেল!

সকলে হাসিয়া উঠিল। জীবন বলিল—রুচিকেও বলিহারী বাবা! তরকারী দই-ক্ষীরে মাখামাখি শরীর নিয়ে—

মুনি। তুমি কি বুঝ্‌বে সন্ন্যাসী? কি অপূর্ব্ব শান্তি-সুষমায় ভ'রে বিধাতা ঐ একটি মুহূর্ত্ত আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাক্‌, তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম, যেহেতু দোষটা তোমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।

গল্প করিতে করিতে চারিজনেই ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

মায়া চলিয়া যাইবার পর হইতে দীপ্তি কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কি করিতে হইবে তাহা যেন মনে ছিল না। তাহার অবসন্ন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় অসিত তাহার হাত ধরিয়া সোফায় বসাইয়া নিজে তাহার খুব কাছে বসিয়া বলিল—তোমাকে ভয়ানক শ্রান্ত দেখাচ্ছে—তা হ'ক এখুনি শুতে দিচ্ছি না। আমার মনে আজ যে কি হ'চ্ছে তা তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। একা একা আজ প্রায় পনেরো বছর

কাটিয়েছি! শান্তি কেমন তা জানি নি। তবু আজ মনে হ'চ্ছে যত দুঃখ পেয়েছি সে সব আমার সার্থক হয়ে উঠেছে তোমায় পেয়ে! সে সব দুঃখের কথা আর এখন আমার মনেই আসে না। আমার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থাতেও কোন দিনও আমি অসন্তুষ্ট হই নি, অবস্থাকে বিধিলিপি ব'লে মেনে না নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়েছি, তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছি, নিজেকে সহজ অবস্থার ওপরে টেনে তুলেছি! আমি উঠ্‌ব, আমি বাঁচব এই ছিল আমার চিন্তা। আজ সে বাঁচা আমার সার্থক করেছ তুমি।

ভাবের আবেগে কথা বলিতে বলিতে সহসা দীপ্তির উপর চোখ পড়িতেই সে দেখিল, দীপ্তি ধীরে ধীরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! তাহার মাথা প্রায় তাহার হাঁটুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

অসিত তাহাকে ধরিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া বলিল—What a selfish brute I am!—না, শোবে চল। তোমার শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়েছে। আমায় এতক্ষণ বল নি কেন?—না অত গয়না পরে ত শুতে পার্‌বে না, গায়ে লাগ্‌বে।

স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে বলিতে অসিত দীপ্তির কণ্ঠ হইতে অত্যন্ত ভারী এবং লতা-পাতা-কাটা নানা রঙের পাথর বসান এক ছড়া হার খুলিবার সময় শুভ্র সুন্দর কণ্ঠের অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর মুখ চাপিয়া ধরিল।

ভীষণ আঘাত পাইলে মানুষ যেমন বাঁকিয়া যায় দীপ্তিও সেইরূপ করিয়া পিছাইয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ত্রস্ত চকিতভাবে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল! তাহার অসম্বৃত বসন সিঁড়ির ধাপে ধাপে লুটাইয়া তাহার সহিত নামিতে

লাগিল। দ্বিতলে আসিয়া মায়ার ঘরের দরজায় সমস্ত শরীরের ভার দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত দীপ্তি ডাকিল—দিদি—দিদি—খোল্—খোল্—'

বহু কষ্টে আত্মীয়স্বজনের হাত হইতে মায়া এই ঘরখানি আপনার জন্য রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল। বীরেন্দ্র, করুণা, স্বর্ণ, চন্দ্রকুমার প্রভৃতি সকলকে শুইতে পাঠাইয়া—তখন সবে সে তাহার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়াছে এমন সময় ঐ চাপা কণ্ঠের স্বর শুনিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল।

আবার শব্দ হইল—খোল্, দিদি খোল্—

মায়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি সশব্দে ঘরের মাটীতে পড়িয়া গেল! মায়া তাহার কাছে বসিয়া মাথায় হাত রাখিতেই দীপ্তি ভীত কণ্ঠে বলিল—বন্ধ কর্—বন্ধ ক'রে দে দরজাটা—

মায়া কঠিনভাবে বলিল—এর মানে?—

দীপ্তি। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না—বন্ধ ক'রে দে দরজাটা—

মায়ার কণ্ঠ জড়াইয়া দীপ্তি এমন করিয়া তাহার মাথা মায়ার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল যে, মায়ার নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছিল। অবসন্নভাবে সে বলিল—আমি বন্ধ ক'রে দিলেও এ দরজা ভেঙ্গে তোকে ও ওর বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের কারো বাধা দেবার সাধ্য নেই—তোরও না। অনেক বাইরের লোক আজ এই বাড়ীতে আছে, তারা যদি তোর এই কাণ্ড আজ দেখে, বল্বে—নির্লজ্জার ন্যাকামী।

দীপ্তি কাঁদিয়া বলিল—যে বলে বলুক। তুই বলিস্ নি। তুই জানিস্ আমাকে।

মায়া। কিছু না। তোকে আমি কিছু জানি না। তোকে জান্‌বার আর আমার বাসনাও নেই। আমায় অমন ক'রে আর দগ্ধাস্‌ নি দীপ্তি,—তোর ঘরে যা, আমায় একটু নিশ্বাস ফেল্‌তে দে।

দীপ্তি বিপুল বলে আর একবার মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না।—

মায়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—তবে এ বিয়ে কর্‌লি কেন? ঐ বেচারী মানুষটার জীবনে অশান্তি এনে দেবার জন্যে? কি করেছিল ও তোর? তুই ছাড়া ওর কি আর স্ত্রী মিল্‌ত না এ জগতে?—যে মতের অমিলের জন্যে এক জনকে খুন ক'রে এসেছিস্‌, সেই মতের মিলের জন্যেই আবার এক জনকে খুন কর্‌তে চলেছিস্‌ রাক্ষুসী!—

মায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে দীপ্তির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

* * * *

স্পর্শ-সুখের শিহরণ যখন সর্ব্বশরীরে রঙ্গীন নেশার জাল বুনিতেছে তখন তাহাকে দুইহাতে ঠেলিয়া দীপ্তি দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল! বিরক্তিপূর্ণ একটা উদ্‌ভ্রান্ত এবং উন্মাদ ভাব অসিতের মনটিকে ঘিরিয়া ধরিল। সে হাত বাড়াইয়া দীপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আবেগ-কম্পিত ভগ্ন-কণ্ঠে বলিল—এস, এস—'

কিন্তু বেশী দূর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অসিত দেখিল, দীপ্তির চোখে মৃত্যু-ভয়... মুখে দারুণ লজ্জা ও ঘৃণা! এবং তাহাকে ভাবিবার কিছু অবসর না দিয়া দীপ্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

সে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল—Do I look a cave-man really?—

অশান্ত মনটিকে লইয়া উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর শয্যার নিকট আসিয়া পাশাপাশি দুইটি বালিশের দিকে অসিত তাকাইয়া রহিল। সুগন্ধ পুষ্প বিছানায় প্রায় ভরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু একা এমন সুন্দর শয্যায় শুইবার তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ধীরে ধীরে সোফার কাছে আসিয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইবার জন্য দিয়াশলাই জ্বালিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নারী-শরীরের মৃদুমধুর-সৌরভ তখনও যেন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

আলো জ্বলিতে লাগিল। বাসক-শয্যা শূন্য পড়িয়া রহিল। বর ও বধূর প্রথম মিলন-রাত্রি বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সকাল বেলা ব্যাপারটিকে সহজ করিবার জন্য মায়া হাসিয়া বলিল—অসিতবাবু, রাত্রে বৌ বিছানা থেকে পালিয়ে গেল টের পেলেন না?

অসিত ম্লান হাসিয়া বলিল—বৌ যদি কারো পালাব মনে করে, কোন স্বামী কি তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে?

মায়া। পারে না?

অসিত। বোধ হয় না।—কথাই তো আছে জানেন,—man marries to come in, woman marries to come out—ব্যতিক্রম কিছু হয় নি।

দীপ্তিকে ঠেলিয়া মায়া বলিল—শুন্‌ছিস্?

কিন্তু দীপ্তি যে কিছু শুনিয়াছে তাহার পরিচয় দিল না।

তাহার পর বর ও বধূর বিদায়ের পালা আসিল। দীপ্তি কতকটা নির্লিপ্ত এবং কঠিন ভাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অসিতের

সহিত গাড়ীতে আসিয়া বসিল। তাহার পর ভিড়ের মধ্যে করুণা ও বীরেন্দ্রনাথকে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে একটু হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

নগেন্দ্রনাথ অসিতের পরিচয় দিবার সময় বীরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—He has dropped from the sky—'

কথাটি পরিহাসচ্ছলে ব্যবহৃত হইলেও ইহাতে মিথ্যা ছিল না। অসিতের অতি পরিচিত বন্ধুগণও জানিত না, তাহার গৃহ কোথায় ছিল বা তাহার আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছে, এমন কি তাহার বিবাহে তাহার একমাত্র ভগিনী রাধা ছাড়া আর কোন আপনার-জনকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

Middle Avenue-এর একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলের অংশটি অসিত কিছুকাল পূর্ব্বে ভাড়া লইয়াছিল এবং এইখানেই সে তাহার নব-পরিণীতা-বধূকে লইয়া গৃহ-প্রবেশ করিল।—বধূকে বরণ করিয়া লইল রাধা।

গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে আসিয়াই কতকটা কৌতুকের স্বরে দীপ্তির চোখের দিকে চাহিয়া অসিত বলিল—এই 'হারেম্'টা তোমার জন্যে ঠিক করেছি—অসুবিধা যা হবে তার নালিশ শোন্‌বার কেউ নেই, সব মুখ বুজে সইতে হবে; তাছাড়া শ্বশুর শাশুড়ির বালাই নেই, শুধু আমার ছোটবোন রাধা আছে, তা ও আর বেশী দিন থাক্‌বে না,

সুতরাং বুঝ্‌তেই পারছ তোমাকে কি অসহায় অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছি ?—

দীপ্তির মুখে অল্প একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল কিন্তু তাহা অসিতের কথায় বা আপনার মনের কোন খেয়ালে তাহা বোঝা গেল না। দীপ্তিকে রাধার হস্তে সমর্পণ করিয়া অসিত কোন কাজে তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দীপ্তির হাত ধরিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া তাহার মুখটি দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে রাধা হাসিয়া বলিল—ভয় লাগ্‌ছে ?—

দীপ্তি তাহার বড় বড় চোখ দুটি রাধার মুখের উপর তুলিয়া বলিল—ভয়, কিসের ?

রাধা। অমন শুখ্‌ন দেখাচ্ছে যে !

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—কাল রাতে বিয়ে হয়েছে আজ শুখ্‌ন দেখাবে না ?—

রাধার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে একবার দীপ্তির চোখের দিকে চাহিয়া কি যেন পড়িতে চেষ্টা করিল, তাহার পর বলিল—আমি অনেক ক'নে দেখেছি ভাই, কিন্তু ঠিক তোমার মত কা'কেও দেখি নি !

দীপ্তি। নতুন ক'নেরা আমার মত হয় না ?—

রাধা। না, তারা হয় খুব ভয় পায়, নয় খুশীতে তাদের চোখ-মুখ উছ্‌লে ওঠে।

দীপ্তি। আমার কি আছে ?

রাধা। জানি না।

দীপ্তি মাথা নীচু করিয়া সাড়ীর আঁচল লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

এই সময় অসিত ঘরে পুনরায় প্রবেশ করায় রাধা হাসিয়া বলিল—বাবা, বাবা! তোমার আর তর্ সয় না—আমরা একটু গল্প কর্ছি—'

অসিত। তা কর্ না, তোকে বারণ করেচে কে? আমি শুধু একবার দেখ্তে এসেছিলাম, ঘরটা কেমন দেখাচ্ছে।—আজ ভারী সব নতুন নতুন ঠেক্ছে, না রাধা? তোরা গল্প কর্, আমি এখানে একটু চুপ ক'রে ব'সে থাকি, কিছু মনে করিস্ নি, আমাকে ভুলে যেতেও পারিস্, আমি কোন কথা ক'ব না।

রাধা হাসিয়া বলিল—বউ-পাগ্লা বুড়ো! নাও, ঢের হয়েছে, এইখানেই ব'স, আমি একটু কাজ-কর্ম্ম দেখে আসি।

অসিত। না, তা হবে না তুই ব'স, নইলে আমি এক মিনিটও টিঁক্তে পার্ব না।

কথা বলিতে বলিতে অসিত একটি সিগারেট্ বাহির করিয়া দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিল—যদি খাই তোমার খারাপ লাগ্বে?

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

রাধা দুই জনকে দেখিয়া একবার কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—তোমাদের না হয় ব'সে থাক্লেই চল্বে! কিন্তু আমার চলে কি করে? সকলকে ডেকেছ বিকালে এখানে খাবার জন্যে, তার জোগাড় কর্তে হবে না?

কথা কয়টি বলিতে বলিতে উঠিতে গিয়া রাধা দেখিল, তাহার আঁচলটি দীপ্তি চাপিয়া ধরিয়া আছে! এবং মিনতিপূর্ণ চোখে নীরবে সে তাহাকে থাকিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছে!

রাধা হাসিয়া অসিতকে বলিল—দেখ্ছ দাদা, বৌ আমাকে এরই মধ্যে কত ভালবেসেছে!

অসিত এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—হিংসেয় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

কথাগুলি বলিবার সময় সে একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু সেখানে এমন কিছুই সে দেখিতে পাইল না যাহাতে তাহার মনে হইতে পারে, দীপ্তি তাহাকে অনেকখানি নিকৃষ্টতর করিয়া লইয়াছে। কল্যকার দীপ্তির সহিত আজিকার দীপ্তির কোথাও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই! সে তেমনই স্তব্ধ, আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর, মাঝে মাঝে শুধু সে চারিদিকে ভয়-চকিত চাহনি দিতেছে। সে চাহনিতে একান্ত নিরুপায়ের বেদনা সুস্পষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে!

অসিত কি মনে করিয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা তোরা ব'স্, আমি আমার ঘরটা একবার গুছিয়ে আসি।

অসিত চলিয়া যাইবার পর দীপ্তি মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। রাধা তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—তোমার খুব আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে না ভাই? বিয়ের পর বৌ ঘরে এল কিন্তু আমি ছাড়া আর কোন আত্মীয় তোমাকে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিতে এল না! আমাদের আত্মীয় অনেক আছেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনেকদিন আগে ছিঁড়ে গেছে। হয় ত আমি ছাড়া আর কেউ এ বাড়ীতে আস্‌বেও না কোন দিন। দাদার কাছে সব শুন্‌তে পাবে। অনেক দুঃখ বিপদ এড়িয়ে এই মানুষটা পা রাখ্‌বার মত একটু জায়গা ক'রে নিতে পেরেছে। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। সে-সব কথা আজ আর এই সুখের মধ্যে আন্‌তে চাই না। একদিন সব জান্‌তে পার্‌বে। তুমি এই ঘরের লক্ষ্মী, তোমার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে এ-ঘরকে পবিত্র ক'রে তোল—

আর কি বল্‌ব ভাই, আমায় চুমু খাবে না? এমন মিষ্টি মুখখানি তোমার!

রাধা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দীপ্তির মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিদ্রোহ সেইখানেই প্রবল হইয়া উঠে, যেখানে মানুষ বিদ্রোহ দমনের জন্য পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করে। কিন্তু বিনা বিচারে এবং প্রতিবাদে মানুষ যখন তাহার সমস্ত অধিকারের দাবী বিদ্রোহীর হস্তে সমর্পণ করে, বিদ্রোহী সেখানে অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়, বিদ্রোহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। দীপ্তি তাহার ভ্রান্তি এবং কর্ম্মফলকে উপহাস করিয়া এই গৃহের প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকটি অধিকারের দাবীকে অস্বীকার করিবার জন্য তাহার মনকে নির্ম্মম করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কোন করুণা বা স্নেহের দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া এ গৃহের কোন কিছুকে এতটুকু শান্তি সে দিবে না, ইহাই ছিল তাহার প্রতিজ্ঞা; কিন্তু এখন বুঝিল তাহা কত দুঃসাধ্য!

অসীম ক্ষমতাশালী বিষয়-বুদ্ধিমান স্বার্থপর অসিত, করুণা-প্রার্থীর মত বলিতেছে—এ বাড়ীর সমস্তই যেন নতুন নতুন ঠেক্‌ছে! এখানে একটু বসি, খুব ভাল লাগ্‌বে—

রাধা বলিতেছে—তুমি এই ঘরের লক্ষ্মী, তোমার সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে এই ঘরকে পবিত্র ক'রে তোল—

ফুলের মালার গ্রন্থি ফাঁসির মত নিবিড়ভাবে যেন দীপ্তির গলায় চাপিয়া বসিতে লাগিল। সে চাহে মুক্তি! কিন্তু স্নেহের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্ভব হইবে কি প্রকারে? অন্তরের বিপুল অশান্তি চাপিয়া দীপ্তি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারীর মন নারীই ভাল বোঝে। দীপ্তির এই স্তব্ধতার মধ্যে রাধা যেন দেখিতে পাইল, এই বিবাহের মন্ত্রটি, ঠিক ভাবে বলা হয়

নাই। অনেকখানি অনিচ্ছার ভাব রহিয়া গিয়াছে। এ-কথা প্রথম হইতেই তাহার মনে হইয়াছিল। মন্ত্র যেখানে হার মানে, মানুষের স্বাভাবিক শক্তি সেখানে হয় ত কিছু কাজ করিতে পারে এই আশায় দীপ্তির হাতখানি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—মা'র স্নেহ পাই নি কোন দিন. খুব আশা হচ্ছে, তুমি আমাদের এ অভাব ঘুচিয়ে দেবে—'

দীপ্তির নিষ্ঠুর মনের কাছে আহতের আরক্ত আঁখি যেন দীনভাবে নিবেদন জানাইয়া গেল—সবাই মেরেছে, তুমিও মেরো না—একটু শান্তি দাও—'

যে বেদনা আপনার বুকে দিনরাত্রি গুমরিয়া মরিতেছিল, সহসা তাহা এক ঝলক জলের আকারে তাহার চোখে আসিয়া দেখা দিল। এইবার প্রথম সে রাধার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—কি আশ্চর্য্য ভাই, তোমাকে ঠিক আমার মনীষা-মাসীর মত দেখ্‌তে। তেমনই ছোট্ট তুমি, তেমনই মিষ্টি মুখের কথাগুলি!

রাধা আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—তোমার মনীষা-মাসীর মত আমায় দেখ্‌তে? তবে ত আমায় ভাল বাস্‌তেই হবে, কিছুতেই ঠেল্‌তে পার্‌বে না।—মিষ্টি?—না না, আমি মিষ্টি নই, আমার হাড় পাঁজর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে, আমার জোর ক'রে বল্‌বার কোন শক্তি নেই, তাই হয় ত আমাকে মিষ্টি লাগে। আমি বেঁচে আছি সবার দয়ার ওপর; সকলের দয়া কুড়িয়ে, সকলকে [illegible] ক'রে আমি চলেছি। তবু পারি কি চল্‌তে?—পারি না। [illegible]ষ যে আরো চায়, কিন্তু আরো দেবার ক্ষমতা আমার দিন দিন কমে আসছে—আমি যে কিছুই পাই না।

এ মানুষের কাছে মানুষের কান্না! দীপ্তির বিমুখ মন ধীরে ধীরে ঘুরিয়া আসিয়া রাধাকে বুকে তুলিয়া লইতে চাহিল। দুইজন দুইজনের চোখের দিকে চাহিয়া একবার দেখিয়া লইল। হাসি-কান্না-মাখা মুখে রাধা বলিল—কি দেখ্‌ছ ভাই?—

দীপ্তি। কি দেখ্‌ছি জানি না, হয় ত জানি; হয় ত বুঝি না, হয় ত বুঝি। তবু ইচ্ছে কর্‌ছে তোমার সব কথা তোমারই মুখে শুনি। আমি এখনও তোমাদের সংসারে নিজেকে মেশাতে পারি নি, তবু যদি বল—তোমাদের বাড়ীর বৌকে নয়, দীপ্তিকে, অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়েকে—'

রাধা ম্লান হাসিয়া বলিল—সাধারণ মেয়ে? তাহলে আমি কি এতক্ষণ তোমার কাছে থাক্‌তাম? বল্‌তেই ত আমি চাই, কিন্তু শোনাবার লোক আজ প্রায় পনের বছরের মধ্যে পাই নি, এতদিনের না-বলা কথা আজ হঠাৎ যদি বলি সে কেমনতর ঠেক্‌বে যে! আমাদের বাড়ীর বৌ ভেবে ত তোমার কাছে আসি নি, আমি এসেছি একটি মানুষের কাছে, যদি সে আমায় ভালবাসে, যদি সে আমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেয়।—বড় দুর্লভ ও জিনিষটা পাওয়া, তার কারণ বোধ হয় সবাই শুধু পেতেই চাই, দেবার কথা কারো মনে থাকে না।

—আমার প্রথম মেয়ে আমার স্বামীর পদাঘাত বুকে নিয়ে অসময়ে আমার কোলে এল। কিন্তু পৃথিবীর আলো-বাতাস তার সইল না—তখন আমার পুতুল-খেলার বয়স কাটে নি।

—তারপরেও তিনটি সন্তান এই স্বেচ্ছাচারী স্বামীর অত্যাচারে পৃথিবীতে এসেই বা আস্‌বার পূর্ব্বেই বিদায় নিয়েছে।—শেষের দুটিকে পেয়েছি, তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি কিন্তু এত কষ্টেও বেঁচে

থাকার জন্যে স্বামীর অশ্রদ্ধা আমার ওপর বেড়েই চলেছে। গরীবের স্ত্রীর পক্ষে মা-হওয়া নাকি অন্যায়। টানাটানির সংসারে মুখের সংখ্যা যদি বেড়েই চলে অসুবিধে হবে না ?—

কথা কয়টি শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক শ্বেত হাসি রাধার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

দীপ্তি কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন-গড়া সংগ্রামের কাছে এই নারীর অসংখ্য নির্য্যাতন এবং অপমানের তীব্রতা তাহার চোখের সম্মুখে অত্যন্ত ভীষণ ভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রাধার হাত ধরিয়া বলিল—মানুষ হয়ে এত অত্যাচার সইতে পারে আমার জানা ছিল না। তুমি সইলে সব ?—

রাধা ম্লান হাসিয়া বলিল—সইব না ? সহ্য করা ছাড়া আমরা আবার কি করতে পারি ?

দীপ্তি। কিছু না ?

রাধা। না।—কিন্তু বিয়ের ক'নের কাছে এ-সব কথা বলা ঠিক নয়, তোমাকে আর একজন লোকের কথা বলি। তুমি মকবুল আলীকে নিশ্চয়ই খুব চেন ?—

দীপ্তি। মকবুল আলী ? সে কে ?

রাধা হাসিয়া বলিল—চেন না, তোমার স্বামী।

দীপ্তি। আমার স্বামী ?

রাধা। হাঁ গো হাঁ, শ্রীঅসিত বিশ্বাস। ওরই নাম [illegible] মকবুল আলী। ঐ নাম নিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ও [illegible]েত পালায়।

দীপ্তি। খালাসী হয়ে ! কেন ?

রাধা। কি করবে? সহায় সম্বলহীন নিগৃহীত বালক। কিন্তু বুকে তেজ ছিল, শক্তি ছিল, তাই আজ ও উঠে দাঁড়িয়েছে। নইলে আমার মতই ধূলোয় এতদিনে মিশে যেত।

—ওর বাবা ছিলেন স্থধাপুরের জমিদার, আমার বাবা তাঁর ছোট ভাই। ও আমার জ্যাঠামশায়ের ছেলে। ওর বাবাকে আমার বাবা বিষ খাইয়ে মারেন। যে লোকটা এ-সমস্ত জান্‌ত, আমার বাবা তার মুখ বন্ধ করেছিলেন—আমাকে আর কিছু নগদ টাকা দিয়ে। আমি খুনীর মেয়ে, খুনীর স্ত্রী। সে যাক্ গে। তারপর শোন:—

জ্যাঠামশায় মারা যাবার পর আমার বাবা লোক-দেখান স্নেহ দেখিয়ে আমার ভাই-এর অভিভাবক হলেন; ও তখন শহরে পড়্‌ত। তারপর কিছুদিনের মধ্যে তার মাসহারা বন্ধ হ'ল। কূল-কিনারা কিছু না দেখ্‌তে পেয়ে আমার ভাই খালাসীদের সঙ্গে ভাব ক'রে ঐ ছদ্ম নাম নিয়ে দেশ ছাড়ে। তারপর এই পনের বছরের পর ওকে ফিরে পেয়েছি —পেয়েছি ভাই, তুমিই ওকে ফিরিয়ে এনেছ।

—তখনকার ওর সব চিঠি আমার কাছে আছে, ভারী মিষ্টি; একবার লিখেছিল—জানিস্ রাধা, লক্ষপতির ছেলে হ'য়ে চোরের মত পুলিশের নজর এড়িয়ে একটা জঘন্য হোটেলে কাজ নিয়েছি। যখন খিদে পায়, মানুষের ফেলে-দেওয়া আধখাওয়া খাবার খাই। মন্দ যাচ্ছে না দিনগুলি। যত দুঃখ পাচ্ছি, বাঁচ্‌বার জন্যে ততই ইচ্ছে করছে। ফির্‌ব কি না, জানি না, যদি ফিরি তোর আশীর্ব্বাদেই ফির্‌ব, আর তোর জন্যেই ফির্‌ব। তোর আর আমার কথা যখন মিলিয়ে দেখি, মনে হয় আমি ঢের ভাল আছি, আমার জন্যে বাইরের খোলা আলো-বাতাস কেউ বন্ধ করতে পারে নি, কিন্তু তোর তাও নেই।

—আমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়েছি ; ঐ দুঃখী ভাই আমার একমাত্র সম্বল।—ঐ না দাদার পায়ের শব্দ ? ও আস্‌ছে ! —হাস হাস, চেষ্টা ক'রেও একবার হাস—বলিতে বলিতে রাধা দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে চোখ মুছিতে লাগিল !

রাধার এই অভিনয়ের করুণ মাধুরী দীপ্তির মনের উপরও অনেকখানি রেখাপাত করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে উদাসীনতার আভাস তাহার মুখে ফুটিয়া ছিল, এখন তাহা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে এবং সে নিজেও ইহা অনুভব করিতেছিল।

এই সময়ে অসিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—না রাধা, এবার সত্যি আমার হিংসে হ'চ্ছে কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে তার চেয়ে বেশী।

রাধা। ওমা তাই ত! বেলাও ত কম হয় নি! চল ভাই বৌ-দি, তোমায় স্নান করিয়ে আনি।

দীপ্তিকে লইয়া চলিয়া যাইবার সময় অসিতকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রাধা বলিল—ওকি! অত ধূলো মাখ্‌লে কি ক'রে? ফুর্ত্তিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলে নাকি ?

অসিত হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—প্রায় তাই। দীপ্তির জন্যে দক্ষিণ দিকের ঘরটা সাজিয়ে এলাম। আমার ঘরটা হবে common room, ওরটা হবে ওর private—

রাধা। মানে ?

অসিত। মানে আর কি ? বিয়ে করেছে বলে কি একটা ঘরও নিজের জন্যে থাক্‌বে না নাকি ?

দীপ্তিকে টানিয়া রাধা বলিল—চল ভাই দেখে আসি।

মাঝের একটি হল্ এবং ছোট একটি ঘর পার হইবার পর দীপ্তিকে লইয়া রাধা অসিতের ঘরে আসিয়া দেখিল, বহু যত্নে যে সমস্ত সামগ্রী

অসিত তাহার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সমস্ত সে পাশের ঘরটিতে আনিয়া রাখিয়াছে! একটি বিছানা, লিখিবার টেবিল একটি, আয়নাযুক্ত বড় আল্‌মারি এবং ঘরের এক কোণে Japanees screen-এর আড়ালে ছাড়া-কাপড় রাখিবার আল্‌না ইত্যাদি এবং দেওয়ালে লর্ড লেটনের আঁকা একখানি ছবি—'wedded', ইহা ছাড়া আর কোন সরঞ্জাম নাই!

রাধা অবাক্ হইয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য ভাই! বিয়ের আগের দিন পাশাপাশি দু'খানা খাট রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই দিকে তাকিয়েছিল, আজ তার একটিকে সরিয়ে ও-ঘরে রেখেছে!

দীপ্তির সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়া হিম-শীতল এক স্রোত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া গেল! দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া রাধা বলিল—এর মানে কি ভাই?—

রাধার কথায় সহসা দীপ্তি তাহার পূর্ব্বের মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইল। অল্প একটু হাসিয়া বলিল—বিয়ে একটা বন্ধন কি না, তাই উনি হয় ত করুণা ক'রে আমাকে মুক্তির মধ্যে রাখ্‌তে চাইছেন।

দীপ্তির কথার অর্থ না বুঝিয়া রাধা হাসিয়া বলিল—তাই? না দুটো বিছানা পাশাপাশি থাক্‌লে অনেকটা জায়গা বাজে খরচ হয়, সেই জন্যে একটাকে বিদেয় দিয়েছে?—

দীপ্তি। তাও হ'তে পারে।

রাধা। কিন্তু খাবার সময় বিছানা নিয়ে তর্ক কর্‌লে ত আর পেট ভর্‌বে না, চল এখন স্নান কর্‌বে।—বিছানা-রহস্যটা তুমিই বুঝো, ওতে আমার হাত নেই।

রাধা কথা কয়টি বলিয়া দীপ্তির গাল একটু টিপিয়া দিল!

আহারের পর বসিবার ঘরে আসিয়াই রাধা মাথা-ধরার অছিলায় কপাল টিপিতে টিপিতে তাহার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল ; এবং অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসিয়া থাকিয়াও বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অসিত বলিল—একটা কথা ভাব্‌ছিলাম দীপ্তি, তোমার শরীর যদি না ভাল থাকে তাহ'লে যাদের আজ বিকেলে এখানে খেতে বলেছি তাদের বারণ ক'রে পাঠাই।

দীপ্তি মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল—আমার শরীর ভালই আছে।

অসিত। তাহ'লে ওরা আস্থক ?—

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তাহার পর আবার নীরবতা ধীরে ধীরে দুইজনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া এই প্রাণান্তকারী নীরবতার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অসিত বলিল—আমার একটু কাজ আছে দীপ্তি, সেগুলো একটু দেখ্‌ব, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, কাল থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ত জিরবার ফুরস্থৎ পাও নি।—'

দীপ্তি ইহারই পথ চাহিয়া ছিল কিন্তু ছুটি পাইয়াও সে উঠিতে পারিল না ! কিসে যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিল !

দীপ্তির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া অসিত বলিল—বাড়ীটা প্রকাণ্ড নয়, বেশী গোলমাল লাগ্‌বে না তোমার।—ঐ হল্‌টার বাঁ দিকেই রাধার ঘর কিন্তু তোমার ঘরে যাবার আলাদা পথ নেই, আমার ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে আস্‌তে হবে।

অসিত তাহার ঘরে আসিয়া বহুক্ষণ কাজের এবং ব্যস্ততার ভাণ করিয়াও যখন দেখিল, দীপ্তি আসিল না, তখন সে রাধার ঘরের কাছে আসিয়া বলিল—ওরে রাধা, জানিস্ আমি ব্যবসাদার মানুষ, একরাশ

কাজ ঘাড়ে চাপান আছে। তুই দীপ্তির কাছে একটু থাক্ না। বেচারী এক্‌লাটি রয়েছে !—

রাধা ঘরের বাহিরে আসিয়া রাগের সুরে বলিল—বাবা, কি ছেলে! খালি কাজ আর কাজ ; বৌটাকে একটু দেখ্‌তে পার না? চিরকাল কি আমি থাক্‌ব নাকি ?

অসিত। এখন ত দেখ্, পরের কথা পরে হবে।

রাধা বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল দীপ্তি তেমনি বসিয়া আছে! অনেক রকমের অনেক কথা তাহার মনে উঠিলেও সে হাসিয়া বলিল—কি অত্যাচার ভাই!—তা তুমি ওর কাগজ পত্তর সব কেড়ে নিতে পার্‌লে না? চল আমার ঘরে।

দীপ্তি যেন বাঁচিয়া গেল। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি রাধার মুখের উপর তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপরাহ্ণে, অসিতের নিমন্ত্রিত কয়েকটি বন্ধু এবং তাহাদের স্ত্রী আসিয়া নবদম্পতিকে শুভ-ইচ্ছা জানাইয়া কিছু কিছু যৌতুক দিয়া বহুক্ষণ আলাপ এবং জলযোগ করিয়া যখন বিদায় লইল তখন অনেকটা রাত হইয়াছে, এবং রাতের মতই একটি কালো ছায়া নিবিড় হইয়া দীপ্তির মনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা অসিতের দৃষ্টি এড়াইল না।

তিনজনে বসিয়া গল্প করিবার পর রাধা তাহার ঘরে গেল, দীপ্তির মনের ভয় মুখে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া অসিত বলিল—দীপ্তি, তোমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, আর একমিনিটও তোমাকে এ-রকম ভাবে ব'সে থাকৃতে দিতে পারি না।—এস।

আপনার অজ্ঞাতসারে দীপ্তির কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল—কোথায় ?

অসিত। তোমার ঘরে। এস, আর দেরী নয়।

দীপ্তি উঠিয়া কম্পিত পদে অসিতের অনুসরণ করিয়া চলিল। অল্প একটু পথ কিন্তু ইহারই মধ্যে যেন তাহার জীবনের মহাযাত্রার নির্দ্দেশ রহিয়াছে!

দীপ্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের কাছে আসিয়া অসিত বলিল—এই তোমার ঘর, সব জিনিষ তোমার হাতের কাছেই পাবে। তোমার বিছানাতেই আলোর স্বইচ্ আছে, ইচ্ছা কর্‌লেই জাল্‌তে বা নিভাতে পার্‌বে।

কথা বলিতে বলিতে দীপ্তিকে লইয়া তাহার ঘরে আসিয়া দেখাইল—এইখানে জলের কুঁজো আছে—তোমার ড্রেসিং-টেবিল ঐ জানালার ধারে, ঐ ছোট কুঠ্‌রিটা কাপড় ছাড়্‌বার ঘর, তার পরেই স্নানের ঘর। এই ঘরটায় বেশ আলো-বাতাস আসে, বিশেষ কষ্ট হবে না বোধ হয়। আর তোমার আর আমার ঘরের মাঝে ঐ পর্দ্দাটা ফেলা থাক্‌ল, ভয় পেও না, ওটা ঠেলে আমি তোমার ঘরে আস্‌ব না—কাল্‌কের ঘটনার পর আমার মনে হয়েছে, স্নেহ দিয়েও আমরা মানুষের ওপর অনেকখানি অত্যাচার ক'রে ফেলি। কিন্তু ভুল আমার যখন জান্‌তে পেরেছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি আসি—

কথা শেষ করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া তাহার ঘরে যাইবার সময় একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে অসিত বাহির হইয়া গেল।

অসিত চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ দীপ্তির কিছু করিবার শক্তি যেন ছিল না। আপনার কোন ভাবনা সে যেন ভাবিতেও পারিতে-ছিল না। শুধু বার বার তাহার মনে হইতেছিল—আশ্চর্য্য মানুষ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এ ত মুক্তি নয়, এ যে বন্ধনকে আরও কঠিন করিয়া দিল! বুঝি অত্যাচার করিলে মুক্তি সম্ভব এবং সহজলব্ধ হইত!

দীপ্তি অসহায়ভাবে বিছানায় আসিয়া আলো নিভাইয়া দিল, কিন্তু সেখানে শুইতে পারিল না। ঘরের মাটিতে অবসন্নভাবে লুটাইয়া পড়িল। প্রবল একটা ক্রন্দনের বেগ তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। দীপ্তি প্রাণপণে তাহা চাপিল কিন্তু নীরব অশ্রু বাধা মানিল না, তাহা তাহার গণ্ড ভাসাইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার বেদনাহত মন যখন বাহিরের সমস্ত জিনিষকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল তখন দেখিল অসিতের ঘরের আলোও নিভিয়া গিয়াছে এবং কে যেন তাহার ঘরের মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রান্তপদে চলিয়া বেড়াইতেছে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, সে চলার বিরাম নাই! দীপ্তির চোখে তন্দ্রাও আসে না, তাহার মাথার মধ্যে ঐ চলার শব্দ যেন লাগিয়াই রহিল।

পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থামিয়া গিয়াছে, রাত্রির গভীর স্তব্ধতা, বহুদূরের এমনি আর একটি চলার শব্দের প্রতিধ্বনি বহিয়া আনিয়া দীপ্তির বুকে ধাক্কা দিয়া গেল! সে শব্দ এমনই শ্রান্ত, এমনই বিরাম-হীন, হতাশার বেদনায় পূর্ণ।

দীপ্তির বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিল—মাগো, একি অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছি!...

সকাল বেলা চা খাইবার সময় অসিত দীপ্তির সহিত অত্যন্ত সহজ ব্যবহার করিল। তাহার কথায় এমন কিছুই প্রকাশ পাইল না যাহাতে মনে হইতে পারে কোন বিষয়ে বিরক্তি বা অসন্তোষ তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে।

বেলা দশটার মধ্যেই সে কাজে বাহির হইবার জন্ম সাজিয়া খাইবার ঘরে আসিয়া রাধা এবং দীপ্তিকে বলিল—'শ্যামের বাঁশী' বেজেছে, কিছু দাও নাকে-মুখে গুঁজে ছুট্ দিই।

বয়, টেবিলের উপর সমস্ত সামগ্রী রাখিয়া গেলে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আহারে লাগিয়া গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তোমাদের খাওয়া কি যখন খুশী ?—

রাধা হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই।

দীপ্তি একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া অসিত বলিল—চল্‌লাম দীপ্তি, আবার সেই রাতের বেলায় জ্বালাতে আস্‌ব তোমাদের।

হাসিতে হাসিতে সে ঘরের বাহির হইয়া টুপি ও ছড়ি লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মটরের শব্দ বহুদূরে গিয়া মিশিয়া গেল।

সমস্ত দিন রাধা এবং দীপ্তি ইচ্ছামত গল্প করিয়া কাটাইল। দুই জনেই যেন এই অপ্রতিহত অবসরটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিল। রাধা বলিল—আমি বোধ হয় এই প্রথম পনের বছর পরে সমস্ত শরীর-মন দিয়ে একটু বিশ্রাম কর্‌লাম। নিজেকে নিয়ে একা থাকা এর আগে হ'য়ে উঠে নি।

দীপ্তি। আমি হ'লে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।

রাধা। অত সহজ নয়। মানুষের শরীর-মন যে কি দিয়ে গ়া তা কেউ জানে না। সব স'য়ে যায়। আমিও ভাব্‌তাম, পাগল হয়ে যাব, কিন্তু হই নি, দিব্যি আছি।

সন্ধ্যার পর অসিত ফিরিয়া দুই জনের নিকট হইতে সমস্ত দিনের ঘটনার বিবরণ চাহিল।

রাধা বলিল—আমরা দুজনে সমস্ত দিন অনেক কিছু বলেছি বা করেছি কিন্তু তোমার কথা ভাবা বা তোমার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা, এ আমরা ভুলেও করি নি।

অসিত। বটে—ভুলেও না?—আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা দীপ্তি, তুমিই বল, সত্যি কি তাই?

দীপ্তি মহা বিপদে পড়িল। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অসিত পুনরায় বলিল—বল, বল্‌বে না?—

নিরুপায় হইয়া দীপ্তি বলিল—আজ বিশেষ কোন কথা হয় নি, তবে কাল অনেক হয়েছিল।

অসিত হাসিয়া বলিল—অনেক কথা? মানে, সব বাজে। তোমাকে রাধাটা যা-তা সব বলেছে নিশ্চয়ই?—আর তুমিও সব বিশ্বাস করেছ?—

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

দীপ্তির মুখের এই কয়টি কথাতেই অসিত মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিল। সে কথার পর কথার জাল বুনিয়া দীপ্তির মনকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। দীপ্তির আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ছেলে মানুষের মত বলিল—ওর যা-তা কথা কেন বিশ্বাস করলে তুমি?—

দীপ্তি আর কোন উত্তর দিল না, তাহার কপালে অশান্তির রেখা দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসিতের মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল।

দুইজনের কথার মধ্যে রাধা কখন্ চলিয়া গিয়াছে। সে থাকিলে বোধ হয় অনেকখানি শান্তি দুইজনে পাইত—অন্তত কথা বলার জন্য

এমন করিয়া ভাবিয়া মরিতে হইত না। ব্যথিত কণ্ঠে অসিত বলিল—আমি অপরিচিত হলে বোধ হয় তুমি এর চেয়ে সহজ ভাবে কথা বল্‌তে পার্‌তে, না দীপ্তি ?—

দীপ্তির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। সে তাহা থামাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, আমার ব্যবহারগুলো—

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অসিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দীপ্তির পাশে আসিয়া বলিল—না আমি কোন অপরাধ নিই নি, তোমাকে কোন দিক দিয়েই আমি সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছি না এই কথাটা ভেবেই কেবল খারাপ লাগ্‌ছে, আর কিছু না। তুমি যাও তোমার ঘরে, রাধাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব কি ?

দীপ্তি বলিল—না—আমি একা থাক্‌তে চাই—

অসিত। কাল তুমি সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলে। আজ মনটাকে হাল্কা ক'রে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করগে। শরীর ভাল থাক্‌লে অনেক অশান্তির হাত এড়াতে পার্‌বে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়্‌লে হয় ত তা সহজ হবে না দীপ্তি !

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। অসিত তাহার ঘরে আসিয়া বসিল এবং পূর্ব্ব রাত্রির মত নবদম্পতির আর একটি রাত্রি কাটিল।

তাহার পর আরও কয়েকটি দিন এবং রাত্রি এমনই নিরানন্দ ও অশান্তির ভিতর দিয়া কাটিবার পর একদিন সকালে রাধা হাসিতে হাসিতে বলিল—আমার পরওয়ানা এসেছে, এবার যেতে হবে।

অসিত। যাবি ঠিক করেছিস্ ?—

রাধা। হাঁ।

অসিত। তোর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যদি এখানেই থাকিস্ তাহ'লে কি হয় ?—

রাধা। তা হ'তে পারে না, তার কারণ ত তোমায় বলেছি। তবে মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে এসো, তাতেই হবে।

রাধা তখন তাহার ঘরে জিনিষ-পত্র গুছাইতেছে, দীপ্তি আসিয়া বলিল—তুমি কেন যাবে ?—কার কাছে যাবে ?—

রাধা। কার কাছে ?—কেন সবাই ত রয়েছে, আমার অন্ধ স্থবির শাশুড়ী, দেবতার মত ভাসুর, বালিকা বিধবা একটি ননদ. আর আমার দুঃখ-সাগর মন্থন করা দুটি ছেলে-মেয়ে। এরা সবাই আমার পথ চেয়ে আছে। আমি না থাক্‌লে সবার ভয়ানক কষ্ট হয়, অসুবিধার শেষ থাকে না।

দীপ্তি। আর তোমার স্বামী ?—ইচ্ছে ক'রে এই নিগ্রহ মাথায় তুলে নেওয়ার মধ্যে কি সার্থকতা আছে ?

রাধা। সে-কথা আমার ভাব্‌বার দরকার নেই ভাই, আমি জানি, শত চেষ্টাতেও এই পনের বছরের একটি দিনের গ্লানিও মুছে ফেল্‌তে পার্‌ব না। তাই আমি মুক্তির কথা ভাবিও না।

রাধা চলিয়া যাইবার পর অসিত দীপ্তিকে বলিল—এখন দুপুরে একা থাকৃতে ত তোমার কষ্ট হবে, যদি বল আমি অফিস যাবার সময় তোমাকে তোমার মা'র কাছে রেখে আস্‌তে পারি, আবার ফের্‌বার সময় নিয়ে আস্‌ব, যাবে ?—

দীপ্তি সম্মতি জানাইল। এইভাবে একান্ত আপনার হইয়াও অপরিচিতের মত ইহাদের দিন কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন

বন্ধু আসিয়া অল্প কিছুক্ষণের জন্য দুইজনকে প্রফুল্ল করিয়া দিয়া যায়। এই ক্ষণিকের অতিথিদের আগমন-প্রতীক্ষায় দুই জনে পথ চাহিয়া থাকে, কেহ আসিলে বা আসিবার কথা হইলে উভয়েই অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠে। ঐ সময়টুকুর জন্য তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর মত ব্যবহার করে।

কিন্তু উভয়েই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিল—মানুষের শক্তি এবং সহ্যের সীমা আছে। এবং এই কথাটি অসিত একদিন রাত্রে দীপ্তিকে তাহার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিয়া ফেলিল।

দীপ্তি তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অসিতের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আমিও তাই ভাব্‌ছি।

অসিত। কি ভাব্‌ছ?

দীপ্তি। এ-রকম ক'রে বেশী দিন চল্‌তে পারে না, একদিকে এসে দাঁড়াতে হবে।

অসিত। কোন্ দিকে?—

দীপ্তি। সেটা কাল আমি আপনাকে বল্‌তে পারব বোধ হয়, আজকের মত আমায় ছুটি দিন্, এই একটি রাত মাত্র, তারপর—

অসিত। তারপর কি দীপ্তি?

দীপ্তি। হয় আমাকে বা আমার যা-কিছু সমস্তই আপনার খুব কাছে পাবেন, নয়, আমি আর এখানে থাক্‌ব না। আপনার কাছ থেকে একেবারে দূরে গিয়ে দাঁড়াব।

অসিত। তোমার বিচারের প্রতিবাদ আমি করব না তা সে যেমনই হ'ক। শুধু আমাকে এই অসহায় অবস্থার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেল দীপ্তি, তোমার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ থাক্‌ব। দিনের

পর দিন দেখ্‌ছি আমার চোখের সাম্‌নে শুখিয়ে উঠ্‌ছ! তোমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিতে পারি না।—এ যে সহ্য করা যায় না দীপ্তি।

অসিতের এই কথায় দীপ্তি এই প্রথম চোখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে!—কি সুন্দর পুরুষ, কি নির্ম্মল ইহার স্নেহের বন্ধন! দীপ্তির সমস্ত শক্তি যেন ইহার চোখের দৃষ্টিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

পরদিন সকালে বাহিরে যাইবার জন্য সাজিয়া দীপ্তি চা খাইতে আসিল। অসিত বলিল—সকালেই যাবে মা'র কাছে?—

দীপ্তি। না, আমার এক বন্ধুর কাছে এখন একবার যাব, সেখান থেকে বাড়ী যাব। সন্ধ্যাবেলা ফির্‌ব।

অসিত। ড্রাইভারকে গাড়ীর জন্যে ব'লে দেব কি?

দীপ্তি। না, কাল মাকে গাড়ী পাঠাবার জন্যে ব'লে এসেছিলাম, একটু পরেই আস্‌বে।

অসিত। দীপ্তি, কাল তোমাকে ঐ কথাটা ব'লে ফেল্‌বার পর আমার মনে হ'ল, আমি অন্যায় করেছি। এত অল্পে তোমাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হয় নি।—থাক্‌ দরকার নেই, তুমি যেমন আছ থাক, আমি আর কিছু চাই না, তুমি যেও না, যেটুকু তোমায় পেয়েছি—

কথা বলিতে বলিতে অসিত থামিয়া গেল। তাহার নিজের কথা তাহার কানে যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল! কিছু সংযত হইয়া বলিল—আমাকে এমন দুর্ব্বল কেউ কোন দিন দেখে নি, তোমার কাছে যে ভাবে কথা বল্‌ছি এমন ক'রে আর কারো কাছে বলি নি কোন দিন।—'

দীপ্তি। কেন নিজেকে এমন ক'রে অপমান কর্‌ছেন?

অসিত। অপমান? তুমি যেদিন থেকে এ বাড়ীতে এসেছ, সেদিন থেকে আমি একেবারে বদ্‌লে গেছি দীপ্তি! আমি নিজেকে দেখে নিজেই এখন অবাক্ হয়ে যাই! আগে বল্‌তাম জীবনটা 'ব্যবসাদারী'তে চলে, এখন মনে হয় ওটা মস্ত ভুল! দুঃখ অপমান সব সহ্য করা যায়—সব অগ্রাহ্য করা যায়।—ভালবাসার মানুষকে পেলে। ভালবাসার শক্তি আমি প্রাণে মনে অনুভব কর্‌ছি দীপ্তি।

দীপ্তি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের বাহিরে কে বলিয়া উঠিল—গাড়ী আয়া হুজুর——

অসিত ম্লান হাসিয়া বলিল—যাও। কিন্তু এই শেষ, একথা আমি বল্‌ব না—তুমি বল্‌লেও না।

—৩৩—

সকাল বেলাটা সাধারণত বিকাশ এবং জীবন, গল্প বা কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া কাটায়। এই প্রথা তাহাদের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। বিশেষত মুনি থাকিতে এক দিনের জন্যও ব্যতিক্রম হয় নাই। মুনি চলিয়া যাইবার পর বিকাশ এবং জীবনের ব্যক্তিগত কয়েকটি অবস্থাবিপর্য্যয়ে, সকাল বেলাকার এই অবসরটুকু একসঙ্গে বসিয়া উপভোগ করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে বিকাশকে বাহিরে কোথাও না যাইতে দেখিয়া জীবনও বাড়ীতে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেদিন বিকাশকে

বিশেষ প্রফুল্ল দেখিয়া সে সাহস করিয়া তাহার কাছে বসিয়া হাল্কা ভাবের নানা কথা পাড়িয়া দিল। বিকাশও তেমনি সহজভাবে সমস্ত কথার উত্তর দিতেছে দেখিয়া জীবন হাসিয়া বলিল—তুমি আজকাল গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছ নাকি বিকাশ?—

বিকাশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল—গোয়েন্দাগিরি মানে?

জীবন। মানে, সন্দেহজনক কিছু কিছু দেখেছি, তাই জিগ্‌গেস কর্‌ছি।

বিকাশ। কি সন্দেহজনক দেখেছ শুনি?—

জীবন। এই ধর গভীর রাতে যদি কেউ তোমার ঘরে আসা-যাওয়া করে?—

বিকাশ। গভীর রাতে আমার ঘরে কা'কেও আস্‌তে দেখেছ নাকি?

জীবন। ঠিক রাতে নয়, তবে তাকে ভোর-ভোর গা-ঢাকা দিতে দেখে মনে হয়েছিল, ও গভীর রাতেই আসে।

বিকাশ। ও বুঝেছি তুমি কা'কে দেখেছ। কিন্তু সেই প্রথম আর শেষ। তুমি তাকে কি ক'রে দেখ্‌লে?

জীবন। আগে বল ও কে, তারপর আমিও বল্‌ব। তোমার গোয়েন্দার ওপর আমিও কিছু গোয়েন্দাগিরি করেছি। ওকে জোগাড় কর্‌লে কোথা থেকে?

বিকাশ। আমি ওকে জোগাড় করি নি, ও-ই আমায় জোগাড় করেছিল। অদ্ভুত!

কথা কয়টি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। জীবন ব্যস্ত হইয়া বলিল—দোহাই বিকাশ, ঐ দাগগুলো

আর কপালের ওপর ফেলো না। অনেক কষ্টে ও-জায়গাটা একটু পরিষ্কার হয়েছে, তাকে আর—নোংরা ক'রো না।

বিকাশ। তুমি ঐ লোকটির সম্বন্ধে কি জেনেছ শুন্‌তে চাই।

জীবন। তুমি কি জেনেছ আগে শুনি।

বিকাশ। আমি কিছুই জানি না। ওর নাম পর্য্যন্ত আমি জিগ্‌গেস করি নি।

বিকাশের গলার স্বর নকল করিয়া জীবন বলিল—অদ্ভুত!

বিকাশ। কেন?

জীবন। একসঙ্গে রাত্রিবাস কর্‌লে অথচ তুমি তার কিছুই জান না?

বিকাশ। না, তার কোন দরকার বোধ করি নি। অবশ্য তার ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই, কারণ আর একজনের খুশীর খোরাক জোগাবার জন্যেই সে এসেছিল।

জীবন। এই আর একজনটি কে?

বিকাশ। যিনি আমার মায়ের স্থান পূর্ণ কর্‌তে চাইছেন।

জীবন। তাহ'লে তুমি চটেছ তাঁরই ওপর?

বিকাশ। হাঁ।

জীবন। তাঁর অপরাধ? তোমার কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করে—

বিকাশ বাধা দিয়া বলিল—তাঁর আশঙ্কার কোন হেতু ছিল না।

জীবন। সেই জন্যেই তুমি তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করেছ বুঝি?

বিকাশ। ভাব্‌ছি আমার ওপর তাঁর বিশ্বাস যেদিন জন্মা'বে সেদিন যাব।

জীবন আবার বিকাশের গলার স্বর নকল করিয়া বলিল—অদ্ভুত!

বিকাশ হাসিয়া বলিল—তা না হয় হ'লাম, তুমি কি জেনেছ বল।

জীবন। আমি শুরকিগঞ্জ থেকে ফিরে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠ্ছি, সে নাব্ছিল। আমাকে দেখে সে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। সে বল্ল—কাল রাতে এখানেই ছিলাম। আপনি বিকাশের বন্ধু, না?

আমি বল্লাম—এখন পর্য্যন্ত তাই বলেই আমার বিশ্বাস।—কেন?

সে বল্ল—কাল রাতে বিশেষ ক'রে একটা কথা মনে হ'ল, সারটিফিকেট্ দেখিয়ে বন্ধুত্ব হয় না, ওটার প্রয়োগ চাকরীর বাজারেই প্রশস্ত।

বিকাশ। তুমি ওকে জান্তে?—

জীবন। ঠিক জান্তাম না, তবে ওকে বিমলের কাছে মাঝে মাঝে আস্তে যেতে দেখেছি। বিশেষ পরিচয় ছিল না, তবে নামটা শুনেছি, মুকুল দেব।

বিকাশ ঔৎসুক্যভরা কণ্ঠে বলিল—মুকুল দেব! তুমি ঠিক জান?

জীবন হাসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—ঐ নামের সঙ্গে তোমার কিছু জড়িয়ে গেছে নাকি?—অমন ক'রে উঠ্লে যে?

বিকাশ। সেদিন রাত্রে যদি শুন্তাম, তাহ'লে হয়ত তার সাম্নেই এমনি ক'রে লাফিয়ে উঠ্তাম।

জীবন। এমনি নামমাহাত্ম্য? তা একবার ভদ্রতার খাতিরে না হয় জিগ্গেস করতে—কে আপনি?—

বিকাশ। সেদিন সে ক্ষমতাটুকুও আমার ছিল না। মনে হয় তাকে বস্তেও বলি নি। সে চুপ ক'রে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলেছিলাম, যখন যাবেন, দয়া ক'রে আমার চাকরকে ব'লে দেবেন দরজাটা যেন বন্ধ ক'রে দেয়—

জীবন। তারপর?

বিকাশ। তারপর আমি শুয়ে পড়্লাম আর মনে হ'ল, সে উঠে আমার ঘরের বাইরে চ'লে গেল।

জীবন। কিন্তু যায় নি।

বিকাশ। তা জানি। আমি ঘুমিয়ে পড়্লে সে আবার ঘরে এসে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস করেছে সমস্ত রাত, আমি ভেবেছিলাম তুমি। ভোরে তাকে দেখে বিরক্ত হয়েছি, সে বিরক্তি আমার মুখে ফুটে উঠ্তে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছে—আপনার মা'র আদেশে এতখানি ধৃষ্টতা আপনার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেছি।

—তারপর সে চ'লে গেছে, আমি ফিরেও তাকাই নি।—কিন্তু তুমি ওর নাম ছাড়া আর কিছু কি ওর সম্বন্ধে জান না?

জীবন। এ যে দেখি তোমার ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা! না হ'ক ছেলে বাবা! কিন্তু ও কে তা যদি বলি—তা হ'লে এখুনি ছুটবে ওর কাছে।—কয়েক বছর আগে বিমল তার যে শিল্পী-বন্ধুকে দিয়ে তোমার মামীমার মূর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিল, ও সে-ই। সেটার একখানা কপি আজও ওর studio-তে আছে। বিমলের সঙ্গে ওর ওখানে একদিন গিয়েছিলাম।

বিকাশ কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—চল এখন ওর কাছে যাই—

সহসা বিকাশের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল! সে তাহার চেয়ারে বসিয়া সাম্‌নের একটি বড় আয়নার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া আছে দেখিয়া জীবনও সেই দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিকাশের চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হইয়া যাইতেছে। জীবন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—দীপ্তি—মিসেস্ বিশ্বাস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! ওঁকে এনে বসাও।

কিন্তু বিকাশের উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবন নিজেই দীপ্তির কাছে আসিয়া বলিল—ভিতরে আসুন—'

আয়নার উপর চাহিয়া বিকাশ দেখিল, পিছনের দিক হইতে দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহার দৃষ্টিও আয়নায় প্রতিফলিত বিকাশের মুখের উপর নিবদ্ধ।

বিকাশ সহসা উঠিয়া দীপ্তির দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—এস, বিশেষ দরকার ছিল কি? আমাকে ডেকে পাঠালেই পার্‌তে।—ব'স, ভাল আছ ত?

বিকাশের মুখের দিকে চাহিয়া দীপ্তি বলিল—কতকগুলো কথা জিগ্‌গেস কর্‌তে এসেছি, তোমার সময় হবে কি?

আপনাকে এখানে অনাবশ্যক মনে করিয়া বিকাশের দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—তোমরা ব'স, আমি স্নানটা সেরে নিই গে।

জীবনের দিকে ফিরিয়া দীপ্তি বলিল—ভয়ানক দরকারে পড়ে ওঁর কাছে এসেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না জীবনবাবু—'

জীবন চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—না-না, কি মুস্কিল!—এর মধ্যে মনে করা-করির কি আছে?

দীপ্তিকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিকাশ বলিল—ব'স, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! কি কথা বল্‌তে এসেছ?

বিকাশের পাশে একটি চেয়ারে বসিয়া দীপ্তি কিছুক্ষণ আপনার চিন্তাগুলিকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে সহসা মাথা তুলিয়া বলিল—আমি জান্‌তে এসেছিলাম, জীবনের সমস্ত ভুলেরই সংশোধনের উপায় বা পথ আছে কিন্তু আমি যে ভুল করেছি তাকে সংশোধন কর্‌বার কি কোন উপায়ই নেই?—

বিকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভুল করেছ ব'লে তোমার মনে কি ধারণা জন্মেছে দীপ্তি ?

দীপ্তি। হাঁ। আমার এ ভুল আমি নিজেই আর সহ্য করতে পারছি না। এই ভুল করবার পূর্ব্বে আমি অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছি, কিন্তু পাই নি, দিদির কাছেও না।—আজ তোমার কাছে এসেছি।

বিকাশের বুকের মধ্যে যেন কে দারুণ এক আঘাত দিয়া গেল। সে ম্লান হাসিয়া বলিল—আমি কি করতে পারি বল ?—

দীপ্তি। আমায় পথ ব'লে দাও। নইলে বাঁচা দায় হয়ে উঠবে।

বিকাশ বলিল—দীপ্তি, অপরাধ করলে মানুষের কাছে, দেবতার কাছে ক্ষমা পাওয়া যায় ; কিন্তু ভুলের শাস্তি পেতেই হবে,—ভুলের ক্ষমা নেই।

দীপ্তি আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ক্ষমা নেই ?—

বিকাশ। না দীপ্তি।

বিকাশের মুখের কথা শেষ হইলে দেখা গেল, দীপ্তি জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার চোখের ভিতর দিয়া যেন তাহার উন্মত্ত প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বিকাশ বলিল—যে ভুলকে আশ্রয় ক'রে তুমি জীবনের পথ চলতে সুরু করেছ, সেই ভুল পথেও শান্তি আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তারপর একদিন ঐ ভুলকেই তোমার ভাললাগবে. তোমার নিজের হাতে গড়া ঐ ভুলও একদিন সত্য সুন্দর হয়ে উঠবে; বিশ্বাস রেখে চ'লে যাও।

দীপ্তিকে তখনও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বিকাশ বলিল—পারবে না দীপ্তি ?—শুধু নিজের কথা ছাড়া

আমার কথাও একবার ভাব।—সব সহ্য করতে চেষ্টা করছি, সব সহ্য করব, কিন্তু তুমি যদি এখন কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর, আমার মন গ্লানিতে ভরে যাবে।—যা আমার একান্ত আপনার ছিল, তা-ই ডাকাতি ক'রে নিতে পারব না। তাতে আমার ভালবাসার অপমান হবে।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া দীপ্তি বলিল—ঠিক বিয়ের আগে আর বিয়ের পরও আমি ঐ ভাবনাটা ভাবছিলাম। কত বার ভেবেছি ছুটে তোমার কাছে চ'লে আসি!—কিন্তু এখন সে-কথা ভাবি না। এখন শুধু ভাবি, কি ক'রে নিজেকে নিয়ে আমার জীবনের এই এতগুলো দিন কাটাতে পারব—শুধু আমি একা, এখানে আর কেউ থাকবে না—তুমিও না। এই কথাটাই জানতে এসেছি তোমার কাছে। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি আমার পথ ক'রে নেব।

বিকাশ। আমার মতামতকে খুব বড় মনে কর কি?—

দীপ্তি। প্রথমে করতাম, এখনও করি, শুধু মাঝের ক'টা দিন বিশ্বাস হারিয়েছিলাম।

বিকাশ। আমার অনুমতির ওপরই কি সব নির্ভর করছে দীপ্তি?

দীপ্তি। হাঁ, তুমি যা বলবে আমি তাই শুনব, কোন বিচার-বিবেচনা আর করতে পারি না।

বিকাশ কিছুক্ষণ দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—সমস্ত সুখ তুমি আমার কেড়ে নিয়েছ, তার বদলে কিছু শান্তি আমায় দিয়ে যাও।

দীপ্তি। বল কি করব? তোমাকে কোন দিক দিয়ে একটু শান্তি দিতে পেরেছি মনে হ'লেও বাঁচতে পারব, হয় ত সব সহ্য হয়েও যাবে।

বিকাশ বলিল—তোমার স্বামীর ঘর ভ'রে দাও, তার বুক ভ'রে দাও, তার জীবনে শান্তি সুখ তৃপ্তিকে পরিপূর্ণ ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা কর।—তোমার কাছে এই একটি ভিক্ষা চাইছি দীপ্তি। তোমার কাছে আর কিছুই চাইবার নেই, কিছু আশা কর্‌বারও নেই আমার।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দীপ্তি বলিল—কথাগুলো সব দিক দিয়ে ভেবে বলেছ কি আমায়?—

বিকাশ। হাঁ—পার্‌বে না?

দীপ্তি। পার্‌ব।

কথাটি শেষ করিয়াই দীপ্তি উঠিতে গেল কিন্তু সহসা তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব করিল এবং চলিতে গিয়া একটু টলিয়া পড়িল।

বিকাশ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে হাসিয়া বলিল—না থাক্, দরকার হবে না। আমি আসি—

বিকাশ বলিল—এস।

দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দীপ্তি বলিল—আমাকে একটু কাগজ দাও না, একটা চিঠি লিখ্‌ব।

বিকাশ তাহাকে তাহার টেবিলে লইয়া গেলে একখানি কাগজ লইয়া দীপ্তি কি লিখিতে বসিল। বিকাশ মুগ্ধের মত তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিকাশের মনে হইতেছিল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে! কিম্বা দীপ্তি এবং তাহার মধ্যে যে বিচ্ছেদ-পারাবার অনন্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

লেখা শেষ করিয়া চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া সেখানি বিকাশের হাতে দিয়া, দীপ্তি বলিল—আজ সমস্ত দিনটা আমার হাতে আছে।

এখন আমি একবার মা'র কাছে যাব, সেখান থেকে দিদির কাছে আস্‌ব। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানেই থাক্‌ব। এর মধ্যে যদি তোমার মতের বদল হয় তাহ'লে এই চিঠিটা খুলে প'ড়। যদি কিছু বল্‌বার থাকে, আমাকে দিদির ওখানেই পাবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর আমার সময় হবে না।

বিকাশ। আমার মতের বদল না হ'লে এটা খোল্‌বার দরকার নেই কি?—

দীপ্তি। না।

বিকাশ চিঠিখানি হাতে লইয়া কি ভাবিল, তাহার পর সেখানি একটি হাতবাক্‌সে রাখিতে গেলে দীপ্তি পুনরায় বলিল—মনে রেখো, উত্তর দেবার থাক্‌লে সন্ধ্যার পূর্ব্বে, তার পরে নয়।

বিকাশ বলিল—আচ্ছা।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বাড়ী আসিয়া দীপ্তি সকলকে লইয়া কিছুক্ষণ হাসি গল্প করিয়া ঠিক আহারের সময় বলিয়া বসিল—আমি আজ দিদির সঙ্গে খাব।

করুণা বলিলেন—সে জানে তুই আজ আস্‌ছিস্?—

দীপ্তি। জানাব আবার কি?—দেখি না, রাক্ষুসীটা মুখের ভাত কেড়ে খেলে কি করে।—তোমার গাড়ীটা এখন ওখানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আবার সন্ধ্যার সময় যেন যায়।

হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল—চল, বড়-দিদিমণির বাড়ী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার গাড়ী মায়ার বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল।

ভিতরে আসিয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল—দিদি পোড়ারমুখী, তোকে আজ একটু জ্বালাতে এসেছি, তোর হুকুম মানি না।

মায়া অবাক্ হইয়া গেল। বিবাহের পর দীপ্তি এই প্রথম তাহার কাছে আসিল। কিন্তু বিস্ময়ের ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া সে বলিল—গিলেছিস্, না, না?

দীপ্তি। না, তোর সঙ্গে খাব। ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

কমলা তখন স্নান সারিয়া তাহার ঘরে যাইতেছিল। দীপ্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবাক্ হইয়া সেই ঘরে আসিতেই দীপ্তি ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—তোর ধোয়া মুখটা নোংরা ক'রে দিই।

দীপ্তি কমলার মুখচুম্বন করিল।

দীপ্তি বলিল—আজ আমার ছুটি, তোদের সঙ্গে এখানে খুব চেঁচামেচি করব।

বাস্তবিক করিলও তাই! কিন্তু তাহার সমস্ত কথা সমস্ত কাজের মধ্যেই এমন একটি অস্থিরতা ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল যাহা লক্ষ্য করিয়া মায়া এবং কমলা কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছে।

বেলা যতই বাড়িয়া যাইতেছিল দীপ্তির অস্থিরতাও ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। কয়েকবার গাড়ী বা লোক-চলাচল দেখিবার উপলক্ষ্য করিয়া সে পথের ধারের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছে। তাহার পর বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইল—অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওঠা!

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসার সঙ্গে অবসাদে যেন তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল। আকাশের শেষ আলোকলেখা যখন মিলাইয়া

গেল, দীপ্তির শরীর হইতে সমস্ত রক্তবিন্দুও সেই সঙ্গে যেন শুখাইয়া গেল!

কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে সামনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মায়াকে বলিল—এবার যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে—'

কমলা বলিল—আবার কবে আস্‌বি ?

দীপ্তি। ঘর-সংসার ফেলে কি রোজ রোজ আসা যায় ? আমি এখন ঘোর সংসারী। তোরাই এবার একদিন যাস্‌।

নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার চোখ দুটি আর একবার দূরে, বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় পাশের কোন একটি বাড়ীর ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল।

দীপ্তি চকিত ভাবে পিছন ফিরিয়া মায়া এবং কমলাকে বিদায়-চাহনি দিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কমলা বলিল—আমার যেন কি মনে হ'চ্ছে মায়া!—

মায়া। কি মনে হ'চ্ছে শুনি ?

কমলা। ও আজ ঠিক আমাদের কাছেই আসে নি।

মায়া বলিল—সে তুই এখন বুঝ্‌লি ?

* * * *

অফিস হইতে ফিরিয়া ঘরের আলো না জ্বালিয়া ক্লান্তভাবে অসিত একটি চেয়ারে বসিয়াছিল। আজ সে মন দিয়া কোন কাজই করিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা তাহার অত্যন্ত অশান্তির ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া দীপ্তিকে না দেখিতে পাইয়া সে আরও

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দীপ্তির সম্বন্ধে দারুণ একটা সংশয়ও ধীরে ধীরে বোঝার মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল, এই সময়ে দীপ্তিকে তাহার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে অসিতকে দেখিতে পাইয়া দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইল।

অসিত কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—দীপ্তি—

দীপ্তি বলিল—আমি এসেছি।

অসিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এসেছ ?

দীপ্তি বলিল—হাঁ।

অসিত। এই আসার জন্যে আবার যদি কোন গ্লানি মনে জাগে তোমার কোন দিন ?—

দীপ্তি। তাহ'লে এতদিন যেমন ক'রে আমার বিচার না ক'রে আমায় সব দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছ, সহানুভূতি দিয়ে আমার সব কাজেই প্রভুত্বের চেয়ে দরদ দেখিয়েছ তেমনি ব্যবহার তখনও যেন পাই। আবার সব সহজ হয়ে আস্‌বে।

দীপ্তিকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া অসিত তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—তোমার কাছে আমার অনেক শিক্ষা হ'ল দীপ্তি। আগে ভাব্‌তাম তোমাকে পেলেই আমি সুখকেও পাব, এখন মনে হয় তোমাকে সুখী করতে না পা[illegible] আমার তা পাবার আশা নেই।

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার মুখখানি অসিতের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—নাও, এখন আর আমার কোন সঙ্কোচ নেই।

—৩৪—

বিবাহের পর দীপ্তি যেদিন পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইল, সেদিন করুণা বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখিয়া সহস্র চেষ্টা করিয়াও মায়া বলিতে পারিল না, সে-ও আজ যাইতে চায়। বহুবার বলিবার জন্য আসিয়াছে কিন্তু বলা হয় নাই। সেই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ হয় ত বলিয়াছেন—মায়া, বেশ মেয়ে যা-হোক! আমার মাথার পাকাচুলগুলোর ওপর monopoly বসিয়ে এখন তোল্‌বার নাম নেই!

করুণা বলিয়াছেন—হাঁ, খেটে খেটে বেচারী হয়রান হ'ল, এখন তোমার পাকাচুল তুল্‌তে বসুক! আয় মায়া, আমার কাছে ব'স্।

মায়ার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরের দিন সকালে আর পারিল না। করুণাকে বলিল—ছোটমাসী, আমি যদি আজ না যাই, বিকাশ এসে ফিরে যাবে।

করুণা কিছুক্ষণ মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যা—

মায়াকে তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে দেখিয়া স্বর্ণ আসিয়া বলিলেন—তুই আজই যাবি নাকি?

মায়া বলিল—হাঁ, মা।

স্বর্ণ বলিলেন—আমি ভাব্‌ছি আমিও যাই, কি বলিস্?—

মায়া ভীতভাবে বলিল—তুমি যাবে?—না মা, সে হ'তে পারে না—

স্বর্ণ। পারে না মানে? উনি এসেছেন, তা ছাড়া ঘর-বাড়ী ফেলে এখানে আর কতদিন থাক্‌ব?

মায়া। তা হ'ক মা, এতদিন যখন কেটেছে তখন আর কিছুদিনও কাটুতে দাও।

স্বর্ণ বলিলেন—আমি গেলে তোর পড়ার ক্ষতি হবে মায়া?

স্বর্ণের গলা জড়াইয়া মায়া বলিল—তুমি গেলে বিকাশ আর আস্‌বে না। ও যদি না আসে আমার কাছে, তাহ'লে হয় ত আমাকেই ওর কাছে যেতে হবে; সেটা আমি এখন কর্‌তে চাই না মা।

স্বর্ণ কি ভাবিয়া বলিলেন—আচ্ছা। তাহ'লে ওঁকে একটু বেশী ছুটোছুটি কর্‌তে হয়, তা আর উপায় কি?

মায়া অবাক্ হইয়া গেল।

স্বর্ণের মুখে এমন স্বরের কথা সে বেশী শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কোথাও কোন প্রতিবাদের আভাস পাইলে যে মানুষ একদিন জ্বলিয়া উঠিতেন, তিনিই এত বড় একটা ব্যাপারকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলেন!

মায়া আদর করিয়া বলিল—তোমার রাগ হ'ল মা?—

স্বর্ণ বলিলেন—দূর্ পাগ্‌লা মেয়ে, তোর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে, আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকি।

কিন্তু যাহার জন্য এত তাড়াতাড়ি করিয়া মায়া বাড়ী ফিরিল, তাহাকে সে কিছু দিন দেখিতে পাইল না! প্রতিদিন যে আসে, তাহার অনুপস্থিতি বিশেষ করিয়া মনে লাগে। চিঠি লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিকাশ উত্তরে লিখিয়াছে—মেলাই কাজ ঘাড়ে পড়েছে। অনেক দিন হিসেব-পত্তর কিছুই দেখ্‌তে পারি নি, সেগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।—সময় পেলেই যাব।

চিঠির প্রত্যেকটি কথা কেমন অদ্ভুত বলিয়া মায়ার মনে হইল। এ যেন বিকাশের চিঠি নয়! তবু সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার এই অপেক্ষার সময়টুকু ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া দারুণ একটা অশান্তিতে তাহার মন ছাইয়া গেল। বারে বারে সে ছোট-মেয়ের মত কমলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—ও কেন আসে না? আমার ওপর রাগ হয়েছে? কি করেছি আমি?—

কমলা অবাক্ হইয়া যায়! সে বলে—মানুষকে মুগ্ধ কর্‌বার, জয় কর্‌বাব সব উপকরণ তোর আছে, কিন্তু তোকে যখন এমন ছেলে-মানুষের মত কথা বল্‌তে শুনি তখন তোকে আর মায়া ব'লে মনে হয় না, আমাদের মতই সাধারণ মেয়ে মনে হয়।

বিবাহের রাত্রে যে মানুষটিকে সে বিকাশের নিকট পাঠাইয়াছিল তাহারও কোন সন্ধান মিলিল না! কিন্তু ইহার জন্য মুকুলকে সে দোষী করিতেও পারিল না, কারণ সে নিজেই তাহাকে বলিয়াছে—আপনি আজ ওর কাছে আছেন জান্‌লেই আমি অনেকটা শান্তি পাব। আমাকে খবর দেবার জন্য ব্যস্ত হবেন না।

এই কথা কয়টি সে যে কেন বলিয়াছিল তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

তাহার পর দীপ্তির সেদিনকার বিস্ময়কর আবির্ভাবে সে অনেক-খানি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, তবু ইহা লইয়া বেশী চিন্তা করিবার অবসর তাহার ছিল না। তাহার অধ্যয়নের দিনগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া পরীক্ষার দিনগুলি নিকটতর হইয়া আসিতেছিল।

আরো কিছুদিন কাটিবার পর একদিন আপনার শরীর মন অত্যন্ত অবসন্ন অনুভব করিয়া সে শ্রীশকে বলিয়া ফেলিল—শ্রীশ-দা, তোমাকে আর ভোগাতে চাই না। তোমার ছুটি।

শ্রীশ অবাক্ হইয়া বলিল—মানে ?—

মায়া বলিল—আর এক লাইনও পড়্ব না, যা হয় হবে। এই শেষ সপ্তাটা বই আর নোট্‌স্ সব ভুলে যাব।

শ্রীশ হাসিয়া অঙ্গুলি দিয়া শূন্যে গোলাকার একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকিয়া দিল!

মায়া বলিল—ব'য়ে গেল।

শ্রীশ। তাহ'লে আমার আর আস্‌বার দরকার নেই ত?

চন্দ্রকুমার তখন কি একখানা বই লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ইহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—দরকার নেই মানে?—না শ্রীশ, সে হবে না বাবা, তুমি যেমন আস, তেমনি এস, ওটা পড়ে পড়্‌বে, না পড়ে ব'য়ে গেল।

শ্রীশ বিরক্তির স্বরে বলিল—কিন্তু এই দোটানার মধ্যে পড়ে প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল মেসো-মশাই।

মায়া হাসিতে লাগিল। চন্দ্রকুমার বলিলেন—তা ছেলে হয়ে যখন জন্মেছ তখন ওকথা ব'লে আর কষ্ট পাও কেন? এই দেখ না আমাকে—কোথায় শুর্‌কিগঞ্জ আর কোথায় কপূ‌রীটোলা! তবু ঐ যাকে বলে মাকুর মত সমানে টানা আর পড়েন বুনে বুনে চলেছি; কোথাও একটু খিঁচ্ থাক্‌বার জো নেই!

মায়া হাসিয়া বলিল—একবার রেখে দেখ না মজাটা।—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—মেসো-মশাই মজা ঢের দেখেছেন, আমিও কম দেখ্‌লাম না।

মায়া বলিল—সত্যি তোমার কষ্ট হয়?

শ্রীশ। হ'লে আর কি কর্‌ছি বল্?

মায়া অভিমান করিয়া বলিল—তা হ'লে থাক্। তুমি এস না, বা সময় পেলে এস।

শ্রীশ বলিল—আমি তোর হুকুমের চাকর কিনা, তুই বল্‌বি তবে আমি আস্‌ব!

চন্দ্রকুমার তাঁহার সরল মনের উচ্চ হাসির শব্দে ঘরখানি ভরিয়া দিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ চলিয়া যাইবার পর মায়া এবং কমলা তাহাদের ঘরে কোন কাজে ব্যস্ত আছে, এবং চন্দ্রকুমার তেমনি তাঁহার চেয়ারে বসিয়া বই-এর পাতা উল্‌টাইতে ছিলেন, এমন সময় দরজার কাছে কাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া চন্দ্রকুমার বলিয়া উঠিলেন—কে, বিকাশ নাকি? এস এস—অনেক দিন আস নি, মায়াটা বড় ভাব্‌ছিল—তা ভাল আছ?—

তাঁহার এই অনর্গল কথার মাঝখানে আগন্তুক সরিয়া আসিয়া বলিল—আমি মুকুল, মায়াদেবী আছেন কি?

চন্দ্রকুমার। আছে আছে, মায়া কমলা দুজনেই আছে, যান ঐ ঘরে।

কথাগুলি বলিবার সময় তিনি ব্যস্ত ভাবে একটি ঘরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইলেন।

কিন্তু মুকুল বিপদে পড়িল। কি করিয়া না জানাইয়া ভিতরে ঢুকিবে?

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া চন্দ্রকুমার বলিলেন—আচ্ছা আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

তিনি উঠিয়া আসিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—ওরে মায়া, মুকুলবাবু এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে—

চন্দ্রকুমারের কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে মায়া যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই ভাবেই পর্দ্দা সরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সাম্‌নের দিকে ফেলা, এক পাশের চুল আঁচ্‌ড়ান শেষ হইয়াছে, আর এক পাশের চুলগুলি তখনও তাহার বাঁ হাতের আঙ্গুলে জড়ান এবং চিরুনিটি তখনও চুলের মধ্যেই ধরা আছে!

মুকুল বলিল—আপনি ব্যস্ত ছিলেন?—

চুলগুলি পিঠের দিকে ফেলিয়া মায়া বলিল—থাকলেও, আপনি আমার ক্ষতি করতে পার্‌বেন ভাব্‌বেন না।—ভাল আছেন?

কথাগুলি বলিবার সময় জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন মায়ার মুখে আসিয়া দেখা দিল! সাজ-সজ্জাহীনা নিরাভরণা নারীর শরীরে এমন রূপ-মাধুরী প্রকাশ পাইতে পারে তাহা শিল্পী মুকুলের যেন জানা ছিল না। সে এমন করিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া রহিল যেন সে একখানি মূর্ত্তি বা ছবি দেখিতেছে,—সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি যে রূপকে ধারণা করিতে পারে নাই, মায়া যেন তাহারই জীবন্ত প্রতিমা!

চন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া মায়া বলিল—ইনি আমার বাবা মুকুলবাবু, তবে ওঁর পরিচয় ঠিক আমি আপনাকে দিতে চাই না এখন, দু'দিন এলেই জান্‌তে পার্‌বেন।

মুকুল হাসিয়া বলিল—সেই পরিচয় সব চেয়ে ভাল।

মায়া বলিল—আর বাবা, আমি মুকুলবাবুর সম্বন্ধে তোমায় কিছু বল্‌তে পার্‌ব না, কারণ আমি বিশেষ কিছুই জানি না, তবে মেসো-মশাই, বিমলবাবু আর শ্রীশ-দা এঁর নামে পাগল হয়ে ওঠেন—

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই গুণিলোক সন্দেহ নেই।

মুকুলকে লইয়া ঘরে আসিয়া মায়া দেখিল, কমলা ঘরের সমস্ত এলো-মেলো অগোছাল ভাবটা সরাইবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত জিনিষ লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে।

মায়া হাসিয়া বলিল—Too late কমলা। মুকুলবাবু সব দেখে ফেলেছেন—এইটে আমার পড়্‌বার ঘর মুকুলবাবু। মানে nursery—আর ঐ বর্ষীয়সী মেয়েটি আমার governess—

কথা কয়টি বলিয়া মায়া কমলার দিকে তাকাইল।

কমলা হাসিয়া বলিল—সে উনি সব বোঝেন।

মুকুল হাসিয়া ফেলিল।

মুকুলের দিকে চাহিয়া মায়া বলিল—কি বোঝেন?

মুকুল। উনি কি ভেবে বলেছেন তা জানি না, তবে আপনার governess যে কোথাও নেই, তা মনে হয়।

মায়া। একদিনের অত্যাচারে আমার অনেকখানি পরিচয় আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে দেখ্‌ছি! তা ভালই হ'ল মনে হয়, কি বলেন?

এই সময় কমলাকে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতে দেখিয়া মায়া কঠিন ভাবে বলিল—ব'স্ চুপ্ ক'রে, আমার দরকার আছে।

মুকুল বলিল—এর আগে আপনার কাছে আসা উচিত ছিল হয় ত। কিন্তু বিশেষ কিছুই বল্‌বার ছিল না ব'লে তেমন চাড় হয় নি।

মায়া শুনিবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে সহজ কৌতুকের ভাব বজায় রাখিয়া বলিল—অত রাত্রে আপনাকে একজন অপরিচিত মানুষের কাছে পাঠিয়েছি মনে ক'রে এখন এমন হাসি পায়! আপনি তার দেখা পেয়েছিলেন?

মুকুল। হাঁ, তখন কোন একটা তারের যন্ত্র বাজাচ্ছিলেন যার নাম আমি জানি না।

মায়া। তারপর?

মুকুল। আমাকে দেখে তিনি বাজনা থামালেন। কিন্তু আমাকে কোন প্রশ্ন করলেন না। আমি নিজেই আপনার পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম।

মায়ার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিতেছিল, শুনিবার আগ্রহে তাহার নিশ্বাস পতনের শব্দও যেন দ্রুত হইয়া আসিল!

মুকুল বলিল—কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন—তারপর তাঁর শোবার ঘরে যাবার সময় বল্‌লেন—'যাবার সময় আমার চাকরকে দয়া ক'রে ব'লে দেবেন সে যেন দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়—'

কমলার মুখ দিয়া অস্ফুট একটু শব্দ শোনা গেল—ও—'

মায়া বলিল—বলুন—

মুকুল বলিল—আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম, তারপর আমার মনে হ'ল আপনার কথা। আমি নীচে নেমে এসে দেখি, চাকরটা ঘুমচ্ছে। তাকে না জাগিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর উপরে এসে একটা ঘরে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তখন রাত প্রায় একটা হবে, ঘুমের ঘোরে বিকাশ একবার বলে উঠ্‌লেন—মা গো—

—আমি আস্তে আস্তে উঠে তাঁর ঘরে এসে তাঁর মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে তাঁকে বাতাস করতে লাগ্‌লাম।

—তিনি বল্‌লেন—কে জীবন?—

—আমি তাঁর কপালে হাত দিতেই তিনি সেখানা ধরে রইলেন, তারপর আবার ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

মায়া আর কোন কথা না বলিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া মুকুল পুনরায় বলিল—কিন্তু সকালবেলা আমার মুখের দিকে চাইতেই বিরক্তিতে তাঁর মন ভরে গেল মনে হ'ল। তার পর আমি চলে এসেছি।

মায়া বলিল—খুব আঘাত পেয়েছেন কি?

মুকুল বলিল—না। আমাদের শুভইচ্ছাটাই অনেক সময় আর একজনের কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়; এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।—উনি আপনার কাছে এসেছিলেন কি?—

মায়া বলিল—না।

মুকুল। আপনি ওঁকে খুব স্নেহ করেন তাই একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করি—আপনি ওঁর সম্বন্ধে কোন ভয় মনে রাখ্‌বেন না।

মায়া বলিল—আপনি ঠিক কি ভাবে কথাটা বল্‌ছেন তা আমি বুঝ্‌তে পর্‌লাম না!

মুকুল বলিল—আপনি হয় ত ওঁর দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সাহায্য কর্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহায্যটা সব ক্ষেত্রে দরকার হয় না। অনেক মানুষ তাদের সবচেয়ে দুর্ব্বলতা বা দুঃখের সময় মনে সবচেয়ে বেশী শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেয়। বিকাশকে সেই মানুষ ব'লে আমার মনে হ'ল।

মায়া তাহার কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি মুকুলের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মনটা হাল্কা হ'য়ে গেল।

মুকুল বলিল—এখন আমি আসি—

অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে যেমন করিয়া কথা বলে তেমনি স্বরে মায়া বলিল—এখন কোথায় যাবেন?—

মুকুল বলিল—পথে। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বালা হয়; বাইরের কোলাহল থেমে যায়, ঘরের কোলাহল সুরু হয়; সবাই ঘরে ফেরে। তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও নীরব হ'য়ে আসে।—আমিও ফিরি।

মায়া বলিল—আবার কবে আস্‌বেন?

মুকুল বলিল—ঠিক বল্‌তে পারব না, মানুষের কাছে আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আমি আজও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারি নি, শুধু বিমল ছাড়া। আপনাদের সঙ্গে ত ওর অনেক দিনের পরিচয়, না?—

মায়া বলিল—হাঁ।

মুকুল। আমার সঙ্গেও তার অনেক দিনের পরিচয়। আমার কাজের ভিতর দিয়ে যতটুকু নিজেকে বাইরে প্রকাশ করতে পেরেছি, তার মধ্যে বিমলের সহানুভূতির হাত অনেকখানি আছে। ওর কাছে কৃতজ্ঞতায় আমার জীবন বিকিয়ে আছে।

মুকুল বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মায়ার মনও আর ঘরে রহিল না। সেও বোধ হয় মুকুলের অনুসরণ করিয়া এই রহস্যময় মানুষটির পিছনে পিছনে ছায়ার মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

এক সময় সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল—বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বলে ওঠে—বাইরের কোলাহল থামে, ঘরের কোলাহল সুরু হয়, তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও থে যায়—আমিও ফিরি—কিছু বুঝলি ঐ কথাগুলো শুনে কম্‌লি?—

কমলা বলিল—ঠিক না বুঝলেও ফাঁকা কবিত্ব ব'লে মনে হ'ল না! তোর কি মনে হয়? ভারি অদ্ভুত মানুষটি—না রে?—

মায়া বলিল—কি জানি!

মায়ার কথার স্বরে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া কমলা তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু সমস্ত সন্ধ্যা তাহাকে ঐ ভাবেই থাকিতে দেখিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত ঠেকিল এবং মায়াকে লইয়া কৌতুক করিবার বাসনাও ঐ সঙ্গে তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। রাত্রে শুইবার সময় সুযোগ বুঝিয়া সে মায়ার কানের কাছে মুখ আনিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—ঝুল্‌বি না কি এবার?—

একজন অপরিচিত মানুষ পরিচয়ের ভিতর দিয়া যখন আর একজনের জীবনে রেখাপাত করিয়া যায়, তখন সে যে-সমস্ত ভাব বা ভাবনা কথায় বা কাজে প্রকাশ করিয়া ফেলে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে, ঐ ব্যক্তিগত পরিচয়টি পরস্পরের মধ্যে কতখানি শান্তির, তৃপ্তির বা দুঃখের হইয়াছে। এই মানসিক উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে মায়া চিরদিনই অত্যন্ত সতর্ক এবং সজাগ। কোন প্রকারেই কাহারো কাছে নিজেকে সে ধরা দিতে চাহে না। অসাবধানতাবশত ধরা পড়িয়াও সে অত্যন্ত সহজে আপনাকে বাহিরে লইয়া আসিতে পারে। এই একটিমাত্র বিষয়ে সে মানুষ দূরের কথা, দেবতাকেও বোধ হয় বিশ্বাস করে না। কমলার ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ কথার স্বরে এক নিমেষে সে বদ্‌লাইয়া গেল।

কোন একটা হাস্যকর ব্যাপার শুনিলে মানুষ যেমন করিয়া হাসে, বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেমনি হাসিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া কমলা বলিল—মরণ আর কি! হাস্‌ছিস্ যে?—

মায়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—তোর কথাটা ঠিক typical schoolmistress-দের মত হ'ল কমলা! যাদের কেউ বিয়ে করে নি

বা ভালবাসে নি, তারা ঐ দুটো সম্বন্ধে ভারী সন্দেহ করে। দুটো ছেলে-মেয়ের নাম এক জায়গায় হ'লেই তাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই তারা দিব্য চক্ষে দেখতে পায়। কিন্তু তুই schoolmistress-ও ন'স্, ভালবাসাও পেয়েছিস্, বিয়েও হবে, তবু সন্দেহ কর্‌ছিস্ কেন বুঝ্‌তে পারলাম না!

কমলা কোন কথা না বলিয়া মুখ ভার করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

মায়া বুঝিল আপনাকে ঢাকিতে গিয়া কমলাকে সে আঘাত করিয়াছে। কথাটিকে হাল্কা করিবার জন্য সে আবার বলিল—একজন মেয়ের জীবনে যতগুলি দেবতার আবির্ভাব হয়, পেশাদারী etiquette বজায় রাখ্‌বার জন্যে যদি সবগুলিকে অন্তত একবার ক'রেও জীবন-দেবতা বানিয়ে হৃদয়-আসনে বসাতে হয়, মানে আমি যদি তাই করি, তাহ'লে—

কমলা রাগ ভুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মায়া বলিল—তাহ'লে সত্যি আমার যিনি জীবন-দেবতা তিনি আমার মুখ দর্শন কর্‌বেন না।

কমলা বলিল—কর্‌বেন না-ই ত।

কমলার গলা জড়াইয়া মায়া চুপি চুপি বলিল—সে ভারি রাগী মানুষ বাবা!

কমলা। আচ্ছা মায়া, এমন ক'রে মনের কথা চেপে রেখে তোর কি হয়?

মায়া। সুড়্‌সুড়ুনি থেকে তোরা বঞ্চিত হ'স্। সেটা দেখ্‌তে আমার খুব ভাল লাগে।

কমলা আবার কথা বন্ধ করিল এবং অনেক সাধা-সাধনার পরও যখন সে কথা কহিল না, তখন মায়া অন্য উপায় অবলম্বন

করিল, বলিল—আচ্ছা কম্‌লি, সুধীরবাবু না একুশে তারিখে ছাড়া পাবেন ?

কথাটি বলার আশ্চর্য্য ফল ফলিল ! কমলা ভারী গলায় উত্তর দিল—হাঁ।

মায়া যেন আপনার মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—বেশ হবে, ঊনিশে আমার পরীক্ষা শেষ হবে, তারপর একদিন প্রাণ ভ'রে জিরিয়ে নিতে পার্‌ব, তারপর শ্রীশ-দার সঙ্গে সেই দিন ভোরে হুগলী যাব।

কমলা। তুই যাবি ?

মায়া। যাব না ? বা রে !

কমলা। শ্রীশ-দার বন্ধুরাও নিশ্চয় যাবেন তাহ'লে ?

মায়া। তাতে তোর অসুবিধে হবে না কি ?

কমলা। হাঁ। আমি ভাব্‌ছিলাম সে জেল থেকে বেরিয়ে দেখ্‌বে—আমি একা তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

মায়া। তার আর কি ?—কালই তাহ'লে তুই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে যে, সেদিন কারো হুগ্‌লী যাবার অধিকার নেই, যদি কেউ জোর ক'রে যায় সে বিয়ের চিঠি পাবে না।

কমলা হাসিয়া বলিল—তোর মুণ্ডু।

মায়া। আচ্ছা তোরা ত সব যে যার ব্যবস্থা নিজে নিজে ক'রে নিলি, উর্মি কি কর্‌ছে বল্‌ ত ?

কমলা। ওর থিওরি ত জানিস্‌, 'বর' জিনিষটাকে ও পাকা আঞ্জীর মনে করে। একদিন সেটা ওর নাকের ওপর পড়ে থেব্‌ড়ে যাবেই এ বিশ্বাস ওর আছে।

মায়া। যদি ঠিক পাকা না হয় ?

কমলা। ও পাকিয়ে নেবে।

মায়া। যদি এঁঠো হয়?

কমলা। ধুয়ে খাবে।

মায়া। তাহ'লে আমাদের ভাবনার কিছু নেই, কি বলিস্?—

কমলা হাসিয়া বলিল—না, তুই যত খুশী এঁঠো ছড়াতে পারিস্।

—৩৫—

কিন্তু মায়ার প্রতিজ্ঞা রহিল না। প্রতিদিনের মত পরের দিন সকালে খাতা-পত্রের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়া এবং পূর্ব্ব দিনের কথা স্মরণ করিয়া কমলা হাসিয়া বলিল—ঠিক এই জন্মই মায়া, তোকে কেউ বিশ্বাস করে না।

একটি বই-এর পাতায় দাগ দিতে দিতে মায়া চোখ না তুলিয়া বলিল—কেউ মানে?—

কমলা। ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্দেশ করা শক্ত।

মায়া তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—সাধারণভাবেই না হয় ব'লে ফেল কথাটা—

কমলা বলিল—যে আসে কাছে—'

মায়া বই বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তারা গেলে যে প্রাণ বাঁচে—সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কৃতজ্ঞতাও নিয়ে যেতে পারে।—কিন্তু তোমাদের ঐ নাছোড়বান্দা 'কেউ' মানুষগুলির কাছে আসবার

প্রয়াস মনটাকে এমন বিরক্তিতে ভরিয়ে তোলে যে, তাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতার সম্বন্ধও বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে ওঠে।

কথাটা কমলা পরিহাসচ্ছলেই বলিয়াছিল, কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিতও ছিল না। কিন্তু মায়ার ঐ উক্তি শুনিয়া সে বিশেষ অশান্তি এবং আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। মায়ার কথার সুরে তীব্র একটা নিষ্ঠুরতার আভাস রহিয়াছে ইহা বুঝিয়াও সে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। প্রশ্ন করিলেই সে উত্তর দিবে এমন ধারণা মায়ার সম্বন্ধে কাহারও মনে নাই, কমলাও ইহা বিশেষ ভাবেই জানে। কিন্তু সে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়, তবে তাহার মধ্যে গোপন করিবার কোন প্রয়াস থাকে না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিবার প্রয়োজনও হয় না।

একখানি খাতার ভিতর হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া সে কমলাকে বলিল—তুই তখন রান্নাঘরে, ছিলি একজন ভদ্রলোকের বেয়ারা এই চিঠিটা আমায় দিয়ে গেল।

খামের উপরকার লেখা দেখিয়া কমলা বুঝিতে পারিল, কে লিখিয়াছে। ইহাতে সে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল এবং বিস্ময় চাপিতে না পারিয়া বলিল—বিমলবাবু তোকে এমন কিছু লিখ্‌তে পারেন যা তোর ভাল লাগ্‌বে না? তুই ওঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু না বল্‌লেও এটা আমি চিরদিনই বুঝি যে, তোর চোখে যা সুন্দর হবে তাই উনি করেন। তোকে তৃপ্তি দেবার জন্যে তিনি নিজের সম্বন্ধে কত সময়—

মায়া তাহাকে থামাইয়া বলিল—ব্যস্। ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ ফেল্। তোর কথা আমি মানি। বিমলবাবুর সম্বন্ধে ঐ বিশ্বাসও এই চিঠি পাওয়ার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল।—কিন্তু এই

আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সে বিশ্বাস মারা গেছে। আর এই চিঠিখানা তোকে শোনাবার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও শেষ হয়ে যাবে।

কথা বলিতে বলিতে খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া মায়া কমলাকে বলিল—তুই নিজে পড়্‌তে চাস্‌?—

কমলা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—না।

মায়া পুনরায় চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া বলিল—বেশ, তাহ'লে মোটামুটি শুনে যা, আমি বিমলবাবুর ভাব, আর আমার ভাষাতেই বল্‌ছি :—

দীপ্তির বিয়ের রাত্রে পাগলের মত আমি যাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, তাকে তিনি জানেন; বিবাহের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়ে কোন কাজে যে তাকে পাঠিয়েছি, তাও তিনি দেখেছেন; সেই লোকটি যে আমার কাছে এসেছিল তাও তিনি জেনেছেন।—তারপর এই সর্ব্বজ্ঞ পরম করুণাময় বন্ধু আমার বল্‌ছেন, পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের কাছে যদি আমি যেতাম, বা অন্য যে কেউ আমার কাছে আস্‌ত, তিনি কিছু মনে কর্‌তেন না।

—এর কারণ দেখিয়ে তিনি বল্‌ছেন, মুকুলকে আমি জানি। এই 'জানি' কথার নীচে লাইন টানা আছে কমলা মনে রাখিস্‌। তারপর তিনি বল্‌ছেন, সে তোমায় যে আঘাত দেবে তাও আমি জানি, তাই অত্যন্ত স্বার্থপরের মত বল্‌ছি, তোমার সে আঘাত, সে দুঃখ আমার বুকে সহ্য হবে না। কোন নারীকে জয় কর্‌তে মুকুলের তিন দিনের বেশী সময় লাগে না।—কোন বিজিত নারীকে সে সাত দিনের বেশী সহ্যও করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, দারুণ অবজ্ঞার হাসির রেখা মুখে টানিয়া মায়া আবার বলিতে লাগিল :—

তারপর এই প্রেমময় বল্‌ছেন, ব্যক্তিগতভাবে মুকুলের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই ; ওকে আমি ভালবাসি ; ওর বিশেষ কতকগুলি গুণে আমি মুগ্ধ ; ওর প্রতি তোমার মনে বিদ্বেষ আন্‌বার জন্যে এ চিঠি লিখ্‌ছি না ; নিজেকে বাইরের আঘাত থেকে বাঁচান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; তুমি আঘাত পেলে আমিও আঘাত পাব, একথা তুমি না বিশ্বাস কর্‌লেও আমি করি ; আমি ভয় পেয়েছি, তাই তোমাকে সাবধান কর্‌তে এসেছি।

মায়া চুপ করিল, কিন্তু তাহার মুখে ঘৃণার চিহ্ন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া কমলা বলিল—কিন্তু তুই অবিচার কর্‌ছিস মায়া !—ও ভালবাসে তোকে ; ভয়ানক ভালবাসে, তাই —

কমলার কথা শেষ হইল না। মায়া তাহার চোখের দিকে তাকাইতেই সে সব যুক্তি ভুলিয়া গেল।

মায়া বলিল—দেখ্‌ কম্‌লি, ঠিক জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল—বাঙালী জাতের মধ্যে পুরুষ কেউ নেই। আবশ্যকের তাগিদে আর কর্ত্তব্যের খাতিরে যারা নারীর স্বামী বা সন্তানের পিতা হয় তাদের কথা আমি ভাব্‌ছি না। আমার ঐ 'পুরুষ' কথাটার আড়ালে যে চিন্তা বা কল্পনা অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে তা ঠিক ক'রে তোর কাছে বল্‌তে পার্‌ছি না।—এই কল্পনার পুরুষকে আমি দেখেছি, সেই সঙ্গে ভ্রান্ত ধারণাটাও আমার কেটে গেছে। বিমলবাবু আজ বিকালে আস্‌বেন লিখেছেন, তিনি এলে এই কথাটাই বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

কমলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মানে ?—

মায়া। মানে বিমলবাবুর চিঠিতে আমার প্রতি তাঁর প্রাণের ভালবাসা আছে যেমন সত্য, তেমনি আরো দুটি সত্য আছে। প্রথমটি

হচ্চে—পুরুষত্বে বিমলবাবু মুকুলের চেয়ে হীন, একথা তিনি নিজেও জানেন। দ্বিতীয়—আমাকে বিমলবাবু বিশ্বাস করেন না, একথা আমি জান্‌তে পেরেছি।

কমলা। অমন সুন্দর চিঠিখানার ঐ অর্থ কর্‌লি মায়া!—নিশ্চয়ই তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

মায়া। তা হ'বে, কিন্তু যেটুকু এখনও বোঝ্‌বার শক্তি আছে, তাই থেকেই বল্‌ছি, এমন অপমানের চিঠি লেখ্‌বার পূর্ব্বে তাঁর ভাবা উচিত ছিল, তিনি কা'কে লিখ্‌ছেন।

কমলা আর থাকিতে পারিল না, চোখ রাঙ্গা করিয়া বলিল—কিন্তু বিশ্বাস কর্‌ মায়া, মেয়েমানুষের এত তেজ ভাল নয়। ও তেজ চূর্ণ যে-দিন হ'বে—

তাহার কথা শেষ না-হইতেই মায়া বলিয়া উঠিল—মায়া সেদিন নতুন ক'রে জন্মাবে।—আর বোধ হয় তা হয়েও গেছে।

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার মুখে এমন একটি শান্ত-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যে, কমলা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

মায়া যেন স্বপ্নের ঘোরে বলিতে লাগিল—কি স্বাস্থ্য-সমুন্নত উদ্ধত, গর্ব্বিত, শক্তিশালী পুরুষ!—

কমলা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—একবারটি বল্‌ শুধু, কার কথা ভাব্‌ছিস্‌?

মায়া বলিল—অনেকের কথাই।—বিশেষ ক'রে এখন তু'জনের কথা মনে পড়্‌ছে। তুই বন্ধু তারা। একজন জাগাল আমার নারীত্ব, আর একজন জাগাল আমার মাতৃত্ব!—বুঝ্‌তে পারছিস্‌ না কমলা?—জীবন আর বিকাশ। কিন্তু আমার প্রেম রইল আজও ঘুমিয়ে। সে জাগ্‌লেই আমার সব সাধ মেটে।

ইহার পর বহুক্ষণ মায়াকে কোন কথা বলিতে না শুনিয়া এবং পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া কমলা উঠিয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রতিদিনের মত শ্রীশ হাজিরা দিতে আসিলে তাহাকে বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়া মায়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিল। মনের মত উত্তর শুনিয়া খুশী মনে বার বার বলিতে লাগিল—ওটা না বুঝিয়ে দিলে সত্যি আমি নিজে পেরে উঠ্‌তাম না শ্রীশ-দা; এবার সব পেপারে ফুল্ মার্কস্ দেখে নিও—

কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে কাটাইবার পর কমলার তাড়া খাইয়া মায়া স্নান করিতে গিয়াছে, তাহার পর আহারের সময় ছেলেমানুষের মত চেঁচামেচি করিয়া খাইয়াছে এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম না লইয়া আবার নোটস্ খুলিয়া বসিয়াছে।

এই ভাবে বরাদ্দ সময়ের উপর প্রায় চার ঘণ্টা উপরি খাটিয়া শ্রীশ বিদায় লইবার সময় বলিল—আজ তুই আমাকে একেবারে কাহিল ক'রে ছেড়েছিস্ মায়া—

মায়া হাসিয়া বলিল—কালও ঠিক এম্‌নি বুঝ্‌লে?—

শ্রীশ বলিল—হাঁ, শুধু ঐ conspiracy-টা ছাড়া।

মায়া অবাক্ হইয়া বলিল—conspiracy?—

শ্রীশ। হাঁ, আজ ক'দিন ধরে মাসীমা, মেসো-মশাই, মা, বাবা তোর সম্বন্ধে একটা কিছু কর্‌তে চেষ্টা করছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু ঠিক যে কি তা জানি না।—আমাকে দলে নেন নি।

মায়া। তাই বুঝি আজ ভোর না হ'তেই বাবা চলে গেলেন?

শ্রীশ। সম্ভবত; একটু সাবধানে থাকিস্, 'শতমুখীর' তীরগুলো সাঁই সাঁই ক'রে আজ কাল যে ভাবে চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাতে

চোট্ না লাগাটাই আশ্চর্য্যের কথা। দীপ্তিকে বেশ একটু ঘাল করেছিল, এখন অনেকটা ভাল।

মায়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—আবার নতুন কিছু না কি ?

শ্রীশ। না, নতুন কিছুই না, খুব পুরোণ। কিছুদিন থেকে অমল খুব বেশী রকম দীপ্তির কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল।

মায়া। উদ্দেশ্য ?—

শ্রীশ। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা, বন্ধুত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার প্রতিশ্রুতি এবং চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। দীপ্তি এটাকে সাধারণ আর স্বাভাবিকভাবেই নিতে চেষ্টা করেছিল প্রথমটা কিন্তু পরে জান্‌তে পারে সেটা খুব সাধারণ আর স্বাভাবিক নয়; তখন থেকেই ওকে এড়িয়ে চল্‌তে চেষ্টা ক'রে, কিন্তু সেটা অসিতের দৃষ্টি এড়ায় নি।

মায়া। সর্ব্বনাশ!

শ্রীশ। মোটেই তা নয়। কোন্ মানুষের মধ্যে কি আছে বোঝা বড় শক্ত। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, তোকে মোটামুটি ব্যাপারটা ব'লে যাই।

—দীপ্তির কাছে অমলের আসার সঙ্গে সঙ্গে শতমুখীদের সহস্র জিভ্ লক্ লক্ ক'রে বেরিয়ে এসে চারদিকে বিষ ছড়াতে থাকে, তাতেই বাবা, আর মা নীল হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন, দীপ্তির ত কথাই নেই। এটাও অসিত দেখেছে কিন্তু দীপ্তিকে নিজের থেকে কিছু বল্‌তে না শুনে কয়েকদিন চুপ ক'রেই ছিল, শেষে আর না পেরে একদিন দীপ্তিকে বলে—তুমি যদি আমাকে চিরদিন স্বামিত্ব দিয়েই রাখ্‌তে চাও, আমার আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই, কিন্তু স্ত্রীর বন্ধুত্ব না পেলে পুরুষের শক্তি অনেকখানি পঙ্গু থেকে যায়।

—এই কথার পর দীপ্তি, অমল সম্বন্ধে সব কথা অসিতকে বলে। অসিত তাতে হেসেই সারা হয়। বলে, এই নিয়ে ভাব্‌ছ দীপ্তি! তারপর প্রতিদিনের মত অমল এলে অসিত কথায় কথায় তাকে জিগ্‌গেস করে—দেখুন, আমি আপনার ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, জান্‌বার সৌভাগ্যও হয় নি; আচ্ছা আপনি ত অনেক দিন বিলেতে কাটিয়েছেন, ওখানে এক-জাতের সভ্য অবস্থাপন্ন মানুষ আছে, যাদের পেশাদার gossip বলে, এখানে সে-রকম মানুষ বিশেষ আছে কি?—যারা বন্ধুত্বের আড়াল দিয়ে মানুষের দুর্ব্বলতার খবর শুনে গিয়ে scandal-mongers-দের কাছে সে সব trust বিক্রী করে?

—অমল বলে, আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

—অসিত উত্তর দেয়, এটা খুব প্লেন্ জিনিষ, এখানে কি হয় ঠিক জানি না, আমার একটি ইংরেজ বন্ধু ভারি মজার কাণ্ড করেছিলেন।—তাঁর ঠিক বিয়ের পরই, তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা কথা বাইরে থেকে শুন্‌তে পান, তাতে তিনি একজনকে ডেকে বলেন, আচ্ছা আপনি কত টাকা দামের জুতো পায়ে দেন?

লোকটি অবাক্ হয়ে উত্তর দেয়, দু' পাউণ্ড।—কেন?

আমার বন্ধু, টেবিলের ওপর দু' পাউণ্ড রেখে নিজের পায়ের জুতো খুল্‌তে খুল্‌তে বলেন—আমারটা মাত্র বারো শিলিং! তা আপনি ঐ দু' পাউণ্ড নিন, আর এটাও—বলেই তিনি সেই বারো শিলিং-এর জুতোটি আচ্ছা ক'রে ঘা-কতক সেই লোকটির মুখে লাগিয়ে দিয়ে আবার বলেন—আপনাদের দলে ফিরে গিয়ে বল্‌বেন, scandal-mongering-এর দাম দু' পাউণ্ড বারো শিলিং পেয়েছি—ভারি মজার গল্প না?—

—অমল বেশ একটু তেতে উঠে বলে, আপনি কি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বল্‌ছেন এ কথাটা ?

—অসিত বলে, নিশ্চয়।—আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন বলেই বলেছি ; খুব amusing, না ? আপনার ফ্রেণ্ডস্‌দের বল্‌বেন, তাঁরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

মায়া। কি ছেলেরে বাবা !—তারপর ?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তারপর থেকে অমল আর আসে নি। দীপ্তি ভয় পেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে সব কথা বলে, আমিও প্রথমটা বেশ একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম, তারপর অসিতের কথাবার্ত্তা শুনে আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি।

—আমি বল্‌লাম, আপনার এই গল্পটার ফল যদি খুব ভাল না হয়, কি কর্‌বেন ?

—সে দিব্যি সহজ ভাবে উত্তর দিল, গল্পটাকে সত্যি ক'রে দেব।—তার ছেলে-মানুষীরও অন্ত নেই, দীপ্তিকে সেদিন বল্‌ল, দেখ, বন্ধু পাওয়া সব সময় বরাতে ঘ'টে ওঠে না। শ্রীশ-দা ত রয়েছেন, half a loaf is better than no bread, ওঁর ওপর দিয়েই যদি বন্ধুত্বের অভাব মেটাতে চেষ্টা করি আমরা, কি হয় ?—সেই দিন থেকে বিকেল বেলাটা ওখানেই কাটাচ্ছি।

মায়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—কেমন লাগ্‌ছে ?

শ্রীশ বলিল—পুরুষের উপযুক্ত শরীর ওর আছে একথা আগেই মনে হয়েছিল, এখন দেখ্‌ছি মনটাও পুরুষের উপযুক্ত।

মায়া। শতমুখীদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ আর ওঠে নি ?

শ্রীশ। না, উল্টে এই নিয়ে তাদের মধ্যে খুব একটা হাসি তামাসা হয়ে গেছে।—বেচারী অমল ! সে যেখানে যায় সেখানেই

শোনে, অসিত তাকে নাকি 'জুতিয়ে লাট্' ক'রে দিয়েছে!—খুব সম্ভবত অসিতকে আর ঘাঁটাতে ওরা সাহস করবে না।

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা শ্রীশদা, তটিনীকে আর ফিরে পাওয়া যায় না, না?—

শ্রীশ অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—কেন? হঠাৎ তাকে মনে পড়্ল যে?

মায়া বলিল—সব সময়েই পড়ে কিন্তু কা'কেও তার কথা বলি নি কোন দিন। কি সুন্দর জীবন ছিল, আর তুমি কি ক'রে দিলে!

যেন তীব্র আঘাত পাইয়া শ্রীশ বলিয়া উঠিল—আমি?

মায়া। হাঁ, তুমি ছাড়া আর কা'কেও ত দায়ী করতে পারি না।—ফুলের মত নির্ম্মল জীবনটা তার কি ভয়ানক বিষিয়ে উঠেছে আজ! তার জীবন একজনের হাতে যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, অন্যের জীবন নষ্ট ক'রে ও যেন সেই দুঃখের প্রতিশোধ নেয়।—মনে পড়ে না তটিনীকে?

শ্রীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মায়া অত্যন্ত কঠিন ভাবে বলিতে লাগিল—নিজের খেয়ালটাকেই বড় ক'রে দেখ্লে; যে তোমার হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিল তার কথা একবার ভাবলেও না; প্রাণ দিয়ে যে বল্ল ভালবাসি, অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলে ও একটা মানসিক উচ্ছ্বাস বা spasm, যার সাহায্যে যে-কোন মানুষকে খুশীমত কাছে আনা যায়!—তোমার সে-সময়কার সব কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে আছে। মনে পড়ে, তখন আমাদের বোঝাতে, যে বলে ভগবান মঙ্গলময়, সে মিথ্যাবাদী . . . তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী যে বলে, [illegible]বাসি—'

শ্রীশ একখানি হাত তুলিয়া ধীরে ধীরে আপনার কপালে বুলাইতে লাগিল।

মায়া বলিল—আমার কথায় অভিমান ক'রো না; আমি চিরদিন তোমার কথাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি; চিরদিন করব, শুধু বল, সে ধারণা সে বিশ্বাস আজও তোমার আছে?—

মায়ার কথায় কয়েক মুহূর্ত্ত শ্রীশ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রবাহিত জীবন-ধারা পুরাণো-দিনের-ফেলে-আসা অনাদৃত সৈকত-সীমার জন্য পরিপূর্ণ আবেগে আপনারই বুকে আকুল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে! যেন কোন্ মন্ত্রবলে কতশত ভুলে-যাওয়া মুছে-যাওয়া স্মৃতি এক নিমিষে রূপ ধরিয়া তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে! সে মাধুরী, সে সৌরভ, সে রস উপভোগ করিবার শক্তি যেন তাহার নাই; সে-সব কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ের প্রতি শিরায় যেন টান পড়ে! মায়ার প্রশ্নের উত্তরের বিনিময়ে সে শুধু একবার একান্ত দীনভাবে তাহার চোখের দিকে চাহিল।

মায়া তেমনি অবিচলিত নিষ্মর্ম কণ্ঠে বলিল—বল বিশ্বাস আছে?—

শ্রীশ বলিল—না।

পরক্ষণেই মায়ার দিক হইতে ফিরিয়া শ্রীশ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

শ্রীশ চলিয়া যাইবার পর মায়া তাহার ঘরে আসিয়া অবসন্নভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অত্যধিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় তাহার শরীর-মন শ্রান্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিল না। বিমলের কথা মনে হইবামাত্র জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া কৌতুকভরা কণ্ঠে কমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—হলা পিয় সহি অনসূয়ে! তুমি কোথায় গেলে?—

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল—হলা অনামুখি হউন্‌তলে, আমায় কেন ডাকিতেছ? তোমার দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া এখানে বসিয়া সেলাই করিতেছি, আসিলেই খবর দিব।

মায়া হাসিয়া উত্তর দিল—মরণ আর কি; কথার ছিরি দেখ না! —এই শোন্‌, আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি, তারপর কেশ-বিন্যাস, তারপর বেশ-পরিবর্ত্তন। আমার কাছ থেকে সাড়া না পেলে আমার ঘরের এই ড্রপ্‌সিন্‌টা তুলিস্‌ নি, বুঝ্‌লি?

কমলা বলিল—হঠাৎ শরীরটার ওপর এত দরদ যে? চান কর্‌বি, চুল বাঁধ্‌বি, কাপড়টাও বদ্‌লাবি! তোর হল কি?

মায়া। তোর একটা দার্জ্জিলিং-এর ল্যাপ্‌চা ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে হবে, তুই না হয় ও-সব বাদ দিতে পারিস্‌ কিন্তু আমি বাঙালী।

এই কথার পর দুই ঘর হইতে দুইটি মিষ্ট হাসির সুর উঠিয়া বাড়ীটি ভরিয়া দিল।

মায়া তাহার কাজ সারিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেলে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কমলা যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বহুজনাকীর্ণ সহরের অবরুদ্ধ আলো-বাতাস এবং চারিপাশের শ্রীহীন প্রাচীরের সীমা অতিক্রম করিয়া সে আসিয়া বসিল, ছবির ফ্রেমের মত এক বাতায়নতলে। সম্মুখে তাহার কুয়াসার আবরণে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ-রেখা! পাহাড়ের কোলে আলো-ছায়ার লুকোচুরি, মেঘের খেলার বিরাম নাই, অপ্রত্যাশিত বর্ষণ। এই স্বপ্নপুরীর শোভায় ও সৌন্দর্য্যে মন তাহার যখন পরিপূর্ণ, তাহার কানের কাছে কে বলিয়াছে—চল না কা'কেও না ব'লে একটু পালাই, যেদিকে খুশী, দু'চক্ষু যায়।—'

সে উঠিয়াছে। তাহার পাশে পাশে মুগ্ধচিত্তে নিঃশব্দে চলিয়াছে। কঠিন পাথরের উপর সবুজ মখ্‌মলের আস্তরণের মত গুল্ম এবং

পাহাড়ী-ফুলের অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কাহার হাতের নিবিড় কঠিন কম্পিত স্পর্শে সে জ্ঞান হারাইয়াছে! মনের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, কাহার মুখের দিকে সে শুধু একবার চাহিয়াছে। পাগল-হাওয়ার আঘ্রাণে কাহার উদ্বেলিত বক্ষের স্পন্দন সে আপনার অতি-নিকটে অনুভব করিয়াছে!—কে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়াছে—কমলা—'

এমনি স্বপ্ন-মাধুরীভরা জীবনের ছবি একটির পর একটি তাহার মনের দ্বারের কাছে উঁকি দিয়া আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে তাহার প্রাণ পুলকে ভরিয়া দিতেছিল। ধীরে ধীরে সে যেন স্বপ্ন-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! অফুরন্ত সুখ, অনির্ব্বচনীয় পরিপূর্ণ শান্তি! . . .

তাহার পর কোথায় গেল সে রূপ-হাসি-গানের জগৎ, কোথায় গেল সে স্বপ্নপুরী! কোথায় গেল বুকভরা তৃপ্তি, কোথায় রহিল তরুণ প্রাণের সহস্র রঙ্গিন কল্পনা! আত্মীয়ের গঞ্জনা, আত্মীয়ের বিস্ময়, বন্ধুর বিদ্রূপ, শত্রুর প্রাণান্তকারী জ্বালাভরা উপহাস . . . সহস্র জিহ্বার তীব্র-হলাহলে প্রাণের মুঞ্জরিত আশালতা পুড়িয়া নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে! অবসাদের ভারে প্রিয়ের মুখে চোখ তুলিয়া তাকান হয় নাই! দিনের পর দিন সে একটি চাহনি, একটি হাসির আভাস দেখিবার আশায় আশায় থাকিয়া অভিমানে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।—তাহার পর কত দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রিয় তাহার দেশের সেবায় জীবন দান করিয়াছে, তাহার কথা ভাবিবার আর সময় নাই! . . কিন্তু এইবার এতদিন পরে—

সহসা কমলার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কিন্তু সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিতে অনেক সময় লাগিল। তাহার চারিপাশের দেওয়াল, ছবি, চেয়ার, টেবিল সমস্তই কেমন বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল! উহাদের

সে চিনে না! ভাল করিয়া চোখ মেলিতে গিয়া দেখিল, দরজার কাছে একজন মানুষ ঘরের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিমলের কথা মনে হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মানুষটির কাছে আসিয়া দেখিল বিমল নয়, মুকুল! হাসিয়া বলিল—আসুন ভিতরে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?—

মুকুল বলিল—না, কয়েক সেকেণ্ড হবে।

কমলার সহিত মুকুল ঘরে ঢুকিতেই অপর দিক হইতে মায়াও সেই ঘরে আসিয়া মুকুলকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

মুকুল বলিল—খুব আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছি আপনাকে নিশ্চয়ই?

মায়া হাসিয়া বলিল—হাঁ।

মায়ার মাথার চুলে একটি সদ্যছিন্ন দোলন-চাঁপার দিকে চাহিয়া মুকুল বলিল—আপনাকে একটা জিনিষ দেখাতে এসেছি।—যখন স্কুলে কাজ শিখ্‌তাম, মাষ্টাররা আমাদের মর্‌চে-ধরা মনের ওপর যে শিরিষ-কাগজ ঘষ্‌তেন, তার নাম আমরা দিয়েছিলাম memory drawing—একটা কোন জিনিষ কিছুক্ষণ আমাদের সাম্‌নে ধ'রে সেটাকে আবার লুকিয়ে রেখে তাঁরা বল্‌তেন, আঁক।

—ক্লাসে এ-বিদ্যায় আমার বেশ একটু হাত-যশ ছিল একথা আপনিও বিশ্বাস করবেন।—কমলা দেবী, আপনি তাহ'লে Judge হ'ন?—

অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে কথাগুলি বলিতে বলিতে মুকুল তাহার জামার পকেট হইতে একটি মোড়ক বাহির করিল।

কমলা বলিল—কিন্তু আমি ত ছবির কিছুই বুঝি না—

মুকুল বলিল—ছবি যদি সত্যি হয়, ও দেখ্‌লেই বোঝা যায়, গল্‌তি যেখানে থাকে সেইখানেই বোঝ্‌বার অসুবিধে, ব্যাখ্যারও শেষ থাকে না।—যাই হোক্ দেখুন।

মোড়কের উপরকার কাগজ খুলিয়া মুকুল একখানি ছবি মায়া এবং কমলার মাঝখানে ধরিল। সঙ্গে সঙ্গেই কমলা বলিয়া উঠিল—ও মা! এ যে—এ যে ঠিক! ও মায়া দেখ্!—

মায়া দেখিল, এক নারীমূর্ত্তি, আলুলায়িত কেশগুচ্ছে মুখের দুইপাশ ঢাকা, মধুর একটি হাসির শান্ত-শ্রী, চোখের পাতা নীচু, হাতে মায়ার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ফুলের মধ্যে একটি—দোলন-চাঁপা!

ছবিখানি হাতে লইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে মায়া বলিল—অল্প কয়েকটি রেখার ভিতর দিয়ে এতখানি প্রকাশ করা যেতে পারে? ভারি আশ্চর্য্য লাগে!

মুকুল বলিল—রেখা জিনিষটা সংক্ষিপ্ত হ'লেও ভাবায় খুব বেশী। একটু হাসি, চোখের চাহনি একটি, এ-সব কত ক্ষণিক, অথচ ওর ভিতরকার সব ইতিহাসটুকু যেন ঐ রেখার বুকে লেখা থাকে, আর সে-সব একেবারেই দুর্ব্বোধ্য ঠেকে না, খুব সহজ মনে হয়, নয় কি?—

কমলা বলিল—আচ্ছা এই ফুলটাই আঁক্‌লেন কেন?—

মুকুল। বিশেষ কিছু ভেবে আঁকি নি; আমার নিজের ঐ ফুলটা খুব ভাল লাগে আর ভারি একটা সহজ সৌন্দর্য্য ওর আছে, তা ছাড়া এটা আমি দেখেছি চেষ্টা ক'রে কিছু আঁক্‌তে বা গড়্‌তে গেলেই জিনিষটা কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায়!

কমলা। কেন তা হ'বে? সুন্দর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে খারাপ কেন হ'বে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

মুকুল। তা ঠিক বোঝাতে পার্‌ব না, কিন্তু মানুষ যখন খুব সাজ-পোষাক করে এই কথাটাই তখন আমার মনে হয়; সাজা বা সাজানোর মধ্যে রূপ অনেকখানি ঢাকা প'ড়ে যায়।—খুব চট্‌ছেন নিশ্চয়ই?

কমলা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—ভয়ানক চটেছি।—এর পর আর ভাল ক'রে হয় ত সাজ্‌তে পারব না। মানুষের ভুল ভেঙে দেওয়াটা অন্যায় মুকুলবাবু।—সাজ্‌লে যদি খারাপ দেখায়, তাহ'লে ছবির মত দেখাব কি ক'রে ?

তিনজনেই হাসিয়া ফেলিল।

মায়া মুকুলকে বলিল—বসুন।

মুকুল একটি চেয়ারে বসিতে গেলে কমলা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, এ ঘরে না মায়া, তোমার ঘরে যাও, এখানে চারিদিকে সব জিনিষ এলোমেলো রয়েছে—মানে, মুকুলবাবুর মতে সুন্দর রয়েছে, এখন আমার কুরুচির পরিচয় ওদের ওপর কিছু দিতে চাই—ভাগো শিগ্‌গির এখান থেকে, এই ধূলো উড়্‌ছে—

কমলা চেয়ার টেবিল ঝাড়-পোঁছ আরম্ভ করিল। মায়া বলিল—তোর কাজ কি আর সারা হয় না! এতক্ষণ কর্‌ছিলি কি ?—

কমলা। ঘুমচ্ছিলাম। মুকুলবাবু, আপনি ঐ ঘরে যান না, আমি কাজগুলো সেরে নিই—

মুকুলকে লইয়া যাইতে যাইতে মায়া বলিল—কে তোর সঙ্গে পার্‌বে!

ঘরে আসিয়া মায়ার নির্দ্দেশিত চেয়ারে বসিয়া মুকুল বলিল—আমি আপনার কাছ থেকে একটি অনুমতি নিতে এসেছিলাম।

মায়া বিস্মিত হইয়া বলিল—অনুমতি! কিসের ?

মুকুল। এই ছবিখানা আমি আপনাকে দিতে চাই, তার।

মায়া হাসিয়া বলিল—আমি ত ভাব্‌ছিলাম এটা চেয়ে নেবো। ভিক্ষে করায় মানুষের ভারি একটা লোভ আছে।

মুকুল। লোভ নয়, আনন্দ। যাদের চাইবার দরকার হয় না, সব আপনা হ'তে হাতে এসে পৌছায় তাদের মাঝে মাঝে এটা হয়। কিন্তু আমি এটা আপনাকে দিতেই এসেছি নিজের থেকে। যাদের ভাললাগে, পরিচয় পাই, কিছু না দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি না।

মায়া। বিদায়, কেন ?—

নিজের মুখের ঐ দুইটি কথার মধ্যে যে একটি আবেগমিশ্রিত ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল, তাহাতেই তাহার মুখখানি রঙাইয়া দিল। মুকুলের কাছেও ইহা ধরা পড়িয়াছে কি না তাহা দেখিবার জন্য চকিত-ভাবে মুকুলের চোখের দিকে চাহিতেই মায়া দেখিল, সুখের ভারে তাহার মন যেন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে! তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল—পরিচয়ের কথা কি বল্‌ছিলেন? কি পরিচয় পেয়েছেন আমার ?—

মুকুল বলিল—অসম্পূর্ণ। সমস্ত পরিচয়ের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে তৃপ্তির। অসম্পূর্ণ পরিচয়ে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ মাত্রায় থেকে যায়, লাভ ক্ষতি ভাবার, মান অভিমানের অবসর হয় না।

মায়া। সেইটাই কি সব? আপনি কি তাই ভালবাসেন বা চান ?—

মুকুল। না।

মায়া। তবে ?—

মুকুল কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—সে আমি ত ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু ঐটুকুর বেশী কিছু মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করবার অধিকার আমার নেই।

মায়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—অধিকার ?—

মুকুল বলিল—হাঁ।

কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুলের মুখের সমস্ত আনন্দের ভাবটি ম্লান হইয়া গেল। মায়ার মনে পড়িল, সেই প্রথম দিনের কথা।—করুণার স্নেহের আহ্বানে ঠিক এমনি একটি অসহায় বেদনার ছায়া মুকুলের মুখে সে দেখিয়াছিল। তাহার চোখের যে চাহনিটি মায়ার চিরগর্ব্বিত নিষ্ঠুর মনের উপর গভীর দাগ কাটিয়া গিয়াছিল, যে ক্ষতের দিকে তাকাইয়া, যে বেদনাকে লইয়া আপনার মনের মত করিয়া সে উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, প্রাণপণে অন্যের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, তাহাকেই আজ এত নিকটে পাইয়াও এত আপনার অনুভব করিয়াও একান্ত নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল।

কিন্তু ধরা যাহারা দেয় নাই বা ধরা দিবার অবসর যাহাদের ঘটিয়া উঠে নাই, মনের গোপন কথাটির খবর তাহারা জানিবে বা জানাইবে কি প্রকারে?

একান্ত নির্লিপ্তভাবে মায়া বলিল—কোথাও বেড়াতে যাবেন বুঝি?—

মুকুল মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ, তাই একরকম। মাঝে মাঝে এমনি কিছুদিনের মত পালাই।

মায়া উৎকণ্ঠার স্বরে আবার বলিয়া ফেলিল—কিছুদিনের মত?

মুকুল। হাঁ।

মায়া। কোথা যাবেন?—

মুকুল। এখনও তা ঠিক করি নি, আজ রাতে ভাব্‌ব।—পাগল ভাবছেন?

মায়া স্নিগ্ধ চোখে মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার কি তাই মনে হয়, যে আমি—

মায়াকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া, তাহার দিকে ঝুঁকিয়া মুকুল বলিল—আচ্ছা দেখুন ত আমাকে ভাল ক'রে, আমাকে কি মনে হয় আমি বাঙালী?—দেখুন, আমার যে চোখ, একি বাঙালীরই সম্ভব? —মুখ নাক আমার শরীরটা কি বাঙালীর মতই?—আপনি আমায় বেশী দেখেন নি, তবু আপনার কি মনে হয়? এমন কিছু কি আমার মধ্যে আছে যা অন্য যে-কোন দেশের মানুষের থাকা সম্ভব, শুধু বাঙালীর ছাড়া?—

প্রত্যেকটি প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের চোখের দৃষ্টির তীব্রতা যেন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার গলার স্বর অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন অদ্ভুত রকমের উদ্বেগপূর্ণ!

মায়ার অসমাপ্ত কথাটি তাহার নিজেরই বুকে গুমরিয়া উঠিল—পাগল! পাগল! সঙ্গে সঙ্গে থর্-থর্ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

মুকুল বলিতে লাগিল—বলুন, আমি কা'কেও কোনদিন জিগ্‌গেস করি নি, আমার জিগ্‌গেস করবার কেউ নেই! আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন তাই যাবার বেলায় আপনাকেই বিশ্বাস ক'রে একটি কথা জিগ্‌গেস ক'রে যাচ্ছি। বলুন, আমি নিজের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি—আমি জানি না!

মায়ার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। মুকুল বলিতে লাগিল—আমাকে ভাল ক'রে দেখুন, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার কাঁধ দু'টো যে রকম ক'রে নাড়াই, চল্‌বার সময় আমার শরীর যে-ভাবে দোলে, আমার চুলের রং—এ সবই কি বাঙালীর? বলুন, আমার সময় অল্প; বেশী

থাকলেও তাকে আমার অল্প ক'রেই নিতে হবে, দুদিনের পরিচয়ই আমার চিরদিনের সম্বল। খুব অল্প সময় মায়াদেবী, এই শেষ সন্ধ্যাটুকু—

মায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে যেন এক জগদ্দল-শিলা নামিয়া গেল। আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন তাহার মন বার বার তাহাকে বলিতে লাগিল—পাগল নয়—পাগল নয়। দুঃখী, ব্যথাতুর—পরিত্যক্ত! করুণা এবং আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মুকুল বলিল—বলুন, আমাকে কোন কথাই কি বল্‌তে পারেন না?

মায়া বলিল—কি বল্‌ব? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি সব, কিন্তু বল্‌বার কিছুই পাচ্ছি না!

মুকুল হতাশাভরা কণ্ঠে বলিল—কি আশ্চর্য্য এই পৃথিবী! কত সুন্দর কত নিবিড় তার পরিচয়ের সম্বন্ধ! একের সঙ্গে আর একজন কত ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা! একজনকে আঘাত দিলে আর একজন ব্যথা পায়!—মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, স্ত্রী, প্রিয়া . . . সম্বন্ধের আর শেষ নেই! তুমি আমার আমি তোমার, এই কথাগুলোর কি অপূর্ব্ব সুর! দেশের নামে মানুষের নাম, ধর্ম্মের নামে জাতির নাম, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, এমন কত শত ছোট-বড় জিনিস, মানুষে মানুষের সম্বন্ধকে সহস্র স্নেহের হাত দিয়ে ঘিরে রেখেছে, কিছুতেই একজন আর একজনকে ছাড়ে না! শত্রুকে যে আঘাত করে, সে শুধু তাকে আপনার কর্‌তে পারে না বলেই, যে মুহূর্ত্তে জয় করে, সেই মুহূর্ত্তেই মিলন! কি সুন্দর এই সম্বন্ধের বন্ধন, না মায়াদেবী?—

মুকুল কিছুক্ষণ তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি দিয়া মায়াকে দেখিয়া বলিল—বড় সুন্দর লাগে আমার—আমি জৈন, আমি মুসলমান, আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, এমন কত নাম দিয়ে মানুষ আপনার পরিচয় গর্ব্বের সঙ্গে জগতে প্রচার করে। সবাই নিজের নিজের পরিচয় জানে।—কিন্তু আর না, আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি, যদিও মানুষকে জ্বালাতন করতে আমার খুব ইচ্ছে করে, মানুষের কত ছোট-খাট তুচ্ছ কথা জান্‌তে চাই, কিন্তু পরিচয় হবার পূর্ব্বেই আমায় সরে যেতে হয়, তাই কিছুই আমার জানা বা শোনা হয় না।—আমায় বিদায় দিন্, অপরাধ যদি ক'রে থাকি তা ভুল্‌বেন না, এই আমার অনুরোধ। মানুষের অশ্রদ্ধা জিনিষটাই আমার একমাত্র বন্ধন মায়াদেবী।

মুকুল চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুকুলের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার চোখের উপর চোখ তুলিয়া মায়া চাহিল।

মুকুল ম্লান হাসিয়া বলিল—বিদায়—

মায়া বলিল—না।

মুকুল। না? কিন্তু কালই যে আমি যাচ্ছি—

মায়া। তা হ'লেই বা কিন্তু বিদায় দেব কেন? যখন ফির্‌বেন, যে দিন ফির্‌বেন, আমার কথা যদি মনে হয় আস্‌বেন আমার কাছে।

মুকুলের মুখে আবার তেমনি ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আপনার চোখের অশান্ত বাষ্পবারি রোধ করিবার জন্য মুখ ফিরাইতে গিয়া মায়া দেখিল, বসিবার ঘরে প্রবেশ করিবার দ্বারের কাছে কে দাঁড়াইয়াছিল, সে ধীরে ধীরে নীচে নামিবার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

মুকুল বলিল—সম্ভবত আপনার কাছে কেউ এসেছিলেন। আমি আপনার অনেকটা সময় নষ্ট ক'রে দিলাম যে!

মায়া বলিল—উনি বিমলবাবু।

মুকুল। বিমল! ও চলে গেল যে! ডেকে দেব?

মায়া হাসিয়া বলিল—না।

ভয়-চকিত দৃষ্টি মায়ার মুখের উপর রাখিয়া মুকুল বলিল—বড় অন্যায় হ'ল, আমি জান্‌তাম না—

মায়া। কোন অন্যায় আপনার হয় নি।

মুকুল সহজ সুরে বলিল—হ'লেও আর উপায় নেই, একবার কমলাদেবীকে ডেকে দিন্, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

মায়া কমলাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলে মুকুল বলিল—ঘরে ঢুকেই আপনাকে নমস্কার করেছিলাম, যাবার সময়ও সেটা সেরে নিচ্ছি—

কমলা হাসিয়া বলিল—সে ত হ'ল, এখন বলুন কাল আবার আস্‌ছেন কি না?

মায়া বলিল—উনি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, কিছুদিন বাইরে থাক্‌বেন। এই ছবিটা আমায় দিয়ে গেলেন।

কমলা। বেশ ভাগ-বাটরা হ'ল ত! ও পেল ছবি, আর আমি পেলাম নমস্কার, বা!—চিঠি লিখ্‌বেন ত পৌঁছে?

মুকুল অবাক্ হইয়া বলিল—চিঠি?

কমলা। হাঁ, লিখ্‌বেন না?

মুকুল। ওটা আমার আসে না কোন দিন, আমি চিঠি লিখ্‌তে পারি না।

কমলা। পারেন না, পার্‌বেন। বিদেশে থাক্‌লে ঘরের জন্যে মন কাঁদে না?

মুকুল। ঘর?...

কমলা। হাঁ, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু—যাঁরা আপনাকে ভালবাসেন, অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে যাদের আপনি অনেকখানি কাছে টেনে এনেছেন, আপনার এই সবার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার চেষ্টাটা যাদের মনে ব্যথা দেয়, যারা আপনাকে কাছে পেতে চায়,—জানি না আপনি এইটাকে সহ্য করেন কি না, কিন্তু মানুষ চিরদিনই মানুষ, নতুন নতুন পরিচয়ের মোহ সে সহজে কাটাতে পারে কি? মানুষের কাছে মানুষ যদি ধরা দেয়, সেটা কি খুব অপরাধের হয়? অন্যের কথা আমি জানি না, কিন্তু আমার এ দুর্ব্বলতা আছে। মানুষকে কাছে পেয়েও যদি ধরে রাখ্‌তে না পারি খুব কষ্ট হয়—

কমলা সহসা থামিয়া গেল। মুকুলের বুভুক্ষিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

মায়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে টেবিলের উপরকার বই ইত্যাদি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে।

কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি নামাইয়া ধীরে ধীরে মুকুল বলিতে লাগিল—আমাকে উদ্দেশ ক'রে এমন কথা বিশেষ কা'কেও বল্‌তে শুনি নি, কিন্তু শোন্‌বার ইচ্ছে এত করে—আমিও মানুষ কমলাদেবী, সাধারণ মানুষের মত আমারও সব পেতে ইচ্ছে করে, সকলকে ভাল-বাস্‌তে ইচ্ছে করে, সকলের কাছে থেকে, সকলকে সাহায্য ক'রে, সকলের দুঃখ-সুখের ভাগ নিয়ে, সকলকে তৃপ্তি দিয়ে আনন্দ দিয়ে আমিও চল্‌তে চাই—

কমলা। তবে?—

মুকুল। আর কোন প্রশ্ন আমায় কর্‌বেন না, আমার এই অনুরোধটুকু রাখুন।

কমলা একবার মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা রাখ্‌লাম। কিন্তু কিছু অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হ'বে।

মুকুল হাসিয়া বলিল—অত্যাচার ?—

কমলা। হঁ্যা।—আপনাকে কিছু খাওয়াতে চাই, না বল্‌তে পাবেন না। বল্‌বার অধিকারও আপনার নেই, কারণ আমি আপনার খুশীর ওপর হাত দিই নি।—মায়া, তুই ওঁকে বসিয়ে রাখ্‌ একটু, আমি আস্‌ছি।

কমলা চলিয়া গেল।

মুকুল মুখ তুলিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা এটা কি আপনার মনে হয়েছে কোন দিন যে, একজন মানুষ আর একজনের সঙ্গে পরিচয়ের ভিতর দিয়ে নবজন্ম লাভ করে ?—

মায়া বলিল—আমি এটা বিশেষ ক'রেই মানি আর বিশ্বাস করি, তাই কোন পরিচয়কেই অসম্পূর্ণ থাকতে দিতে ব্যথা পাই। এই পরিচয়টা দুঃখ বা অপমানের হ'লেও তা সহ্য হয়। একজনকে পরিপূর্ণ ভাবে জানা, পরিষ্কার ক'রে বুঝ্‌তে পারা কি কম লাভ ? তাকে কি উপেক্ষা করা যায় ?—তবে মানুষকে পাওয়া-না-পাওয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। ও-দুটো জিনিষ অন্ধের মত, বিশ্বাস ওদের চোখ, সে-ই ওদের পথ দেখায়, ওদের ওপর আমাদের ইচ্ছের কোন হাত নেই।

মায়ার এই কয়টি কথার গম্ভীর নির্লিপ্ত এবং উদাস স্বর মুকুলের বুকে বাসনা-বেদনার প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল, সেই সঙ্গে অমানুষিক একটা অভিমান এবং যা-কিছু সমস্তের উপর অবজ্ঞায় যেন তাহার মন ছাইয়া গেল! হিংস্র দৃষ্টি মায়ার চোখের উপর তুলিয়া সে বলিল—কি হবে কথার পর কথার জাল বুনে ? পরস্পরকে কাছে টান্‌বার এ আয়োজন বৃথা, সম্পূর্ণ বৃথা মায়াদেবী। আমার পরিচয় চান ?—কি পরিচয়

পাবেন ?—এই রক্ত-মাংসের শরীরটার সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তে আপনা-দের ভগবান আমার সব পরিচয় কেড়ে নিয়েছেন। আমার জন্ম-দায়িনী, পথের ধারের আবর্জ্জনার স্তূপ!—আমি জানি সেই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যেই আমার জীবনের উৎস লুকান' ছিল, সেই আমার পৃথিবীর প্রবেশ-দ্বার, সেই আমার জননীর কোল—সেই পথ আমার একমাত্র আপনার, আমার গৃহ, আমার সব। এই পথকে আশ্রয় ক'রে যে সব মানুষ পৃথিবীতে আসে, তাদের জন্যে করুণা ক'রে আপনারা যে আশ্রম ক'রে রেখেছেন, তারই একটিতে আমি বড় হয়েছি। আমি নাম-গোত্র-বংশ-হীন! কি পরিচয় আমার আশা করেন আপনারা? আমার এই মুকুল নাম কে রেখেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁকে প্রণাম করি, কর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করতে হ'লে, জগতের মানুষের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে হ'লে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতে হয়; এই সাঙ্কেতিক শব্দও তিনি আমায় একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন—পিতা—শঙ্কর দেব, মাতা মৃণ্ময়ী ... এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার ক'রে নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে আমি পৃথিবীর পথ দিয়ে চলেছি কিন্তু ফাঁকি দিয়ে চলেছি মায়াদেবী, কি বিরাট্ কি জঘন্য এই প্রবঞ্চনা! প্রত্যেকটি নিশ্বাস ফেলি আর এ প্রবঞ্চনার কথা আমার বুকে আগুন জ্বাল্তে থাকে, তাই কা'কেও নিতে পারি না, নিজেকে কারো হাতে দিতেও লজ্জা পাই।

বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু মায়ার চোখ হইতে বাহির হইয়া তাহার গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু সে তাহা ঢাকিবার বা মুছিবার কোন চেষ্টা করিল না।

মুকুল বলিল—আর আমাকে দুর্ব্বোধ্য লাগ্ছে কি?—

মায়া। না। কাল সকালেই আপনি যাবেন?

মুকুল। সকাল ?—অত দেরী কর্‌বারও সার্থকতা আছে মনে হয় না। আজ রাতেই বিদায় নিতে পারি।—পৃথিবীর সব জায়গা আমার কাছে সমান, পৃথিবীর সব মানুষ আমার কাছে সমান, আমি কা'রো নই। আমার কেউ নয়।

মায়ার চোখ ছাপিয়া আবার অশ্রু-বাদল নামিল। মুকুল তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিল—তবু কি সুন্দর! কি সুন্দর এই পৃথিবীর মানুষ, কি সুন্দর তার হাসি, কি সুন্দর তার চোখের জল!—আমার সব মনে আছে, সব মনে থাক্‌বে। বাইরে থেকে যা পাই, যক্ষের সম্পত্তির মত তা একা আমি আগ্‌লে নিয়ে রাত জাগি। বিদায় দিন্ আমায়—

মায়া বলিল—যান, কিন্তু আপনাকে কাছে পাবার, আপনার কথা শোন্‌বার ক্ষুধা আমার মনে রয়ে গেল।

মুকুল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—কি সুন্দর মানুষের মুখের কথা! আমার বাসনাকে বুক ভ'রে অনুভব কর্‌বার অধিকার আমার আছে, তাকে প্রকাশ কর্‌বার নয় মায়াদেবী—আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি।

আর কেহ কোন কথা বলিল না, শুধু নীরবে দুই জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে কমলা একরাশ খাবার লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—সব খেতে হবে, একটি যদি ফেল্‌বেন, মজা টের পাবেন।—মায়া তুই খাওয়া, আমি ঠাকুরকে কতকগুলো কথা বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

মুকুল হাসিয়া বলিল—তাহ'লে ঐ রইল সব। আমি হাত গোটালাম।

কমলা বিষম রাগিয়া উঠিয়া বলিল—তা আর নয় ?—

মুকুল। আপনি বসুন, আমি থাচ্ছি, জুলুমটা একতরফা হ'বে কেন ?

মায়া এবং কমলা দুই জনে তাহাদের এই নবপরিচিত বন্ধুটিকে ঘিরিয়া সহস্র আদর আব্দার অনুযোগের ভিতর দিয়া এমন একটি মায়াজাল বিছাইয়া দিল যে, মুকুল মনে মনে বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিল, এ জাল ছিন্ন করিবার শক্তি মানুষের নাই। এত আনন্দ সে কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আজ কেন করিল, ইহাই তাহার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হইতেছিল।

আহারের পর বিদায় লইবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইলে কমলা আবার বলিল—চিঠি দেবেন ?—

মুকুল। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়কে নিবিড় ক'রে তোল্‌বার ও-একটা যন্ত্র, না কমলাদেবী ?

কমলা। অত-শত বুঝি না, আপনাকে যতটুকু জেনেছি তাতে বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছে। বিদেশে যাচ্ছেন, অসুখ-বিসুখ, আপদ-বিপদের অন্ত নেই, খবর না পেলে অনেক রকমের কথা মনে জাগ্‌বে। মানুষ একবার যাকে আপনার ক'রে ভাবে, তাকে সহজে কি মন থেকে বিদেয় দিতে পারে ?—

স্বপ্নাবিষ্টের মত মুকুল বলিতে লাগিল—লিখ্‌ব কিনা জানি না কিন্তু আমার খুব লিখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌বে, আর আপনাদের কথা সব সময় আমার মনে থাক্‌বে।

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—অমন ক'রে কথা বল্‌ছেন কেন ? এ যেন চির বিদায় নেবার সুর !—

মুকুল। তাই।

কমলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—কেন ?—

মুকুল। আমার একটা বদ্ রোগ—যতদিন মানুষের কাছে অপরিচিত থাকি, বেশ থাকি, ভালবাসা পেলেই আর টিঁক্‌তে পারি না। আপনাদের ভালবাসা আমায় দেশ-ছাড়া কর্‌ছে।

কমলা অভিমানের স্বরে বলিল—এই কথা ?—বেশ, আমরা আর আপনাকে বিরক্ত কর্‌ব না, আপনি থাকুন।

মুকুল হাসিয়া বলিল—তা আর হয় না, আমিও ভালবাস্‌তে সুরু করেছি।

কমলা। এ কি রকম যুক্তি! ভালবাস্‌লে মানুষ দূরে যায় ?—

মুকুল। আমার জীবন সব যুক্তি-তর্কের বাইরে। আপনাদের কোন বিধি-বিধান আমার জন্যে নয়।

কমলা। স্নেহ, বন্ধুত্ব ?—

মুকুল। বিধাতার উপহাস ব'লে মনে হয়। সহ্য করা কঠিন।

কমলা। আপনাকে ভাললাগ্‌তে আমার মোটেই সময় লাগে নি কিন্তু আপনাকে বুঝ্‌তে আমার দেরী হবে।

মুকুল। এই সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে রাখবেন—সব চেয়ে বেশী দুঃখ পাই—মেয়েদের কাছে এসে দাঁড়ালে।

কমলা। কিন্তু অশ্রদ্ধা ত করেন না ?—

মুকুল। অশ্রদ্ধা ?—প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মাথাটা আপনাদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়্‌তে চায়।

কমলা। এ কোন্ দেশী যুক্তি!

মুকুল। বলেছি ত, আমার মধ্যে কোন যুক্তি-তর্ক নেই।—সব চেয়ে বেশী আনন্দ যেখানে আছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ধর্‌তে গেলে—ব্যথায় বুক টন্ টন্ ক'রে ওঠে!—এ ব্যথা আমার কোন্ যুক্তির অধীন ?—

সহসা মাথা নোয়াইয়া মায়া এবং কমলাকে নমস্কার করিয়া মুকুল ঘরের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

মায়া এবং কমলা মুকুলের সহিত বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

কয়েক ধাপ্ নামিয়াই কমলা কি ভাবিয়া ছেলে-মানুষী স্বরে বলিল—মুকুল-দা, তুমি একটু দাঁড়াও না ভাই, আমি একটা জিনিষ তোমায় এনে দিই, একটু দেরী হবে, সেটা খুঁজে বার্ করতে হবে কি না।—যেও না আমি না-আসা পর্য্যন্ত—

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া মুকুল বলিল—ও কি ?—

মায়া হাসিয়া বলিল—বিশেষ কিছুই না, খুব স্বাভাবিক আত্মীয়তার একটা সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র—যার ভিতর দিয়ে স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা এমনি কতকগুলো মানুষের পূজার ভাব আমরা প্রকাশ করি।—নেওয়া না-নেওয়া আপনার ইচ্ছে।

মুকুল। কি সুন্দর !

মায়া। কোন্‌টা ?—

মুকুল। ওর মুখের ঐ কথাটা—মুকুল-দা . . . পৃথিবীর মানুষের আজ আমি আত্মীয় . . . আমি ভাই !—এতদিন মনে হ'ত, আমি বেঁচে আছি মৃতের পৃথিবীতে—সুখ শান্তি তৃপ্তি স্বার্থ এই সবের মধ্যে সবাই অনন্তকাল ধ'রে ম'রে আছে, আমাকে তাই কেউ দেখতে পায় না !—

দুইজনে ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি ধাপ্ নামিয়া আসিল। সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া কমলার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে মায়া সহসা মুকুলের হাতের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল—মুকুল—

ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি মায়ার মুখের উপর তুলিয়া মুকুল চাহিয়া রহিল।

আজ সন্ধ্যার প্রত্যেকটি কথা, মানুষের প্রত্যেকটি ব্যবহার, তাহাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল! এমন করিয়া জগতের পরিচয় সে কোন দিন পায় নাই! মানুষের স্নেহকে, মানুষকে, এত কাছে সে কখনও অনুভব করে নাই। কোন নারী স্পর্শ দিয়া এমন করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইবার প্রয়াস করে নাই! এমন স্বরে কেহ তাহাকে ডাকে নাই! বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া লইবার জন্য যেন তাহার জননী তাহাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল . . . জন্ম-পথিকের হারান পথিক-বধূর এ যেন আনন্দের আর্ত্তনাদ! প্রিয়ের সন্ধান সে পাইয়াছে . . . তাহার হাতখানি নিবিড় ভাবে ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে যেন টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! কিন্তু কোথায়, তাহা যেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না! কিছু বুঝিবার ক্ষমতাও যেন তাহার নাই!—সে আবার শুনিল—মুকুল—

বিদ্বেষপূর্ণ চাপা কণ্ঠে মুকুল বলিল—কি চাও?—

মায়া। তোমাকে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না।

মুকুল। কি কর্‌বে?—

মায়া। ধ'রে রাখ্‌ব।

মুকুল তাহার মুখে অমানুষিক হাসির রেখা টানিয়া বলিল—অসম্ভব। কোন আশ্রয়, কোন বন্ধন আমি সহ্য কর্‌তে পারি না।

মায়া। কিন্তু আমরা মানুষ, মাটির পৃথিবীতে আমাদের বাস। আমাদের ওপর দিয়ে চলে যেতে পার, কিন্তু দাগ মুছে নিতে পার না পথিক।

মায়ার কথায় সহসা মুকুল উৎফুল্ল হইয়া বলিল—পথিক—পথিক! চমৎকার নাম! সত্যি আমি পথিক। আমি ভালবাসি পথকে, তাই শুধু সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চলি।

মায়া। আর পথ ভালবাসে পথিককে, সে কথা মনে রেখো; পথিকের পায়ের চিহ্ন তার বুকে আঁকা হ'য়ে যায়।

মুকুল অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু আর নয়, আর একটি কথা নয়—এই শেষ।

মায়া সরিয়া আসিয়া বলিল—যাও।—তোমার পথ আট্‌কাব না।

মুকুল। ব্যথা পেলে?—

মায়া। ভয়ানক।—প্রকাশ করতে পার্‌ছি না।

মুকুল ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—কিন্তু ওটা তোমায় আমি দিতে চাই নি।

মায়া। তা জানি।

দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সহসা মায়া মুখ তুলিয়া বলিল—বিদায় বেলায় তোমার কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি—আমাকে এমন কিছু দিয়ে যাও, যা ভুল্‌ব না কোন দিন, যার দাগ কলঙ্কের মত অক্ষয় হ'য়ে থাক্‌বে—'

কথা বলিতে বলিতে মায়া মুকুলের কাঁধের উপর তাহার কম্পিত হাত দুইটি রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া মুকুলের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল।

মুকুল সরিয়া আসিয়া বলিল—বেশ, তাই দিলাম, নাও। এ-দান আমার তুমি ভুল্‌তে পারবে না কোন দিন।

মায়া কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল—কি পেলাম?—

মুকুল বলিল—উপেক্ষা।—এটা দিয়ে আমিও আজ রিক্ত হয়ে গেলাম।

* * * *

কমলা তাহার নিজের একখানি ছবির উপর নাম স্বাক্ষর করিয়া সেখানি বাতাসে শুখাইতে শুখাইতে সিঁড়ির উপর হইতে ডাকিল—মুকুল-দা, বড় দেরী ক'রে ফেলেছি, না? কি করব খুঁজে পাচ্ছিলাম না—

নীচে নামিয়া সিঁড়ির উপর মায়াকে স্তব্ধভাবে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কমলা বলিয়া উঠিল—ও কি! তুই একা যে!—মুকুল-দা কোথায়?—

মায়া। চলে গেছেন।

কমলা। এটা না নিয়েই!—

মায়া। হাঁ। কিন্তু যাবার সময় মস্ত বড় একটা জিনিষ দিয়ে গেছেন—

মায়ার গলা জড়াইয়া কমলা বলিল—কি ভাই?

মায়া বলিল—উপেক্ষা।—ওটার ভাগ আমি কা'কেও দিতে পারব না।

মায়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল তখন যে-কেহ তাহাকে দেখিলে ভাবিত, বুঝি মানুষটা সহসা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে! আপনার মানস-কল্পিত ভয় বা বিসদৃশ কোন

বস্তুর ছায়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার দিকে তাহারই মত উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া আসিতেছে ইহা যেন সে বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া আপনাকে লইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিতেছে !

শ্রীশ পথে নামিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়া একবার চারিধার দেখিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।—কিন্তু ইহা চলা নয়, ছুটিয়া চলা। পলায়ন করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য ; গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে ভাবিবার কথা তাহার মনে নাই।

তাহার কানের কাছে এক নারী বিচারকের মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছে—তুমি দায়ী—তুমি . . . তুমি সর্ব্বনাশ করেছ তার . . . খেয়ালী পুরুষ ! প্রেমের মর্য্যাদা, জীবনের মূল্য ব'লে তোমার কাছে কিছু নেই ? . . . তার হাত দিয়ে যত অন্যায় অকল্যাণ ঘটেছে, তুমি সে-সবের মূল—

ছুটিয়া চলিবার চেষ্টায় বহু পথিকের সহিত তাহার সংঘর্ষ হইতেছে ! প্রত্যেকের নিকট হইতে সে কিছু-না-কিছু কটূক্তি সংগ্রহ করিয়া লইতেছে ; কিন্তু সে-সবের প্রতি তাহার মন নাই। ফুটপাথের ভিড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পথে নামিলেই কোন না কোন প্রকারের গাড়ী তাহার এত নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে যে, পথের লোক তাহা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে ! —লোকটা কি অন্ধ ?—না কালা !—হাসি-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ দু' একটা শরও তাহাকে বিদ্ধ করিয়া যাইতেছে।

একটা চৌমাথা পার হইয়া কিছু দূর গিয়া শ্রীশ সহসা থামিয়া পড়িল। একবার ভাবিতে চেষ্টা করিল, কোথায় আসিয়াছে।—চারিধারে দোকান, ভিড় করিয়া মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। গোলমাল, পণ্যদ্রব্য লইয়া ক্রেতার সহিত বিক্রেতার বচসা, মাল-বোঝাই শকট, অপরিষ্কার,

অপরিসর পথ, তাহার দুই পাশে আবর্জ্জনার পর্ব্বতের মত ভাঙ্গা রং-ওঠা ইট-বাহির-করা অট্টালিকা আকাশে গিয়া মাথা ঠেকাইয়াছে! ধুলা এবং ধোঁয়ায় চারিধার ঢাকা, সূর্য্যের আলো যেন মানুষের নিকট হইতে এখানে প্রবেশ করিবার ছাড়্পত্র পায় নাই, পাইবার আশাও নাই।—কিন্তু এখানকার মানুষকে এমন জীবন্ত বলিয়া তাহার মনে হইল যাহা আর কোথাও কোন দিন সে দেখে নাই। বাহিরের খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে এমন করিয়া মানুষকে দেখিবার বা অনুভব করিবার সুযোগও তাহার হয় নাই।

সকলে এখানে ঠকাইতেছে, ঠকিতেছে, ক্রয় করিতেছে, বিক্রয় করিতেছে, অর্থ দিতেছে অর্থ গ্রহণ করিতেছে; সমস্তের মধ্যেই এমন একটা বিষাক্ত-সজীবতা আছে, যাহা বুঝি মানুষেই সম্ভব।—লাভ করিতে হইবে, বাঁচিতে হইবে, ইহাই যেন চীৎকার করিয়া সকলে বুঝাইতে চায়! . . . লোভ যেন ইহাদের ধর্ম্ম, হিংসাকে গুপ্ত অস্ত্রের মত প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুকে আমূল বসাইয়া দিতেছে! প্রেম, আলো, মনুষ্যত্ব, এই সমস্ত কথা যেন ইহারা কোন দিন শুনে নাই! . . .

দেখিতে দেখিতে শ্রীশের মনে হইল, ইহারাই বুঝি মানুষের যথার্থ রূপ। সভ্যতা, দয়া, মায়া, এ সমস্ত যেন বাহিক আবরণ, যাহার প্রচলন এ-রাজ্যে নাই! থাকিলেও হাস্যোদ্দীপক হইবে।—এ যেন সম্পূর্ণ নূতন এক সৃষ্টি!—এই ঠেলাঠেলি হানাহানির মধ্যে আপনাকে যেন অশরীরী বলিয়া শ্রীশের মনে হইল! সে সকলকে দেখিতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না!

নানা প্রশ্ন শ্রীশের মনে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। সে ভাবিল—মায়া যদি এখানে থাকিত সে ইহাদিগকে দেখিয়া কি

ভাবিত ?—অবনতি ?—অধঃপতন ?—কাহাকে সে দোষী করিত ?—আমাকে ?—

কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহার পর কখন সে আবার আলো-বাতাসের রাজ্যে আসিয়াছে জানিতে পারে নাই। অস্তমিত-সূর্য্যের গৈরিক আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত, সেই আভা সমস্ত পথে, গৃহগাত্রে, মানুষের সর্ব্ব শরীরে আসিয়া পড়িয়াছে! মানুষের মুখে হাসি, চোখে করুণা! হঠাৎ দেখা-হওয়া-বন্ধুর হাত ধরিয়া বন্ধু বলিতেছে—ভাল আছ ভাই ?—

শ্রীশের মন ভরিয়া উঠিল। কিছু দূরে দণ্ডায়মান একটি গাড়ীর চালককে নিকটে আসিবার ইঙ্গিত করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং গাড়ী আসিলে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া বলিল—চল, হাণ্টারফোর্ড্ ষ্ট্রীট।

কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিস্ময়ে তাহার মন ভরিয়া গেল!—কেন সেখানে যাচ্ছি ?—কি প্রয়োজন ? . . .

কিন্তু কোন প্রয়োজন যে নাই তাহাও নিজেকে সে বুঝাইতে পারিল না।

গাড়ী চলিতে লাগিল।

শরীর অনেক সময় স্থির হইয়া থাকিলেও মন চিরচঞ্চল। যে-কোন বিষয় লইয়া তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজ-খবর লওয়া তাহার রোগ।—মন প্রশ্ন করে, মনই তাহার উত্তর দেয় এবং ব্যথা বেদনায় মনই আড়ষ্ট হইয়া উঠে। শরীরটাও যে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ সময় সে সমস্ত মানসিক আঘাতে নিশ্চেষ্ট হইয়াই পড়িয়া থাকে।

শ্রীশ বসিয়া আছে, এবং তাহার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—কেন যাব ?—’

উত্তর হইল—‘নিজের চোখে দেখ্‌ব আমি তার কি করেছি।’

প্রত্যুত্তর হইল—‘ভাল জিনিষই দেখ্‌বে।—বিলাসী, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ, নিজের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে তার চারপাশে ভিড় ক’রে ব’সে আছে ; আর গানের সুরে, হাসির হিল্লোলে, দেহের ভঙ্গিমায়, চোখের ইঙ্গিতে প্রত্যেককে সে তুষ্ট ক’রে চলেছে।—এদের সকলকেই তার প্রয়োজন, সকলেরই তাকে প্রয়োজন . . . পাণ্ডুর গণ্ডে তার অস্বাভাবিক লালিমা, হাতের ধূমায়িত সিগারেটের কোণে ঠোঁটের রংএর ছোপ লেগেছে . . . পোষাকের পারিপাট্য আছে কিন্তু তাতে শরীরের প্রতি শ্রদ্ধা আর শ্লীলতা প্রকাশ পায় না !—তোমাকে দেখে সে হাস্‌বে ; সে হাসি বিষাক্ত ছুরির মত তোমার বুকে লাগ্‌বে।—সইতে পারবে ?—’

‘আর ভাব্‌তে পারি না।—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে, আমি দেখ্‌বই তাকে—’

পথ আর ফুরায় না ! কত গৃহ কত উদ্যান পিছনে রাখিয়া তাহার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, সেও যেন বলিতেছে, যেতেই হবে—যেতেই হবে—’

সহসা একটি পথে আসিয়া সমস্তই তাহার অত্যন্ত পরিচিত ঠেকিল ! প্রত্যেকটি গৃহ, প্রত্যেকটি বৃক্ষ, পথের ধারের আলোক-স্তম্ভ, চিঠি ফেলিবার বাক্স, জলের কল, প্রত্যেকটি খুটি-নাটি জিনিষ তাহার পরিচিত মনে হইল !

ঐ ত সেই ফটকটি সেই পুষ্পিত লতায় ঢাকা ! সন্ধ্যার ছায়া-মাখা নিবিড় বৃক্ষের শ্রেণী, সবই পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে !

চালককে গাড়ী ভিতরে লইবার জন্য শ্রীশ আদেশ করিল এবং কেন যে এখান হইতে গাড়ী ফিরাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না, তাহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইয়া গেল !

আপনাকে আজ যেন যন্ত্রবিশেষ বলিয়া মনে হইতেছিল !

গাড়ী, বারান্দার নীচে আসিয়া থামিতেই শ্রীশের বক্ষের স্পন্দনও যেন থামিয়া গেল।—সে কি করিবে ?—

কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। একজন বেয়ারা আসিয়া বলিল—মেম-সাহেবের তবিয়ৎ ভাল নেই, মুলকাত্ হবে না।

কি আশ্চর্য্য ! তাহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য এই লোকটা কি করিয়া জানিল ?—হয় ত এ-সময়ে যাহারা আসে, তাহারা মেম-সাহেবের কাছেই আসে এ বিশ্বাস চাকরদের মনে বদ্ধমূল আছে। শ্রীশের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া বেয়ারা বলিল—আপনার কার্ড রেখে যেতে পারেন।

শ্রীশ গাড়ী ফিরাইবার আদেশ দিয়া বেয়ারাকে বলিল—তার দরকার নেই।

ধীরে ধীরে আবার সে পথে বাহির হইয়া আসিল কিন্তু বেশী দূর না যাইতেই সে গাড়ী থামাইয়া নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আপনার মনে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথ চলিতে সুরু করিল। তাহার মনের মধ্যে একটা লজ্জা-মিশ্রিত আনন্দ এবং মুক্তির সুর জাগিল—'যা দেখ্‌ব ভেবেছিলাম তা'ত হ'ল না !—'

উত্তর হইল—'তা'তে খুসী হবার কি আছে ? ওর আজ অসুখ, আর তোমার সেখানে যাবার অধিকার নেই . . . তোমার জায়গাটা কোথায় তা মনে রেখো—'

এই রূপে আপনার মনের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত শরীর মন লইয়া শ্রীশ যখন গৃহে ফিরিল, তখন অনেকটা রাত্রি হইয়াছে। আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেই মহম্মদ আসিয়া জানাইল—একজন মেমসাব্ অনেকবার তাঁহাকে টেলিফোনে খুঁজিয়াছেন, বড় জরুরী কাম। মেমসাবের ফোন্ নম্বর ৫৮৩।

শ্রীশ স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি আশ্চর্য্য!—কি ক'রে সম্ভব হ'ল?—আজ পাঁচ বছর পরে—'

শ্রীশ ধীরে ধীরে আসিয়া ফোন্ ধরিয়া রিং করিয়া নম্বর বলিয়া কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিপ্রিয় আবেগকম্পিত পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল—হ্যালো!

শ্রীশ উত্তর দিল—আমি শ্রীশ।

উত্তর পাইল—আমি তটিনী।—একবার এস।

এখন?—

হাঁ এখনই।

এই রাত্রে!

সম্ভব নয়?

না।

বিষাদভরা কণ্ঠের উত্তর শ্রীশের কানে আসিল—ভুলে গেছি, মনেই ছিল না! কিন্তু দরকারটা এত বিশ্রী জিনিষ, কোন নিয়ম মানে না।—তুমি কি এই মাত্র বাড়ী ফিরলে?—

শ্রীশ উত্তর দিল—হাঁ।—সন্ধ্যা বেলা একবার তোমার কাছে গিয়েছিলাম, মানে দরজা পর্য্যন্ত।

আমার কাছে!—তুমি নিজেই?—

হাঁ ; তোমার বেয়ারা বল্‌ল—দেখা হ'বে না।

আর তুমি ফিরে গেলে ?—

হাঁ। তোমার হুকুম ছিল দরজা আগ্‌লে।

সে তোমার জন্যে নয়।

তা জানা ছিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এবং বিষাদ-মাখা সুর শ্রীশের কানে আসিল—না, তোমার দোষ নেই, তুমি আর কি করবে ফিরে যাওয়া ছাড়া ? কিন্তু আজ প্রায় সমস্ত দিন এই চেয়ারটায় বসে আছি ফোন্‌টার দিকে চেয়ে ; কত জনের সাড়া পেলাম, শুধু তোমার ছাড়া ; আজ অনেকবার তোমায় ডেকেছি।

কি হ'য়েছে তোমার ?—

এলে জান্‌বে। কাল এস সকালেই, বেশী দেরী ক'র না। ভয়ানক বিপদে পড়ে তোমাকে ডাক্‌ছি—এ সময়ে কোন অভিমান অপমানের কথা মনে রেখো না শ্রীশ—

শ্রীশ উত্তর দিল—কাল সকালেই আমায় পাবে।

কিন্তু এতটা সময়, এই সমস্তটা রাত কি ক'রে কাটাই বল ত ? তটিনীকে তোমার মনে আছে শ্রীশ ? সেই তটিনীই তোমায় ডাক্‌ছে, তটিনী মিসেস্ দত্ত নয়, তাকে তুমি ক্ষমা না করতেও পার। আচ্ছা জীবন কে ? তার সম্বন্ধে কিছু জান ?

আমার বন্ধু।—কেন ?

সে আমাকে মুগ্ধ করেছে ! আশ্চর্য্য মানুষ !

এখন আমাকে কিছু বল্‌তে পার না ?—

সম্ভব নয়।

আচ্ছা, কালই জান্‌ব সব।

কান্নায়-ভেজা গলায় উত্তর আসিল, তুমি আস্‌বে? অনেকটা সাহস পাচ্ছি—আর ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে মনে ক'রে, যে এত অপমানের পর তুমি আজ নিজের থেকেই এসেছিলে! অনেক কথাই এই সঙ্গে মনে উঠ্‌ছে, শুয়ে শুয়ে খুশী মত সে সব কথা ভাব্‌ব।—এখন আসি?—

শ্রীশ উত্তর দিল—এস।

—৩৭—

রাত্রির যে গভীরতা, ঘড়ীর কাঁটায় তাহা ধরা পড়ে না। সে ধরা পড়ে ঐ মানুষটির চোখের পাতায়, বুকের তলায় যে রাবণের চিতার মত চিন্তার অনির্ব্বাণ-শিখা জ্বালিয়া বসিয়া আছে। অপমানের বেদনা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে যাহার মন হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। মানুষের মনের মলিনতা যাহার হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধাকে এক নিমেষের জন্যও চরম-নিবৃত্তির আস্বাদ লাভ করিতে দেয় নাই। যাহার বিশ্বাসকে, শ্রদ্ধাকে, নিষ্ঠাকে, অবজ্ঞাভরে মানুষ পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আকাশের অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মত শত অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা যাহার বুকে তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। বিশ্রাম যাহার সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না; নিদ্রা যাহার ঝলসিয়া পুড়িয়া মরিয়া যায়।—সেই মানুষটির উত্তপ্ত ললাটে লেখা থাকে—রাত্রি কত ক্রূর, রাত্রি কত কঠিন। রাত্রি গভীর নয়—সীমাহীন। রাত্রি মোহন নয়—ভয়ঙ্কর, অসহ্য।

যাহারা সুবিধাবাদী, শরীরকে যাহারা পণ্য-দ্রব্যের মত শান্তি-সুখের হাটে হাটে লইয়া বিকাইয়া বেড়ায় বা ক্রয় করিতে চায়; জীবনকে যাহারা বাঁধিয়া রাখে, প্রেমকে যাহারা তুচ্ছ ভাবিতে পারে—রাত্রি তাহাদের কাম্য বস্তু। রাত্রি তাহাদের লোভকে চরিতার্থ করে; ভোগের এবং লাভের পেয়ালা কাণায় কাণায় ভরিয়া দেয়।

কিন্তু প্রাণকে যাহারা পরম শ্রদ্ধা দান করিয়াছে, প্রেমকে যাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুভব করিয়াছে, শরীর তাহাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। কিছুতেই তাহারা ইহাকে কলুষিত হইতে বা দেখিতে পারে না। প্রেমহীন, প্রাণহীন শরীরের প্রতি তাহাদের কোন মোহও থাকে না। কিন্তু এই শরীরের মধ্যেই যে প্রেমের বাসা; শুক্তির বুকে মুক্তার মত প্রেম যে এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে; প্রেমিক মানুষ ইহা জানে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া ইহাকে বাহির করিতে পারে না।—কারণ সে যে ব্যবসাদারী!

সুবিধাবাদী মানুষ, এই ব্যবসায়-বৃত্তিহীন মানুষগুলিকে ভাবে নির্ব্বোধ। তাহাদের প্রেমকে উপহাস করে, তাহাদের দুঃখকে অশ্রদ্ধা করে।

তবু পৃথিবীতে এই নির্ব্বোধ মানুষের সংখ্যা অল্প নয়। মানুষের উপহাস অশ্রদ্ধা সহ্য করিয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। তাহারা দুঃখী নয়, তাহারা অনন্ত সুখের অধিকারী। তাহাদের মনে আছে অখ[illegible] শান্তি। বিরাট্ মুক্তিকে তাহারা বুকের মধ্যেই পাইয়াছে। তাহাদের জীবন, প্রদীপের মত ধীরে ধীরে নিঃশেষিত নির্ব্বাপিত হইলেও তাহারা দিয়া যায়—আলো। বিধাতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অন্ধকার মিলিত হইয়াও ইহাকে ম্লান, নিষ্প্রভ করিতে পারে না। বাদল-রাতের

উতল-ধারার সুরে সুর মিলাইয়া গভীর আনন্দে তাহারা গাহিয়া উঠে :—

কোন্ দূরের মানুষ এল যেন আজ কাছে,
তিমির আড়ালে, নীরবে দাঁড়ায়ে আছে !
বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন-মিলন অমৃত-গন্ধ ঢালা !
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি ! . . .

বঞ্চিত-হিয়ার সঞ্চিত এ অশ্রু-মতি হার, বিশ্বের বিরহীর বুকে আসিয়া দোল্ খায় ।—সব-পাওয়ার অপেক্ষা সব-হারানোর আনন্দ হয় বড় ।

কিন্তু বিনা অন্বেষণে যে এই পরম সম্পদ পাইয়াছে ; বক্ষের মণি, আপনার হাতে ছিঁড়িয়া যাহার পায়ে ডালি দিয়া শুক্তি বলিয়াছে—লহ লহ ; যাহা আছে সব লহ জীবনবল্লভ ! আমার প্রেমের আহুতি হোক্ আমার এই রক্ত-মাংসের শরীর, তোমার ক্ষুধার হুতাশনে পূর্ণ-তেজে জ্বলে উঠুক . . . আমার ব'লে যা কিছু আছে, তা তোমার ক'রে নাও—'

ইহার উত্তরে যে অপ্রয়োজনের উদাসীনতা দেখাইয়া বলিয়াছে—'মিথ্যা ।—বিশ্বাস করি না ।' তাহার পর আপনার চরণপ্রান্তে সেই প্রেমকেই মৃত, হিমশীতল দেখিয়া যে আবার বলিয়া উঠিয়াছে—'সত্য । বিশ্বাস করি । ফিরে এস ।' তাহার দুঃখকে বর্ণনা করিবার ভাষা নাই ।

রাত্রি গভীর । পৃথিবী সুপ্ত । শ্রীশ জাগিয়া আছে । সবুজ শেড্-এ ঢাকা আলোটি তাহার টেবিলের উপর জ্বলিতেছে । জীবন্ত-জগতের

পরপার হইতে সে আজ তাহার হারান-প্রিয়ার ব্যাকুল আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে! তাহার চোখে আর ঘুম নাই। অবহেলার দিনে দেখা তাহার প্রিয়ার মুখ আজ নব-রূপমাধুরী লইয়া তাহার চোখে স্বপ্ন-পরশ বুলাইয়া দিতেছে। তাহার কথা, নূতন অর্থ লইয়া শ্রীশের হৃদয়কে এক নূতন অনুভূতি, নূতন জাগরণের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

বারে বারে তাহার মনে পড়ে—আপনার হৃদয়হীনতার কথা। আর তাহার উত্তরে যাহা শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠে।

একদিন সে তটিনীকে বলিয়াছিল—দেখ, তুমি যদি তোমার ঐ second-rate sentimentality আর hysteric—ভাবটা মন থেকে তাড়াতে পার, তা হ'লে হয় ত সাহিত্যের কিছু উন্নতি করতে পারবে।

এই উক্তির পর, ম্লান মুখের একটি হাসির রেখা এবং অশ্রু-ছল্-ছল্ চোখ দুটির যে ছবি একদিন সে দেখিয়াছিল, আজ তাহা দেখিলে—

শ্রীশ, তাহার ড্রয়ার টানিয়া, রাশীকৃত তাম্র-শাসন, শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তির প্রতিলিপি, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের তাড়া প্রভৃতি মাটির উপর নামাইয়া, সবার তলা হইতে বাহির করিল—সিল্-করা, ধূলি-মলিন একটি ফাইল; বহু যত্নে সে তাহাকে কোলের উপর তুলিয়া লইল। তাহার চোখে মুখে তখন ফুটিয়াছিল সেই দণ্ডদাতা মহারাজার ব্যথা-করুণ ভাবটি, আপন প্রিয়াকে যিনি লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, অন্ধতম গহ্বরে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ তাহাকে আপনার হাতে বাহির করিয়া, নিজের দেওয়া ব্যথার-দানগুলিকে আরক্ত চোখে দেখিতেছেন।

শৃঙ্খল টুটিয়া গিয়াছে! পাষাণ তাহার ভার লইয়া বুক হইতে নামিয়া গিয়াছে! মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি! আলো-বাতাসের জোয়ার যেন বুকের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে চায়! প্রিয়ার আদর আহ্বান, ব্যাকুল-প্রতীক্ষার অভিমান-অশ্রু-জড়িত স্বর শ্রীশের চারি পাশে এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে! লোভী, ভিক্ষুকের মত সে আকণ্ঠ পুরিয়া সে-স্বরধারা পান করিতেছে।

'. . . সকাল বেলা যে মাধবী-ফুলগুলি দিয়ে গিয়েছিলে, দুপুরে তা শুখিয়ে উঠেছিল, গন্ধও ছিল না!—এখন, এই রাত্রে, সেই শুখ্‌ন ফুলে এমন সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি, কি বল্‌ব! এ যেন স্মৃতির সৌরভ! তোমার স্মৃতি ঐ ফুলগুলির সঙ্গে এমন ক'রে জড়ান আছে আমার মনে যে একটি ফুলকে দেখ্‌লে তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে পড়ে যায়।—ফুলগুলি দিতে এসে হাতখানি হাতের ওপর রাখা . . .

আচ্ছা, দুঃখের চেয়ে সুখও যেন সময় সময় অসহ্য মনে হয়, না? মেঘ্‌লা-দিনের সেই স্পর্শ-স্মৃতিটুকু আমার বুকে যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সে সুখের ভার যেন আর বইতে পারি না মনে হয়! অত সুখ সয় না বলেই ত তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারি না বেশীক্ষণ!—কি আছে তোমার চোখে বল না? কবে আবার দেখ্‌ব তোমায়?—'

উদাসীনতা নির্লিপ্ততা উপেক্ষার অন্তরালে এতখানি দেনা-পাওনা হইয়া গিয়াছে! ফুলগুলি দিবার সময় হাতখানি সে তাহার হাতের উপর রাখিয়াছে! চির-উপবাসী প্রাণ, তাহার ঐ অনবধানের

দানটুকুর মধ্যেই প্রচুর সংস্থান করিয়া লইয়াছে! জগতের সমস্ত কঠিনতম উপেক্ষাও বুঝি তাহাকে আর রিক্ত করিতে পারিবে না!

'. . . আজ হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল শ্রী, কয়েক দিনের মধ্যেই মাকে নিয়ে চেঞ্জে যাব। কিন্তু তোমায় না দেখে থাক্‌ব কি ক'রে?—জানি না! তুমি বল, এটা আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু এর ওপর ওঠ্‌বার শক্তি আমার নেই। তুমি নিজেই জান না, তুমি কত সুন্দর! আমার চোখকে কি তৃষ্ণাতুর ক'রে দিয়েছ! তোমার হাসি, তোমার চাউনি, সব মিলে আমায় পাগল ক'রে দেবে!—আচ্ছা শ্রী, তোমার গানের সুরে যে ব্যাকুলতা আছে, তোমার প্রাণে তা নেই কেন?—জান, তোমার গানের সুরের সঙ্গে আমার প্রাণের কান্নার বিয়ে হয়ে গেছে! হয় ত হেঁয়ালি ভাবছ না?—আমার মুখের কথা তুমি বুঝ্‌তে পার না, তাই এই চিঠি-গুলোকে বলি, তোমরা ত জেনেছ আমার অন্তরের গোপন কথাটি, তার কানে কানে ব'লে দিও—আমি অবিশ্বাস সইতে পার্‌ছি না আর—থাকৃগে কি হবে কতকগুলো কথা ব'লে? সীমাবদ্ধ ভাষায় আমার অসীম বেদনাকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা যে পাগ্‌লামী, তবু চেষ্টার অন্ত নেই . . .'

* * * *

'. . . দেখ শ্রী, আমার মনে হয়, আমি হঠাৎ কবি হয়ে উঠেছি! শুন্‌বে একটা কবিতা?—

সারাদিন ঘর-কন্নার কাজে বধূর দিন কেটে যায়, তার মন প'ড়ে থাকে প্রিয়ের কাছে।—কখন তার চির-আকাঙ্ক্ষিত

মিলন-রাত্রি আস্‌বে! মালাটি হাতে নিয়ে সে থাক্‌বে বরের প্রতীক্ষায়! বর আস্‌বে। মালাটি প'রে নেবে তার গলায়। মুখে ফুট্‌বে তার মোহন হাসি, বধূর কণ্ঠে এসে দুল্‌বে, বরের গলার মালা! চোখের পাতায় দেবে চুম্বন, জীবন ভ'রে উঠ্‌বে। হাসি-কান্নার সুরে বাঁধা বধূর দেহটি থাক্‌বে বীণার মত বরের কোলে, তার মোহন অঙ্গুলি স্পর্শে দেহ-বীণার সবক'টি তারে বাজ্‌বে একটি সুর—মরণ—মরণ—মরণ—

কি বল্‌ছ ?—ছ্যা-ছ্যা! জোলো কবিত্ব ? দেখ শ্রী, তোমার ঐ অবিশ্বাসী মনটা যেন আমার সতীন! কোন মতে ওর গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পার্‌তাম—'

*   *   *   *

'কোথায় যেন পড়েছি—Infinite passion and the pain of the finite heart that yearn—এই ধরণের একটা কথা।—আজ বার বার তাই মনে হচ্ছে! আচ্ছা, সব চাওয়াই কি অসীম, আর পাওয়াগুলো সব স-সীম ? বেশ ব্যবস্থা কিন্তু!

আস্‌বে একবারটি ?—'

*   *   *   *

'তোমার কাছ থেকে একটা জিনিষ চেয়ে নিতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে, দেবে ?—কিন্তু চেয়ে নেওয়ার চেয়ে অমনি পেলে আরো ভাল লাগে, তাই এত দিন চাই নি; আশা ধরেই বসে বসে পাওয়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি

তুমি যা কৃপণ, তাতে আশা বিশেষ নেই। আচ্ছা ধর যদি ভিক্ষে না চেয়ে ডাকাতি করি, তুমি কি করতে পার? তুমি যখন তোমার টেবিলে বসে ঘাড় গুঁজে 'প্রেত্নীতত্ত্বের' পুঁথি লেখ, তখন যদি পিছন থেকে দুহাত দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে আমার মুখখানা চেপে ধরি তোমার মুখের ওপর, কি হয়? পারি না ভাবছ?—খুব পারি। কিন্তু আমি তা করব না। আমি আশা ধরেই বসে থাকব।—এমন লক্ষ্মী-মেয়েকে তুমি ভালবাস না! আমারই যে লোভ লাগছে!—'

*　　　*　　　*　　　*

'. . . সকাল বেলা তোমাকে চিঠিটা যখন লিখি, তখন বৈরাগ্য-সাধনের কতকগুলি কবিতা পড়ছিলাম, তাই মনটাও সেই রকম স্যাঁৎ-সেঁতে হয়ে উঠেছিল।—'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাহি না।' এই সব। আর এখন যা পড়ছি, তার মধ্যে বহু যুগের সুপ্ত-হিংসা, বুভুক্ষা, লোভ, বাসুকির মত সহস্র ফণা নাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে! এর মধ্যে আছে বল্‌শেভিকবাদ। যা' লুটেপুটে নিতে পার, তাই তোমার . . . এখন এস না, বিপদে পড়বে—'

*　　　*　　　*　　　*

'কাল মায়ার সঙ্গে আমার ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল। তুমি চলে যাবার একটু পরেই ও এসেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সইতে পারি নি। মরুভূমির দেশে জন্মেও যে সরসতা তার বুকে ছিল, তুমি তোমার শিক্ষায় দীক্ষায় তা সরিয়ে নিয়েছ। ওর একমাত্র উপমা মনে হয়—(কবির ভাষায়) মরুভূমির

মঞ্জরিহীন লতা। চল্‌তি কথায়—ঝামা। ভালবাসার নামে তোমারই মত নাক্ সিঁট্‌কায়! যেন কেউ ওকে কড্‌লিভার অয়েল খেতে বল্‌ছে! ডেঁপোর মত লম্বা লম্বা কথা বলে, সব বইপড়া-বুলি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। ঝামা মানুষের উপকারী, হাজার বার সে-কথা স্বীকার করি। বাসন-কোসন মাজ, কৃতার্থ হব, কিন্তু আমার পিঠের ওপর যে ঘস্‌বে, সে অসহ্য। ওকে বলেছি—তো'তে যেদিন ফুল ফুট্‌বে, সেদিন তোর কাছে আমি নিজেই আস্‌ব।—ঠিক এই কথাটা তোমাকেও বল্‌তে পার্‌তাম—'

* * * *

'. . .তোমার মা বাবাকে দেখি, আর মনে হয়, ঐ শান্তি-সুখের কোলে পৌঁছবার পথে, তুমি আমার পাষাণ-প্রাচীর! তুমি যদি শুধু কঠিন হ'তে তোমায় আমি খেলা ছলে ভেঙ্গে ফেল্‌তাম। আমারই পায়ের ওপর তুমি পড়্‌তে লুটিয়ে।—কিন্তু তুমি যে অবিশ্বাসী—'

* * * *

'. . . প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ কর্‌ব ভাব্‌ছিলাম। বার ঘণ্টার মধ্যে তিনখানা চিঠি লিখেছি ব'লে হাস্‌লে, আমারই সাম্‌নে ব'সে! তবু প্রতিজ্ঞা যে করি নি, ভালই হয়েছে; কর্‌লে ভাঙ্গতে হ'ত। বিকেলে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম। তুমি বার ঘণ্টায় তিনখানা লেখ নি, তুমি লিখেছ, বার দিনে তিনখানা। সবটুকু পড়েছি। বেশ লাগ্‌ল। বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আস্‌ছিল। তুমিই জগতে একমাত্র সুখী মানুষ।

মনে হচ্ছে, কোন জিনিষ না পেলে তোমার মত বে-পরোয়া ভাবে বল্‌তে পার্‌তাম, 'বয়ে গেল' আমার কোন দুঃখই থাকৃত না। মুখ হয় ত বলে অনেক সময় কিন্তু প্রাণটা তখন যেন আরো কেঁদে ওঠে!

তুমি বোধ হয় কখনও disappointed হও নি?—হ'লেও হয়ত 'বয়ে গেল' ব'লে পার পেয়েছ? থাক্, আজ একজনের disappointment-এর কথা তোমায় শোনাই। জিগ্‌গেস ক'র না কিন্তু সে কে। বল্‌ব না। তুমি তার প্রতি একেবারেই interested নও, এমন একজন মানুষ, তার একজন বন্ধুকে বিশেষভাবে ডেকেছিল। এমন বিপদে পড়েছিল সে, যে তার অবস্থাটাকে কথা দিয়ে ঠিক বোঝান যায় না। তার এই বন্ধুটি তখন যদি তাকে fail করে, তবে সে ডুব্‌বেই, এমন উৎকণ্ঠায় তার সময় কাটছিল। সকাল গেল, দুপুর এল। দুপুর গেল, সন্ধ্যা এল, রাত্রি গভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। ঘড়ির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ছুরির মত তার বুকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল—তবু আশা—যদি আসে—'

এখন বল্‌তে পার, সে এসেছিল কি না? আচ্ছা এমন বিপদের সময় সব জেনে শুনে দূরে সরে থাকৃলে কি প্রমাণ হয়?—কি বল্‌ছ? 'নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াতে পার্‌লে কেউ কা'কেও তুলে ধর্‌তে পারে না।' তার চেয়ে বল্‌লেই ত হয়—'তুমি চ'রে খাও, আমি পার্‌ব না তোমার ঝঞ্ঝাট পোহাতে।'

সময় সময় ভাবি, তুমি কেন সেই অমানুষগুলোর আবির্ভাবের যুগে জন্মালে না! নারী-শরীর থেকে ভোগের

সুরা পরিপূর্ণ মাত্রায় পান ক'রে নিয়ে যারা জগতে প্রচার ক'রে বেড়াত—কা তব কান্তা,' কস্তে পুত্রঃ—তুমি তাদের সকলের গুরু হ'তে পার্তে। কাঞ্চনে তোমার স্পৃহা নেই, কামিনী তুমি স্পর্শ কর নি। পুণ্যের স্কুলে ডবোল প্রমোশন পেতে পেতে এত ওপরে উঠে যেতে, যে মাটিকে আর চোখেই দেখ্তে পেতে না।

রাগ হ'ল ? ঝগড়া কর্‌তে যে ভারি ইচ্ছে কর্‌ছে, কি করি ? আমার একটি বন্ধুর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, দুটোতে যখন বিনিয়ে বিনিয়ে ঝগড়া করে, ভয়ে মরি ! ভাবি, বুঝি সব গেল ! তার পর একটু নিরালা পেলেই দেখি দুটোতে—কিন্তু থাক্ সে কথা।'

* * * *

'. . . কত প্রশ্নই যে কর্‌লাম, কত চিঠিই যে লিখ্‌লাম, তার ঠিক নেই !—কিন্তু না, আমি নালিশ কর্‌ছি না ; মনে একটু অভিমানের মেঘ জমা হ'য়ে উঠেছে মাত্র, একটু কাঁদ্‌লেই আবার বুক হাল্কা হয়ে যাবে।

চিঠি না লিখে তোমায় যদি জব্দ করা যেত তা আমি কর্‌তাম, কিন্তু জানি যে, ওতে তোমার কিছুই আসে যায় না। না লিখ্‌লে আমারই বাঁচা দায়, তোমার খবর পাই না।

সেদিন আস্‌বার সময় ট্রেণে সমস্ত রাত কেঁদেছি, চোখ দুটো ফুলে উঠেছিল। মা জিগ্‌গেস কর্‌লেন, কি হয়েছে ? আমি বল্‌লাম—বালি পড়েছে।—সত্যি শ্রী, তুমি আমার চোখের বালি। তুমি আমার প্রাণ বার ক'রে দিলে !

চাই না তোমার চিঠি। এই ত চার দিন আজ তোমায় দেখি নি, মরে কি গেছি; বেশ আছি। আমি আর ফির্‌ব না এখান থেকে। বেশ জায়গাটা! শুধু মাঠ আর মাঠ! বেশী গাছ-পালা দূরের কথা, বেশী ঘাস-পাতাও নেই। ইচ্ছে করে, পায়ে হেঁটে চলে যাই, মাঠের পারে ঐ নীল পাহাড়ের সীমা-রেখাটির উদ্দেশে।—যাবে আমায় নিয়ে? এসো না—

পুনঃ—দেখ, কল্পনায় মনের মত ছবি আঁকার শক্তি যদি মানুষের না থাক্‌ত, তা হ'লে, আমাদের মত মানুষের বাঁচাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াত! পাই আর না পাই, 'পাব' এই কথাটা কি ক'রে যে বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে তা আমি জানি। তুমি জানবে না, কারণ তুমি ত মানুষ নও—'

কথা শোনার নেশায় শ্রীশের মন তখন মশ্‌গুল্ হইয়া উঠিয়াছে। লোভীর মত সে আপনার গুপ্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত রত্ন, একটি একটি করিয়া দেখিয়া লইতেছে। এমন করিয়া তাহাদের উপর হাত বুলাইতেছে, যেন তাহারা তাহার প্রিয়ার বেদনায় উত্তপ্ত গাল দুটি! পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যায় আর কত পুরাতন অর্থ-ভরা কথার সুর তাহার বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠে।—কিন্তু এবার যাহা শুনিল তাহার সুর স্বতন্ত্র। ইহা আশা-আকাঙ্ক্ষায়-উদ্বেলিত আগমনী-সঙ্গীত নয়; ইহার প্রতি ছত্রে বিসর্জ্জনের কান্না জাগিতেছে!

'. . . আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহে না যে অপমান।' সত্যি সত্যি সইতে পারি না, পার্‌লাম না!

আজ সারাদিন নিজের মনে ঐ কথাটা বলেছি আর কেঁদেছি। বাড়ীর লোকের কাছে ধরা পড়েও এ কান্না আমার থামাতে পারি নি, তাই আমার প্রতি সংশয়ে এঁদের মন ভ'রে উঠেছে।

কি করব? আমি অযোগ্য হতে পারি, তাই ব'লে আমার প্রেমও মিথ্যা হবে! তুমি লিখেছ—'ভালবাসিটা মিথ্যে কথা।' হয় ত তাই হবে, কে জানে? এই মিথ্যার উপাসক তোমার কাছ থেকে আজ চির-বিদায় নিল। এ মিথ্যা দিয়ে তোমার মনে আর গ্লানি আন্‌ব না কোন দিন। এ মিথ্যা রইল আমার নিজের জন্য। আমার এ মিথ্যা রূপও তুমি আর কোন দিন দেখ্‌বে না।

তুমি ছিলে আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, কৈশোরে তুমি হলে আমার বন্ধু। যৌবনে আমি তোমায় ভালবাসলাম। সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্‌লাম তোমার মুখের কাছে, তুমি নিলে না!

ভারি দুঃখ হচ্ছে শ্রীশ। আমি জানি একদিন এই কথা মনে ক'রে তোমার বুক ফেটে যাবে। তোমাকে আঘাত কখনও দিই নি। কিন্তু এবার দেব। তোমার পাথরের চোখ গ'লে জল ঝর্‌বে। ব্যথার রক্তে রাঙ্গা তোমার বুক আমি দেখ্‌ব। আমি খুশী হব। সাধারণ মানুষের মত অপদার্থের মত হিংসার অনুশোচনার আগুনে তোমাকে তিল তিল ক'রে জ্বলে পুড়ে মরতে দেখ্‌ব। আমার সমস্ত বিসর্জ্জন দিলাম, সেই সুখ সেই আনন্দকে বুক ভ'রে মেখে নেবার জন্যে। শান্তিকে চিরদিনের জন্যে তোমার মন

থেকে নেব সরিয়ে ।—তোমাকে জাগাব, তোমাকে কাঁদাব আমারই জন্যে। আমি যে ছিলাম তোমার জীবনে, আমি যে চলে গেলাম তোমার জীবন থেকে, তা তুমি জান্‌বে। আমাকে যে অপমান করেছ, তাকেই ফিরে পাবে তোমার বুকে। প্রতি চিন্তায় তার তীব্র দংশনের জ্বালা অনুভব করবে। অপমানকে তুমি চিন্‌বে! আর তারই সঙ্গে চিন্‌বে তটিনীকে।—সেই হবে আমার তোমায় পাওয়া . . .'

কি আশ্চর্য্য নারী-প্রকৃতি! অমৃত যেন বিষ হইয়া উঠিয়াছে! যে-মুখের কথাকে শ্রীশ একদিন বিশ্বাস করে নাই, তাহাকেই পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে। ঐ ভীষণ ভয়ঙ্কর কথাগুলি যে মৃত্যুতাণ্ডবের আগমনী শুনাইয়া ছিল, তাহাকে সে পাইয়াছে। দিনের পর দিন সর্ব্বনাশী লীলাময়ী-নারীর নিষ্ঠুর চরণাঘাতে তাহার বক্ষের পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! কি কঠিন সে প্রেমের আঘাত!

মনে পড়ে সেই দিনের কথাটি। চিঠির লেখাকে সত্য বলিয়া ভিতরে বাহিরে শ্রীশ যেদিন অনুভব করিল, সেই শেষ চিঠিখানি হাতে লইয়া কম্পিত বক্ষে সেদিন তটিনীর কাছে দাঁড়াইয়াছে।—কিন্তু কোথায় তটিনী? তাহার স্থান অধিকার করিয়া তাহার চোখে মুখে গলার স্বরে সর্ব্বশরীরে যে আসিয়া বসিয়াছে সে কে? কে তাহাকে ব্যঙ্গের স্বরে অভ্যর্থনা করিল।—এই যে শ্রীশবাবু! হঠাৎ পথ ভুলে নাকি?—

তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিলেও সে বলিয়াছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম তোমার কাছে তটিনী।

লীলাভরে শরীর দোলাইয়া তটিনী উত্তর দিয়াছে।—বলুন—

ঠিক এই সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট একজনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়াছে—Propaganda works নাকি শ্রীশ বাবু ?—আজকাল দেখা যায়, একজন মেয়েকে সাম্‌নে রাখ্‌লে আপনাদের কাজের যেন ঢের সুবিধা হয়—' সঙ্গে সঙ্গেই আরো কয়েকটি কণ্ঠের চাপা হাসির শব্দ সে শুনিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া তাহাদের প্রত্যেককেই শ্রীশ দেখিয়াছে।—চিনিয়াছে—তটিনীর মৃত্যু-তাণ্ডবের তাহারা সহচর ! গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া তটিনী আবার বলিয়াছে—বলুন—'

বিমূঢ়ের মত শ্রীশ স্বীকার করিয়াছে—একটা কোন বিশেষ দরকারী কথা তাহাকে সে বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই এখন মনে হইতেছে না !

হাসির স্বরে, কৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-বহ্নির জ্বালা শ্রীশের শরীর-মন ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। গভীর আনন্দে তটিনী তাহা দেখিয়াছে। সে-পৈশাচিক আনন্দের তীব্রতা শ্রীশও অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে নাই ! নির্ব্বোধের মত একান্ত অসহায়ভাবে বসিয়া থাকা ছাড়া, সে আর কি করিতে পারে ? তাহার দিকে না চাহিয়া বা না চাহিবার ভাণ করিয়া তটিনী আর সকলের সহিত তাহার অফুরন্ত কল-হাস্যে ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে ! শ্রীশ দেখিয়াছে ; সমস্ত শুনিয়াছে। নিজেকে তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন আদি যুগের সেই প্রথম মানুষ, যে পাথর লইয়া খেলা করিতে করিতে সহসা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে ! তাহার চারি পার্শ্বে আগুন, সহস্র লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তি নাই ! সেই ভয়ঙ্কর রূপের মায়া-জালে সে বাঁধা।—নিরুপায় !

গোধূলির আলো নিভিতেই, ঘরের কয়েকটি উজ্জ্বল আলো জ্বালা হইয়াছে, সেই সঙ্গেই তটিনী তাহাকে বলিয়াছে—ভারি বিশ্রী একটা gloomy-ভাব আপনি ঘরে এনে ফেলেছেন শ্রীশবাবু! কোথাও প্রেমে টেমে পড়েছেন নাকি?—বলুন না, একটু ঘটকালি করি—'।

যন্ত্র-চালিতের মত শ্রীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বহু কণ্ঠের প্রশ্ন হইয়াছে—চল্‌লেন?—বসুন না আর একটু—'

জীবনে প্রথম সেই দিন পরিপূর্ণভাবে তাহার দুই চক্ষু মেলিয়া শ্রীশ বাহিরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারকে প্রথম জীবন দিয়া অনুভব করিল।

তাহার পর তটিনীকে ফিরাইবার তাহার সে কি বিপুল আগ্রহ! কিন্তু কোথায় তটিনী?—তাহার সন্ধান মিলিল না! কিন্তু দিনে দিনে তাহারই জন্য আহরণ করা, একান্ত যত্নের সহিত সৃষ্টি করা অপমানের কালি আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল তাহার ললাটে, যাহার দাগ কিছু দিয়াই সে তুলিতে পারিল না।

পারিল না কিন্তু দূরে সরিয়াও গেল না। সে রহিল ঐ মরণ-পথ-যাত্রিনীর অতি নিকটে, যেখান হইতে তটিনীর দেওয়া আঘাতগুলি সবার অলক্ষ্যে অতি সহজে সে পাইতে পারে, এমন স্থান, সময়, সুযোগ সে খুঁজিয়া বাহির করিত! একান্ত নিষ্ঠার সহিত ঐ বেদনাকে সে আপনার বক্ষে ধারণ করিত। তটিনীর বক্রগতি-রেখার অনুসরণ করিয়া অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন সে চলিত। বাহিরের কেহ তাহার খবর রাখিত না। কিন্তু কোথাও কেহ প্রেমের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে দেখিলে সে আর স্থির থাকিতে পারিত না। একেবারে বুক দিয়া গিয়া পড়িত। অবিশ্বাস করিয়া যে দুঃখ সে পাইয়াছে তাহা কাহাকেও পাইতে দেখিতে যেন সে পারিবে না।

নারীর প্রতি বিদ্বেষভরা স্বপ্রকাশের মনের সহিত সে দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়াছে! যুক্তি তর্কে হারিয়াও সংগ্রাম তাঁহার থামাইতে পারে নাই! তাহার পর শান্তার পার্শ্বে নূতন স্বপ্রকাশকে সে যেদিন প্রকাশিত হইতে দেখিল, সেদিন তাহার কি আনন্দ! শান্তা ছিল তাহার জীবন-মরুর বুকে শান্তির উৎস কিন্তু আপনার সুখ-স্বার্থের তৃষ্ণা মিটাইবার উপায়স্বরূপ যাহাকে সে ব্যবহার করিতে পারে নাই। বারে বারে তাহার স্নেহ-করুণ হাত, আপনার উত্তপ্ত ললাট হইতে একান্ত শ্রদ্ধার সহিত সরাইয়া রাখিয়াছে। শান্তাকে স্বপ্রকাশের হাতে তুলিয়া দিয়া নূতন করিয়া আশ্রয়হীনের দুঃখকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ তাহারা সুখী। শ্রীশের বুকও তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।

কোলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিঠিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটি কাগজের উপর তাহার চোখ পড়িল। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তৃষিত অন্তরে নারীত্বকে প্রথম উপলব্ধি করিয়া তটিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে :—

'কেউ জানে না! আমি তোমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখ্‌ছি। সবাই শুনলে রাগ কর্‌বে। তুমিও বক্‌বে জানি, তবু না লিখে পার্‌ছি না! কত রাত হয়েছে কে জানে! কিছুতে ঘুমোতে পার্‌ছি না! তুমি এখন একবার আমার কাছে আস্‌তে পার না? এস-না লক্ষ্মীটি। তা হ'লে কি মজাই না হয়!—প্রথমে আমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌বে, তারপর বাবা বল্‌বেন—কে-অ?—আর আমি বল্‌ব—চোর। আমার মন চুরি কর্‌তে এসেছে!

সাহস হয়? হয় না? ভীরু!—এই শোন, তুমি আমার গল্প-লেখার খাতা নিয়ে পালিয়েছ কেন? চোর! পত্র পাঠ ফিরিয়ে দিয়ে যাও। নইলে আমার দুঃখ হ'বে, আমি কাঁদ্‌ব। ঝর্ ঝর্ ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌বে তুমি না এলে।'

সুখের ভারে শ্রীশের মন ভরিয়া উঠিল। টেবিলের উপর ছড়ান লেখার রাশির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখের পাতা অবসাদে মুদিয়া আসিতেছে, এমন সময় তাহার কপালের উপর কাহার হাতের স্পর্শ পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল! মাথা তুলিয়া দেখিল—মা!

দুষ্ট ছেলে, অপাঠ্য নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিবার সময়, সম্মুখে গুরুজন দেখিলে যেমন করিয়া তাহার উপর পাঠ্য পুস্তক চাপা দেয়, তেমনি করিয়া ঐ ছড়ান চিঠিগুলির উপর তাড়াতাড়ি কতকগুলি বই খাতা চাপা দিতে গিয়া চোরাই মালগুলিকে করুণার আরো চোখের কাছে আনিয়া দিল! শেষে, নিজের এই অকৃতকার্যের হাস্যকর ছবির কথা মনে করিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

সদ্য অপরাধী অবোধ শিশুকে হাতে হাতে ধরিয়া মা যেমন করিয়া শাস্তি দিতে লইয়া যায় তেমনি করিয়া শ্রীশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া করুণা বকিয়া উঠিলেন—হতভাগা ছেলে, আমাদের একেবারে শেষ ক'রে তবে ছাড়্‌বে! উনি কিছু বলেন না, আমিও কোন কথা কই নি। কিন্তু তোর কি চোখ নেই? একেবারে কসাই হয়েছিস্!

করুণা বকিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতখানি রহিল শ্রীশের কপালে! শ্রীশের মন হইতে সমস্ত অবসাদ যেন মুছিয়া লইল! হাসিয়া বলিল—তুমি বকৃতে জান না মা। মাসীমার কাছে শিখে এস।

করুণা বলিলেন—আচ্ছা, আর পাকামো করতে হবে না, ঘুমো। আমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আসি।

শ্রীশ। আবার আসি কেন? শোও গে'। আমি ত শুয়েছি!

করুণা। আমি তোর কাছেই শোব।

আলো নিভিয়া গেল এবং পরক্ষণেই শ্রীশ, মাকে পাইল তাহার কাছে। গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—একটু সকাল-সকাল তুলে দিও মা; এক জায়গায় যেতে হবে।

করুণা বলিলেন—সকালের আর বাকী কি? এত যদি তাড়া থাকে তা হ'লে এখুনি যা না?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তাড়া আছে, তবে এত সকালে নয়।

গত সন্ধ্যায় তটিনীকে শ্রীশ কথা দিয়াছিল, সে সকালেই আসিবে। কিন্তু যখন আসিল তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। ফটকে ঢুকিতেই দেখিল, দেওয়ালের গায়ে-লাগান সাদা এবং লাল এন্টিগোনামের ফুলসুদ্ধ ডাল ধরিয়া তটিনী টানাটানি করিতেছে! তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে তটিনী বলিল—শ্রীশ, দাও না একটা ভাল দেখে ডাল ছিঁড়ে—'

তটিনীর গলার স্বরে গত সন্ধ্যার কোন আবেগ বা উৎকণ্ঠার আভাস পাওয়া গেল না। শ্রীশ ফুল পাড়িয়া দিল, তটিনী হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—চল ওপরে।

ঘরে আসিয়া ফুলগুলি একটি ফুলদানিতে রাখিয়া তটিনী বলিল—আমি এখনও চা খাই নি। তোমার সঙ্গে খাব ব'লে অপেক্ষা করছিলাম।

শ্রীশ। আমি সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে ব'সে ব'সে তোমার চিঠিগুলো পড়ছিলাম এমন সময় মা এসে জোর ক'রে আমায় বিছানায় শুইয়ে নিজে পাশে শুলেন।

তটিনী। আমারও প্রায় সেই দশা! তবে আমার পড়বার কিছুই ছিল না। মাও ছিলেন না আমার পাশে। শুধুই একটা চেয়ারে ব'সে রাত কাটিয়ে ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছি!—জীবনবাবু যখন ওপরে যাচ্ছিলেন তখন জাগলাম।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে শ্রীশ বলিল—জীবন?—

তটিনী। হাঁ, তিনি সুধার কাছে আছেন। নাববেন হয় ত একটু পরেই।

শ্রীশ। সুধার কাছে?—

তটিনী। অত অস্থির হয়ো না। সব বলব আজ তোমাকে।

এই সময় তটিনীর মাদ্রাজী আয়া, চায়ের ট্রে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তটিনী জিজ্ঞাসা করিল—উপরে দিদিমণির কাছে চা পাঠান হইয়াছে কি না?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষা মাদ্রাজী সুরে বাঁধিয়া আয়া বলিল—They fin-nis long ago, onny shab; he sleep-pin' with towel-full of ice-e on his head-e—He drinked lot last night-e—'

অতি দুঃসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু হাসি থামে কি করিয়া? কোন মতে সংযত হইয়া তটিনী আয়াকে বলিল—এখন যাও, দরকার হ'লে ডাকব।

তটিনী চায়ের কাপে চিনি দিয়া তাহাতে ঢালিতেছে। শ্রীশ তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আছে। তটিনী বলিল—এ বাড়ীটার কিছু নতুন নতুন লাগ্ছে না তোমার ?

শ্রীশ। সমস্ত! এত খদ্দরের আমদানী হ'ল এখানে কি ক'রে ? ও পর্দ্দাগুলো আগে বিলিতি কাপড়ের ছিল।

তটিনী। ও সব তোমার কারখানায় তৈরী।

শ্রীশ। আমার কারখানায় ?

তটিনী। হাঁ, শুধু আমি রং করিয়ে নিয়েছি। আমার কাপড় জামা এও'সব তোমার তৈরী। তুমি জেলে যাবার পর থেকেই এ-গুলো ব্যবহার কর্‌ছি। তবে বাইরে আমার এতদিন সিল্ক্ ছিল। কয়েকদিন হ'ল তাও বন্ধ করেছি।

কথা বলিতে বলিতে চায়ের কাপ্ শ্রীশের দিকে বাড়াইয়া দিয়া তটিনী বলিল—আমি তোমাকে ডেকেছি আমার নিজের কোন বিপদের ভয়ে নয়, তোমার বন্ধু জীবনের জন্যে। ও এমন একটা কাজ কর্‌তে যাচ্ছে, যার জন্যে হয় ত ওকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হবে।

শ্রীশ ব্যাকুলভাবে বলিল—আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছি না তটিনী, একটু তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল কথাটা—

তটিনী হাসিয়া বলিল—তোমার অনেকখানি বদল হয়েছে শ্রীশ, তুমি এখন সাধারণ মানুষের মত কথায় কথায় উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে ফেল!—বল্‌ছি, কিন্তু এই সঙ্গে অন্য কথাও যে কিছু তোমায় শুন্‌তে হবে। নইলে কিছুতেই পরিষ্কার হবে না ব্যাপারটা।

কথাগুলি বলিয়া অন্যমনস্কভাবে সে খানিকটা গরম চা খাইয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—এখুনি পোড়ারমুখী হয়েছিলাম আর কি!

শ্রীশ হাসিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ ধরিয়া চায়ের কাপে চামচটি নাড়িতে নাড়িতে মাথা তুলিয়া তটিনী বলিল—আমার শেষ চিঠির কথা তোমার মনে আছে শ্রীশ ?—

শ্রীশ বলিল—আছে।

তটিনী। সব কথা ?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার।

তটিনীও হাসিয়া উত্তর দিল—বেশ, বল, বিশেষ ক'রে আমি তোমাকে এমন কোন কথা বলেছি, যার ভিতর দিয়ে আমার একটি মাত্র, আর সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার আভাস প্রকাশ পেয়েছ ?

শ্রীশ। 'শান্তিকে নেবো চিরদিনের মত তোমার বুক থেকে সরিয়ে'।—তুমি নিয়েছ, এ কথা আজ অকপটে তোমার কাছে স্বীকার কর্‌লাম। তুমি জয়ী।

আরক্তমুখে তটিনী বলিল—এবার আমার গল্প আরম্ভ করি।—ঐ ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সব দিক দিয়ে সমস্ত রকমের আঘাত দিয়েও তোমাকে হার মানাতে পারি নি, কারণ দুঃখ অপমানকে তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলে নিতে! ঐ আঘাত দেওয়ার মধ্যে আমিই শুধু দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি হ'য়ে উঠ্‌ছিলে বড়।—অমলকে দীপ্তির কাছ থেকে আমিই সরিয়ে নিয়েছিলাম শ্রীশ—

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে শ্রীশ বলিল—তুমি ?—

তটিনী। হাঁ সমস্তের মূলেই আমি, কিন্তু তোমরা জান মিসেস্ ডি—'

শ্রীশ আবার বলিল—তুমি!—

তটিনী অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—হাঁ শ্রীশ, আমি। মিসেস্ ডি—' আমার একটা মুখোস মাত্র। ঐ নির্ব্বোধ অপদার্থ মানুষটাকে আমি তোমার শান্তি-হরণের একটা যন্ত্রের মত এত দিন ব্যবহার ক'রে এসেছি।

শ্রীশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তটিনী বলিতে লাগিল—সুধা আমার সেজ-মাসীর মেয়ে সে ত জানই; ও যখন বিলেত গেল, সেই সময় অমলকে লিখি—ও যদি সুধাকে বিয়ে করে, তাহ'লে আমার কাসিয়ংএর বাড়ী, আর নগদ কিছু টাকাও যৌতুকস্বরূপ সে পাবে—আর বিশেষ কিছুই আমায় ভাবতে হয় নি। সুধা অমলকে ভালবাস্ত কি না জানি না কিন্তু ওর সুন্দর মুখের ওপর একটা টান ছিল, কিন্তু অমল গরীবের ছেলে ব'লে, আমার মেসো রাজী ছিলেন না। আমার এই যৌতুকে, ওদের অনেকখানি মেঘ কেটে গিয়ে সেটা এসে পড়্ল তোমাদের ভাগে।

—অমলকে সরালাম কিন্তু বিকাশ এল দীপ্তির পাশে! তোমরাও আবার সুখী হয়ে উঠ্লে। কিন্তু দীপ্তি হ'ল এবার আমার সহায়, সে বিকাশকে বুঝ্তে পারল না! আমি খুশী হয়ে উঠ্লাম। কিন্তু বেশী দিন সে খুশী আমার রইল না। অসিত এসে দীপ্তির সে ভুল শুধ্রে নিল।—কিন্তু আমি সহ্য করি কি ক'রে? অমলকে আবার পাঠালাম দীপ্তির কাছে, সেই সঙ্গে মিসেস্ ডি—'কেও দিলাম টিপে। কিন্তু কিছু হ'ল না। মুখ কালো ক'রে অমল ফিরে এল!—

—এবার কি জানি কেন এই দারুণ পরাজয়ে আমি নিজে খুশী না হয়ে থাকৃতে পার্লাম না; সে-খুশী আমি অমলের কাছেও প্রকাশ কর্লাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখ্লাম আমার নিজের জালে আমি নিজে বাঁধা!

'কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তটিনী বলিল—আমি যেন এখুনি ম'রে যাব, তাই তোমার কাছে আমার সব কথা ব'লে নিচ্ছি; না শ্রীশ?—

শ্রীশ শুধু বলিল—বল।

এক নিশ্বাসে শেষ চা-টুকু খাইয়া মুখ মুছিয়া তটিনী বলিল—সুধা আমার কাছে কেঁদে পড়্ল—ও কেন এখনও দীপ্তির কাছে য... লোকে যে অনেক কথা বল্‌ছে—'

আমি বল্‌লাম—আমি চাই না সুধা, ঐ জানোয়ারটার হা... তোকে তুলে দিই।

সুধা আমার ওপর ক্ষেপে উঠ্‌ল! আমি বুঝ্‌লাম ও অনেক দূরে গেছে।—কিন্তু কত দূরে যে, তা তখন জানতাম না। তাই নির্ব্বোধের মত সবার সামনেই এক দিন অমলের কথা ব'লে ফেল্‌লাম। তার পরেই জীবনে যত দুঃখ আঘাত মানুষকে দিয়েছি তা ফিরে এল আমার বুকে—অমল সুধার কাছ থেকে স'রে দাঁড়াল।—বিয়ের দিন এক রকম ঠিক হয়েই ছিল।

সুধা আবার আমার কাছে এসে কেঁদে পড়্‌ল—এ কি হ'ল!—

আমি বল্‌লাম—ভাল হ'ল।

ও বল্‌ল—না-না! সে হ'তে পারে না—'

তার কান্না কিছু দিয়েই থামাতে পারি নি! তার সে ভীত চাউনি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—'হ'তে পারে না—হ'তে পারে না', এ কান্না আমার কানে আজও লেগে আছে! সে যেন দীপ্তিরই কান্না! একবার সয়েছি, তাতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে, দু'বার কি পারি? নিজেই গেলাম অমলের কাছে।—বল্‌লাম, দেখ, তোমরা অনেক দিন engaged ছিলে, এর পর বিয়ে ভাঙ্গা

ঠিক নয়। তুমি পুরুষ, তোমার কোন দোষই কেউ দেখ্‌বে না, ভুষ্‌বে ওকে।

অমল কোন উত্তর দিল না।

তার হাত ধ'রে বল্‌লাম—আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমায় লিখে দিচ্ছি—'

সে উত্তর দিল—হিন্দু সমাজের এক ব্রাহ্মভাবাপন্ন জমীদারের এক মাত্র মেয়ের সঙ্গে তার কাকা বিয়ের ঠিক কর্‌ছেন। দিনও ঠিক হ'য়ে গেছে।

আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল, সুধার বলা কথাটি। মনে হ'ল বলি,—কিন্তু কিছুতেই তা পার্‌লাম না।

সে কি অশান্তির ভিতর দিয়ে আমাদের দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল! সুধাকে আমি নিজের কাছে নিয়ে এলাম। এই সময় সুধার খুব একদিন জ্বর হ'ল। আমি যে ডাক্তারকে ডাক্‌লাম, ছোটবেলায় সে আমাদের বাড়ী আস্‌ত। তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে, জীবন-বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডাঃ দত্তের এসিস্‌টাণ্ট—তপন সাহা।

তিন দিন সব দিক দিয়ে ভেবে আমি ঠিক কর্‌লাম—সুধার ও ছেলেকে পৃথিবীতে আস্‌বার আগেই সরাতে হবে।

তপন বল্‌ল—আমার দ্বারা হ'বে না। তা হ'লে ও ভারটা ডাঃ দত্তকেই দেবেন।

পাশের ঘর থেকে সুধা আমার কথা শুন্‌তে পেয়ে আর তপনের ঐ সহানুভূতির সুরে সাহস পেয়ে, আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আমি ভুল করি নি, দোষও করি নি, তবে নির্দ্দোষী আমার ছেলেই তার শাস্তি পাবে কেন?—ও আসুক, আমার সব অপমান সহ্য হবে।

তপন আমার দিকে ফিরে বল্‌ল—'মিসেস্‌ দত্ত, সুধাকে কয়েক দিন আপনার হাতেই আমি রাখ্‌ছি, যে পর্য্যন্ত না আমি ওর ভার নিতে পারি। —আপনি ওর জন্যে দায়ী।'—আমি সুধাকে আমার বুকে টেনে নিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা তোমার বন্ধু জীবন এল আমার কাছে।—বল্‌ল—তপন আমায় পাঠিয়েছে, সুধাকে আমি নিয়ে যাব আমার মার কাছে।

আমার তখন সব বিষয় বিবেচনা কর্‌বার শক্তি হারিয়েছে; বল্‌লাম—আপনার স্পর্দ্ধা কম নয়!

সে হেসে বল্‌ল—খুব বেশী মিসেস্‌ দত্ত। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি তাকে নিজেই খুঁজে নিচ্ছি।—

খুঁজে নিল।

তার পর সুধার ঘরে এসে দেখি, জীবন তার পাশে ব'সে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে!

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর এই দু'বার আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, কিন্তু দু'বারই সুধার জন্যে।

তার পর হ'ল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুজনের সে কি ভীষণ সংগ্রাম! সুধা হার মান্‌বে না, জীবন হার মানাবে। দুজনেরই জীবন-পণ!

সুধা বল্‌ল—হ'তে পারে না।—আমি পার্‌ব না।

জীবন বল্‌ল—তবে যাকে আন্‌তে চাও তাকে আন্‌বার তোমার অধিকারও নেই।

—কেন?

—সভ্যজগতে শুধু মার পরিচয়ে তার সন্তান বাঁচ্‌তে পারে না; মার পরিচয়ের কোন মূল্যও নেই।—দু-একটা দেশে ছাড়া, কিন্তু তুমি তাদের কেউ নও সুধা।

—আমার দেশে আমাকে দিয়ে তার সূত্রপাত হোক্।

—সূত্রপাত তোমাকে দিয়ে হ'তে পারে না, সে হ'বে তোমার সন্তানেরই ওপর দিয়ে। তোমার ভুলের জন্যে তোমাকে দুষে' মানুষ মন হাল্কা করবে, তোমাকে বল্‌বে জঞ্জাল, কিন্তু তোমার সন্তানকে করবে পরিত্যাগ।—নিরপরাধী অকলঙ্ক জীবনটির জীবন্ত-সমাধির ব্যবস্থা ক'রে দেবে তুমিই। তুমি একা তাকে বাঁচাতে পার না সুধা, কিন্তু আমি পারি, খুব সহজে পারি।

সুধা আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি জীবনকে বল্‌লাম—তুমি মানুষ ?—

সুধার চোখের জল মুছিয়ে জীবন হেসে বল্‌ল—ঐ ত ভুল বুঝ্‌লেন মিসেস্ দত্ত! দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, এর মধ্যে আমার একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ রয়েছে।

আমি বল্‌লাম—স্বার্থ, কিসের ?

সে বল্‌ল—সুধাকে পেলে, আমি আমার মাকে ফিরে পাব।—আমিও একজন জন্ম-অপরাধী। আমি ভীষণ এক অত্যাচারীর সন্তান। আমার মার মনে আমার জন্ম-দাতার প্রতি যে দারুণ ঘৃণা ছিল, তার সবটুকু ঢেলেছিলেন তিনি আমার ওপর। আমার মা আমায় কোন দিন কোলে নেন নি। আমায় ছুঁতে হ'লে অশুচি মনে করতেন। মানুষ হয়েছি ঝি-চাকরের কোলে। আমার মার সব চেয়ে রাগ আর দুঃখ, আমি আমার বাবার মত দেখ্‌তে। তাই তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। কিন্তু যে অসীম স্নেহ, বাইরের মানুষ তাঁর কাছ থেকে পায়, তাইতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম এত দিন, এবার লোভ হ'য়েছে সে সবটুকু আমি একা ভোগ করব। যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি আমায় পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী অসহায়

সুধাকে আমি নিয়েছি জান্‌লে তিনি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। আমি অত্যাচারীর সন্তান, কিন্তু অত্যাচারী নই, এ কথা প্রমাণ কর্‌বার তুমি আমার একমাত্র সুযোগ সুধা।

সুধা ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে বল্‌ল—নাও, বাঁচাও।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চোখ বন্ধ করিয়া ক্লান্তভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তটিনী ধীরে ধীরে বলিল—আমার কথা শেষ হয়েছে শ্রীশ, আর ত কিছুই বল্‌বার নেই।

শ্রীশ বলিল—আছে। তোমার নিজের কথা, সেটা না শুনে ত আমি যেতে পারি না।

তটিনী ক্লান্তভাবে বলিতে লাগিল—আমার কথা? তার মধ্যে শোন্‌বার মত কিছুই নেই শ্রীশ।—জীবনকে কুৎসিত কর্‌তে চেয়েছি, পারি নি। সে আপনার সত্য-সুন্দর রূপের মহিমায় অম্লানই রয়েছে। যত কালি ছড়িয়েছি, তা সমস্ত এসে জমা হয়েছে আমারই বুকে। আমিই কুৎসিত রয়ে গেলাম। এই কথা এখন বিশেষ ক'রে মনে পড়্‌ছে, আর মনে পড়্‌ছে, আমার জীবনও ছিল অমনি সুন্দর। সামান্য একটা প্রত্যাখ্যানের অভিমানকে অসহ্য মনে ক'রে, তোমাকে দিতে গেলাম আঘাত, শুধু তোমাকে, কিন্তু দেখ্‌লাম, জীবনের প্রত্যেকটি-গ্রন্থীতে তার সাড়া জেগেছে! জীবনকে আঘাত দেওয়া যায় কিন্তু তার গতিকে থামান যায় না। প্রাণের বন্যা সে সমানে বইয়ে চলে। সবখানে তার সরসতা। প্রকৃতির সমস্ত অত্যাচার মাথায় নিয়ে সে তার স্নেহের কোল বিছিয়ে বসে থাকে। নিজের অজ্ঞানতা, হিংসার ছুরিতে দিনের পর দিন শাণ্‌ দিয়েছি, আর ভেবেছি, এর একটি আঘাতে প্রাণের রক্তরাগ হয়ে উঠ্‌বে জমাট নীল!—কিন্তু কোথায় ছিল জীবন, কোথা

থেকে এল অসিত, প্রাণের দীপ্তিতে সবার বুক তৃপ্তি-সুধায় ভ'রে দিল।
—আমার মত কুৎসিত তুমি আর কা'কেও দেখেছ শ্রীশ ?—

শ্রীশ। না।—ভালবাসা-বাসি খেলায় তুমি আমার সব চেয়ে বিস্ময়কর-আবিষ্কার তটিনী !—এবার বল তোমার নিজের কথা।

তটিনী চোখের জল মুছিয়া বলিল—আমার নিজের কোন কথাই নেই ; যা করেছি বা করতে চেয়েছি তা তোমাকে আমার মনের মধ্যে রেখে—তোমারই জন্যে। বিয়ে করেছি তাকেই, যে আমার চেয়েও কুৎসিত, কারণ তুমি ছিলে আমার চোখে সব চেয়ে সুন্দর। তুমি দেখ্‌বে আমাকে ওর পাশে, এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, কিন্তু কোন দিন স্ত্রী হ'তে পার্‌লাম না। এতে আমার স্বামীর অবশ্য কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। স্ত্রীর দৈন্য ওর নেই।—ছিল নাও কোন দিন। কত অসহায় নারী, কত বিধবা তাদের আত্মীয়ের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নাবালক সন্তানের পৈতৃক সম্পত্তিটুকু বজায় রাখ্‌বার জন্যে ওর আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি ও রক্ষা করেছে, কিন্তু কতটুকু ওদের জন্যে তা জানি না, কিন্তু 'ইয়াং'কে যে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি তা জানি।

কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া শ্রীশের মুখে একটা কোন দৃঢ়-সঙ্কল্পের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়া, তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া তটিনী ডাকিল—শ্রীশ—শ্রীশ, না, ও নয় ; ও হ'তে পারে না। আমি জানি এই মাত্র তুমি কি ভাব্‌ছিলে। কোন দরকার নেই তার। আমি খেলেছি মরণ-খেলা আমার জীবন নিয়ে, তুমি বেঁচে উঠেছ কিন্তু আমি ম'রে গেছি। আমায় বাঁচাতে পার্‌বে না।

শ্রীশ যেন চেতনা ফিরিয়া পাইয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তটিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সেই মুহূর্ত্তেই তটিনীর

বুকের ভিতর তাহার প্রাণ যেন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আমি মরি নি—মরি নি—আমি বেঁচে আছি, ঐ হাসিটুকু দেখ্‌বার জন্যে, তোমার চোখের ঐ অশ্রুকণা আমার সব কালি ধুয়ে দিয়েছে—

সেই সময় আরক্ত চোখে জীবন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—ওমা তুমি এখানে! আরে! তুমি এখানে আস জান্‌লে আমার পথটাও যে অনেকটা সোজা হ'ত!

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—না জেনে ভালই হয়েছে জীবন, তোমার নিজের পথ বজায় রইল

শ্রীশের একখানি হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া, নীরবে তাহার মনের তৃপ্তি, প্রাণের আনন্দ জানাইয়া, তটিনীর দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—ও এইমাত্র ঘুমাল, জ্বরও নেই।—তবু ওকে এখন ছেড়ে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না! আমাকে যদি চারটি খেতে দেন তা হ'লে থেকে যাই সমস্ত দিন।

তটিনী হাসিয়া বলিল—না, পাবেন না খেতে; প্রেমিক মানুষের আবার ক্ষিদে কি? ছি ছি লজ্জার কথা।—যান্ ওপরে। জেগে উঠে ও আবার হয় ত চোখে অন্ধকার দেখ্‌বে!

জীবন হাসিয়া বলিল—ও চোখে অন্ধকার দেখে কি না জানি না, তবে বড় পচা চোখ, খালি জল পড়ে, মুছিয়ে দিতে হয়!—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, দুদিন আগে মায়া দেবীকে আমার একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তা এপর্য্যন্ত হ'য়ে ওঠে নি। এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছে করে না! যেটুকু সময় পাই, তার চেয়ে বেশী এখানে থাকি। শ্রীশ, তুমি যদি একটা চিঠি তার কাছে পৌঁছে দাও, বিশেষ উপকৃত হব।

শ্রীশ বলিল—বক্‌শিস—

জীবন। ছুঁয়ে মিলে গা।

সে একখানি কাগজে লিখিল, 'আমার বৌ খুঁজে পেয়েছি মায়াদেবী। আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।'

চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া শ্রীশের হাতে দিয়া, তটিনীর দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—এবার ওপরে যাই?

তটিনী। এত তাড়া?

জীবন চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—সুবিধে হ'লে এর আগেই পালাতাম।

জীবন চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া তটিনী বলিল—আমি এখন থেকে কার্সিয়ং-এর বাড়ীতে থাকব, বেশীর ভাগ সময়। তোমার ওপর দু-একটা কাজের ভার আমি দিয়ে যাব।—নিজেকে সমস্ত অসুবিধের হাত থেকে বাঁচিয়ে সহজভাবে বেঁচে থাক্‌বার মত টাকা আমি নিয়েছি, বেশীর ভাগটা দিয়ে যাব তোমার হাতে। তুমি মানুষ কর্‌বে, সহায় সম্বলহীন সন্তানদের। মনে রেখো তারা আমারই সন্তান। অবাধ্য দেখ্‌লে, নীচ প্রকৃতি দেখ্‌লে, তাদের শাস্তি দিও। মানুষকে মানুষ হবার পথ দেখিও। আমি তাদের দেখ্‌ব না কোন দিন, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কথা আমায় জানিও; আর জানিও তাদের মা একজন আছে, যে তাদের ভালবাস্‌তে শিখ্‌ছে।—বল পার্‌বে?—

শ্রীশ বলিল—পার্‌ব।

তটিনী একটু ভাবিয়া আবার বলিল—আর একটা কাজ আছে। যেখানে যা ভাল বই পাবে, কিনে পড়্‌বে, মনের মত কথায় দাগ দিয়ে দিয়ে। তারপর আমায় পাঠাবে।

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা।

তটিনী বলিল—আমার গয়নাগুলো সব পাবে দীপ্তি, এ বাড়ীখানা দিলাম সুধাকে।

শ্রীশ। তোমার স্বামী—

তটিনী। তার জন্যে আমার ভাব্‌বার দর্‌কার নেই, কারণ ও আমাকে বিয়ে করেছিল, আমার জন্যে নয়—আমার সম্পত্তির জন্যে। সমাজের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে ও আজও দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওর স্ত্রী ব'লেই। আমি আজ যে স'রে দাঁড়ালাম এটা ও সহ্য কর্‌বে না। ও কি কর্‌বে তাও জানি। আমার মুখে কালি ছিটিয়ে সবার সাম্‌নে ও বল্‌বে—'আমি অপমানিত—আমি নির্দ্দোষী—' তারপর এই অপমানিতের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্যে ব্যাকুল নারী-হৃদয়ের অভাব হবে না শ্রীশ।—এই মাসের মধ্যেই সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেল্‌তে চাই, তোমাকে রোজ একটু কষ্ট ক'রে আস্‌তে হবে।

শ্রীশ বলিল—আস্‌ব।

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা মায়াকে তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইতে দেখিয়া তটিনী হাসিয়া বলিল—কি-লো ঝামা! আয় আয়, আমি পিঠ পেতে দিয়েছি, যত পারিস্‌ ঘস্‌। আর আপত্তি কর্‌ব না।

মায়া তাহার কাছে আসিল, কোন কথা না বলিয়া তটিনীর গলা জড়াইয়া অশ্রু-ছলছল্‌ চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা দুইজন দুই জনের কাঁধে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল। প্রথমে সংযত হইল তটিনী। মায়ার চোখ মুছাইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল—ফুল ফুটেছে দেখ্‌ছি!—খবর পেলে আমি নিজেই যেতাম।

মায়া বলিল—গেলি না, তাই নিজেই দেখাতে এলাম, আর কি করি ?—কেমন দেখাচ্ছে এবার আমাকে ?—

তটিনী বলিল—রাণীর মত।

মায়া। রাণী ?—

তটিনী। হাঁ—বুক যার ভ'রে ওঠে, সেই রাণী। ভিখারিণীও রাণী হ'তে পারে।—মৌমাছিটি কে ?

মায়া হাসিয়া বলিল—কি ক'রে বলি ? একটা ত নয়!

তটিনী। তোকে দেখে আবার সকলকে ফিরে পাব মনে হচ্ছে মায়া।

মায়া। পাবি মানে ? তুই একবার ডাক, সবাই এসে জুটবে।

তটিনী ম্লান হাসিয়া বলিল—না। জোটা-জুটির পালা আমার শেষ হয়েছে, তবে যাবার আগে সবাইকে একবার চোখ ভ'রে দেখে যাব। তুই কি করবি ?

মায়া। আমি ? যে দুটো জিনিসের ওপর আমার সব চেয়ে রাগ ছিল, তার প্রথমটা।—বিয়ে করব।

তটিনী। পারবি না।

মায়া। পারব না ?—বলিস্ কি! তোরা সবাই পারলি আর আমার বেলায় দুঃসাধ্য ঠেকবে ?—উনি, ঠাকুর-পো, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, মটরকার, বড়মানুষী, দেমাক, পরচর্চ্চা, এত সব জিনিষ পাব হাতের কাছে, তবু বলিস্ পারব না!

তটিনী। না।

মায়া হতাশাভরা কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া বলিল—তা হ'লে দ্বিতীয়টা করি ? স্কুল-মাষ্টারী, কি বলিস্ ?

তটিনী। মন্দের ভাল। কিন্তু ওটাও ছেঁটে ফেলতে পারিস্ না না থেকে ?

মায়া। না। ছেলে মেয়ে না হ'লে বাঁচ্‌ব কি ক'রে? Eternal feminine তটি, মা আমাদের হ'তেই হবে। নিজের না হোক পরের ছেলের। এখন একবার সুধার কাছে নিয়ে চ।

তটিনী। তুই যা ওপরে, জীবন সেখানে আছে, আমি আর নড়্‌তে পার্‌ছি না।

মায়া বলিল—নড়িস্ নি আমি এখুনি আস্‌ছি।

তটিনী বলিল—আয়।

উপরের খোলা ছাদে সুধা আর জীবন বসিয়া গল্প করিতেছিল, মায়াকে দেখিয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল। সুধার কাছে আসিয়া আপনার কণ্ঠের একটি হার তাহার কণ্ঠে পরাইয়া মুখ চুম্বন করিয়া জীবনের দিকে ফিরিয়া মায়া বলিল—আজ ভয়ানক সুখী হয়েছি। এত আনন্দ জীবনে পাই নি। এবার আমায় আপনার 'বাঙ্গাল দেশ' দেখান, যাকে 'ভিনিস্' ব'লে আমায় একদিন লোভ দেখিয়েছিলেন?

জীবন। একটু ভুল হ'ল মায়াদেবী, শুধু আপনাকে নয়, আপনাদের সকলকে। আমার মাকে তার আয়োজন কর্‌তে লিখেছিলেম, আজ চিঠি পেয়েছি, তিনি নিজেই আস্‌ছেন আপনাদের নিতে।

* * * *

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুধা এবং জীবনের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবের কোন আয়োজন বা আড়ম্বর রহিল না! অল্প কয়েকটি বিশিষ্ট মানুষ তাহা দেখিয়াছিল মাত্র। যাহারা দেখিতে পায় নাই, নিমন্ত্রিত হয় নাই, তাহারা এই বিষয় লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা

করিয়া কাটাইল কিন্তু কারণ কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। মিসেস ডি—' নিজেই তটিনীর নাগাল পান না, খবর মানুষ পায় কি প্রকারে?

তটিনী, তাহার যাহা কিছু করণীয় তাহা অত্যন্ত সতর্কতা এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সারিয়া একদিন সকালে শ্রীশের সহিত যে পরামর্শ করিল, সেই দিন গোধূলি-লগ্নে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা গেল। দার্জ্জিলিং-যাত্রী গাড়ীর একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় তটিনী বসিয়া, এবং শ্রীশ তাহার জানালায় হাত রাখিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া তটিনীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সময় হইল। ঘণ্টা বাজিল। গার্ড-এর বাঁশীর শব্দ হইল। তাহার হাতের সবুজ পতাকাটির দিকে শ্রীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তটিনী বলিল—ও শ্রী! দেখ—দেখ!

শ্রীশ বলিল—দেখ্‌লাম। সবুজ। প্রাণের রংএ ছোপান। সমস্ত শরীর দুলিয়ে ও বল্‌ছে—চ'লে যাও, পথের বিঘ্ন দূর হয়েছে—'

এঞ্জিনের চীৎকার শোনা গেল; গাড়ী নড়িয়া উঠিল। দুই জনের মুখে এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, বিদায়-হাসির রেখা। তাহাদের সংবদ্ধ হাতে টান্ পড়িল। তাহার পর জোর করিয়া যেন কোন্ অদৃশ্য-শক্তি দুই জনকে দুই দিকে সরাইয়া লইল! . . .

চোখের বাষ্পবারি, তাহাদের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে! দুই জনের হাতে দুইটি রুমাল, মরণাহত পাখীর মত বাতাসে ডানা ঝাপটিয়া মরিতেছে!—সপিল গতিতে যাত্রী-গাড়ীখানি দূর হইতে দূরান্তরের দিকে সরিয়া সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

শেষ কথা

যে নিয়মের তরঙ্গ-আঘাতে, সংসার-সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদ জাগিয়া উঠে, সেই তরঙ্গের আঘাতেই তাহা মিলাইয়া যায়। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে এ বুদ্বুদের সৃষ্টি হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিলায় না শুধু তাহার হাঁসি-কান্না অভাব-অভিযোগের সুর! তাহার বিরাম নাই। সে সুর যেন আপনার নিয়মে আপনি বাঁধা! অসীম তাহার উচ্ছ্বাস, ভীষণ তীব্র তাহার বেদনা।

ইহারই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে মানুষের জীবন-ধারা। অপ্রতিহত তাহার গতি। অনন্ত তাহার পথ। কোথায় ইহার শেষ, কেহ জানে না। এই প্রাণধারার দুইটি তীর, একটি মিলন, আর একটি বিচ্ছেদ। এক তীরে আছে তাহার দিনের আলো, পাখীর গান, ফোটা-ফুলের হাসি। আর এক তীরে তাহার চির-রাত্রির বাসা! সে শীতল, সে নিবিড়!

এই মিলনের কূলে আসিয়া মানুষ যে সুখ পায়, গণনার সংখ্যায় তাহার হিসাব মিলে। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু বিচ্ছেদের অন্ধকারে তাহাকেই আবার নূতন করিয়া মানুষ ফিরাইয়া পায়, সুখ তখন হয় আনন্দ।—বিচ্ছেদ মানুষের সহ্য হয়, সে বাঁচিতে পারে। এ আনন্দকে হারাইতে হয় না কোন দিন।

একটি সম্পূর্ণ বৎসর প্রায় পূরিয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি মানুষ প্রাণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ লইয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা আবার শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে তাহারা তাকায়, বুকে জাগে তাহাদের দীর্ঘশ্বাস। চোখে আসে জল। তাহার

পর, আগত দিনগুলির জন্য নূতন করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহাকে বরণ করিয়া জীবনের পাত্রটি ভরিয়া লইতে থাকে।

দীপ্তির সহিত শেষ-বিদায়ের বহু মাস পরে, একদিন ভোরের বেলা, পাখীরা যখন মুক্ত আলো-বাতাসের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে গান গাইয়া উঠিয়াছে; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বুকের মধ্যে তীব্র এক বেদনা অনুভব করিয়া বিকাশ জাগিয়া উঠিল। সেই শেষ-বিদায়ের ক্ষণে দীপ্তির লেখা চিঠির কথা তাহার মনে পড়িল। ইহার পূর্ব্বেও বহুবার পড়িয়াছে, কিন্তু এমন বেদনা, এমন অশান্তি সে কোন দিন অনুভব করে নাই! কি লেখা আছে উহার মধ্যে, তাহা সে জানে না।—কিন্তু না জানিয়াও যেন আর তাহার বাঁচিবার উপায় নাই; এমন ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার সহিত চিঠিখানি সে বাক্স হইতে বাহির করিয়া, আবরণ খুলিয়া, প্রভাত আলোয় মেলিয়া দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—'যে বন্ধন তুমি পরালে আমার গলায়, তার সমস্ত গুরুত্বকে তুমি জান না, আমি জানি, তবু নিতে চল্‌লাম।—কিন্তু কোন্ অধিকারে তুমি আমায় বাঁধ্‌লে এমন ক'রে?—মুক্তি চাই বিকাশ, আমায় ছেড়ে দাও—'

সকাল বেলাকার আলো, বিকাশের চোখে ম্লান হইয়া আসিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে পথে বাহির হইয়া সাম্‌নের দিকে চলিতে লাগিল, যেন এই মাত্র একটা কোন দুঃসংবাদ সে পাইয়াছে তাই ছুটিয়া চলিয়াছে প্রাণ দিয়া তাহার প্রতিকার করিতে।

অসিতের বাড়ীতে আসিয়া সোঝাসুঝি উপরে উঠিয়া ভীত, উৎকুন্ঠিত দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। অসিত তখন সেখানে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিল, চিনিতে না পারিয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখে কিছুক্ষণ বিকাশকে দেখিয়া বলিল—বসুন, কাকে চান?—'

শুষ্ক কণ্ঠে বিকাশ বলিল—দীপ্তি, মিসেস্ বিশ্বাস—

অসিত বলিল—তিনি ত এখানে নেই, মার কাছে আছেন। তাঁর খুব অসুখ হয়েছিল।

বিকাশের মুখে অসিতের কথারই প্রতিধ্বনি হইল—অসুখ—?

সে যেন গভীর এক আর্ত্তনাদ! তাহার পর আর কোন কথা না বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি সিঁড়ি দিয়া নামিতে গেল।

অসিত বলিল—ব্যস্ত হবেন না। তিনি ভাল আছেন। আমি এখুনি তাঁর কাছে যাব—চলুন আমিই নিয়ে যাই আপনাকে।

বিকাশ বলিল—চলুন।

তাহার কথা কহিবার শক্তি যেন আর ছিল না। কিছু পরে বলিল—আমি বিকাশ, আমাকে হয় ত আপনি চিন্‌বেন না—

অসিত ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বিকাশের হাত ধরিয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য! খুব চিনি আপনাকে। আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি জানি। কত দিন আমার নিজের ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে টেনে নিয়ে আসি আমাদের কাছে, কিন্তু সাহস হয় নি। আপনার মন অত্যন্ত কঠিন। হয় ত আমাদের ক্ষমা করতেন না।

অসিতের কথা শুনিয়া বিকাশ অবাক্ হইয়া গেল। এই মানুষটি কি ফাঁসীর মত দীপ্তির কণ্ঠে চাপিয়া বসিতে পারে?

অসিত বলিতে লাগিল—আপনার কথা বল্‌তে বল্‌তে বাবা, মা, বড়মাসী, মায়া-দি, সবার চোখ জলে ভ'রে ওঠে! এতখানি ভালবাসা আপনি ঠেলে রেখেছেন?

বিকাশ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর অসিত বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলে তাহার সহিত নীরবে গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

*　　*　　*　　*

ঘরের দরজার সাম্‌নে লক্ষ্ণৌ ছিটের পর্দ্দা ফেলা আছে, তাহা ঈষৎ সরাইয়া ঘরের ভিতরটি একবার দেখিয়া লইয়া, সম্পূর্ণরূপে পুনরায় পর্দ্দাটি সরাইয়া, অসিত বিকাশকে ইঙ্গিত করিল—যান্, দীপ্তি শুয়ে আছে, মায়া-দিও আছেন।

কিন্তু বিকাশের পা উঠিল না। তাহার সর্ব্বশরীর যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে!

কি মনে করিয়া বিকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অসিত ডাকিয়া বলিল—দীপ্তি, তোমাদের জন্যে আজ একটা চমৎকার surprise এনেছি।—মায়া-দি guess করুন ত?—

দীপ্তি মুখ ফিরাইতেই অসিত সরিয়া দাঁড়াইল। এক নিমেষে বহুযুগসঞ্চিত অন্ধকার যেন কাটিয়া গেল! এত নিকটে সে আসিয়াছে! দীপ্তি তাহার দুর্ব্বল কম্পিত হাতদুইটি কপালে ছোঁয়াইয়া বিকাশকে নমস্কার করিল। বিকাশ যন্ত্র-চালিতের মত দীপ্তির বিছানার কাছে আসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে চাহিয়া রহিল।

মায়া বলিল—ভাল আছ বিকাশ?—কিন্তু জিগ্‌গেসই বা আর কর্‌ছি কেন, মুখ দেখ্‌লেই বোঝা যায় মানুষটা কেমন আছে।

মায়ার কথার কোন উত্তর না দিয়া বিকাশ বলিল—এত অসুখ আমি ত জান্‌তাম না!

মায়া বলিল—কি ক'রে জান্‌বে না এলে?—

ঠিক এই সময়ে পাশের ছোট একটি খাটে, সবুজ আবরণের মধ্য হইতে অস্ফুট অথচ তীব্র কাহার ক্রন্দনের শব্দ তাহার কানে আসিতেই তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল—ওকি—ও কে?—

মায়া বলিল—যাও, দেখ—

বিকাশ সরিয়া আসিয়া ছোট বিছানাটির পাশে দাঁড়াইয়া আবরণ সরাইয়া দেখিল। চিনিতেও বিলম্ব হইল না।—এ তাহারই দেওয়া বন্ধন, রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! আর সেই সঙ্গে তাহার মনে পড়িল—সে দিতে আসিয়াছে মুক্তি! . . .

ম্লান একটি হাসির রেখা বিকাশের মুখে দেখা দিল। নীচু হইয়া শিশুর মস্তকে সে চুম্বন রাখিয়া দিল। সে-চুম্বন যেন তাহার পরাজয়ের প্রণতি। বিজয়ীর ললাটে তাহা রাজটীকার মত অক্ষয় হইয়া রহিল। কিন্তু এ পরাজয়ে তাহার কোন ক্ষোভ, কোন গ্লানি, কোন বেদনা রহিল না। অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে তাহার বুক ভরিয়া গেল।

দীপ্তি বলিল—বসুন।

পরাজিতের স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না। বিকাশও তাহার জন্য কোন লোভ দেখাইল না। চোখভরা জল লইয়া সে মায়াকে বলিল—আমি আর কোথাও যাব না মা।

সে আর গেলও না কোন দিন। মিত্র-পরিবারের বুকে এই বন্ধন-মুক্ত অনাত্মীয়টি সংসারের সমস্ত বন্ধনের বেদনা, প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া লয়। দীপ্তিকে ভালবাসে, অসিতকে শ্রদ্ধা করে, মায়াকে বলে মা, স্বর্ণ এবং করুণাকে বলে মাসী! এ অদ্ভুত সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মানুষ হাসে। দিন চলিয়া যায়। বিকাশ সবার দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে বিকশিত করিয়া রাখিল। তাহাকে পাইয়া বীরেন্দ্রনাথ আবার হাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সংসারের সমস্ত শূন্যতা যেন পরিপূর্ণ শান্তিতে ছাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মিত্র-পরিবারের সকলের অপেক্ষা অধিক শান্তি পাইয়াছে দীপ্তি। একদিন সে ভাবিয়াছিল—'বিকাশকে সে আর চিনিতে

পারিবে না।' এখন বিকাশের প্রতি কোন সঙ্কোচ তাহার মনে নাই ; কারণ তাহার কামনা এখন পূজায় পরিণত হইয়াছে। বারে বারে তাহার মন বিকাশকে প্রণাম করে। অসিত বলে—আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি দীপ্তি, যে বিকাশ তোমার বন্ধু। দীপ্তি বলে—আমার কৃতজ্ঞতা কা'কে জানাব জানি না, তুমি আমার স্বামী। প্রত্যেকের জীবন যেন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মায়া এবং শ্রীশকে দেখিয়া করুণা সুবর্ণ প্রভৃতি সকলে ব্যথা পান, কিন্তু যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহারা তাহাদের জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে তাহা ভাবিয়া ভাঙ্গা-মন জোড়া দিবার চেষ্টা করেন না। কারণ জানেন, তাহা সহিবে না।

কিন্তু একজনের জীবন আজও আরম্ভই হইল না! যে পিছনের দিকে তাকায় না, সম্মুখের বিস্তৃত পথের দিকে যে দিনের পর দিন চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেই চির-মৌন উমা।

শান্তা এবং কল্যাণীর মত সেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। মাতা তাহার চির-রুগ্ন ; পিতারও সহসা মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ দুইটি সহোদর, আপনাদের কৃতিত্বে, দুইটি ধনী-কন্যার পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের অপরিসর ঘরগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এই দুইটি ধনীকন্যার বেশীর ভাগ অংশ থাকিত বাহিরে। ভিতরে থাকিত অল্পই, তবু যেটুকু থাকিত, তাহার সবটুকু ভার আসিয়া পড়িয়াছিল উমার উপরেই।

ভার গ্রহণ করিবার শক্তি ছিল তাহার অসীম। মুখে তাহার অসন্তোষ বা ক্লান্তির আভাস দেখা যাইত না কোন দিন, তাই যাহারা চাপ দিত, তাহারা বুঝিতেই পারিত না তাহাদের ভার কতখানি।

পিতার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছে। ধনী-বধূদ্বয়, তাহাদের যৌতুকের অর্থে তাহাদের সংসার চলিতেছে, সময় সুবিধা এবং সুযোগ পাইলেই উমাকে তাহারা বুঝাইয়া দিত।—কথায় নয় ইঙ্গিতে।

কিন্তু এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, সে মায়ার মত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার লইয়াছে। কোন অশান্তিকে সে মনে মাথা গলাইবার পথ দেয় না। অন্ধ বধির মানুষ, রূপ, আলো, শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন উদাসীন, সেও তেমনি অনেক বিষয়েই নির্ব্বিকার ছিল। যেন কিছুই সে বুঝিতে পারে না! তাহাকে দেখিয়া মানুষ অনেক কথাই ভাবে বা প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া ফেলে, সে শুনে, কিন্তু কোন মত প্রকাশ করে না।

উমা ছিল শ্যামলা। স্বভাব ছিল তাহার শান্ত, সংযত। চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্নিগ্ধ, তাহাতে কোন জ্বালা প্রকাশ পাইত না, তাই যেন সে মানুষের ঔৎসুক্যকে তাহার প্রতি টানিয়া আনিতে পারিল না। সে রহিয়া গেল সবার আড়ালে, অম্লান পুষ্পটির মত।

দিনের বেলাটা তাহার বাহিরের কাজের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়। অবসরের সময়টা কাটে, রুগ্ন মাতা পিতার শুশ্রূষায়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর অত্যাচার আবদার মিটাইয়া, এবং ধনী-ভ্রাতৃবধূ-দ্বয়ের কুঞ্চিত নাসিকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায়।

গভীর রাত্রে, পরিশ্রান্ত শরীর-মন লইয়া বিছানায় শুইয়া তাহার সব চেয়ে প্রিয় চিন্তাটিকে বুকে লইয়া উমা দোলা দেয়—তাহার জীবন-পুষ্পের সব কয়টি দল যে ফুটাইবে, সে আসিতেছে। প্রতিদিন অক্লান্ত পদে সে আসিতেছে তাহার দিকে! কল্পনায় তাহার কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায়, ঘুমের ঘোরে সে পায় তাহার স্পর্শ। বুক ভরিয়া উঠে।

শান্তা, কমলা, কল্যাণী, দীপ্তির শান্তিপূর্ণ সংসারের দিকে তাকাইয়া আনন্দে তাহার মন ভরিয়া যায়। প্রাণ ভরিয়া বন্ধুদের মাথায় আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ করে। পরিপূর্ণ, অনাবিল শান্তির ভিতর দিয়া তাহারও দিন কাটিয়া যায়।

বিমল এখনও তাহার 'ভিটার মাটি' আঁগুলিয়া বসিয়া আছে। আর তাহাকে কোন দিন বিচলিত হইতে দেখা গেল না। জীবনকে অধিকাংশ সময় দেশে থাকিতে হয়, রচনা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তাহাকে বড় একটা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু মায়াকে সে তাহার কাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছে। বিমল তৃপ্ত। তাহাকে দেখাইয়া কমলা একদিন মায়াকে বলিল—মনে পড়ে মায়া, তুই ঐ মানুষটাকে কি বলেছিলি?

মায়া বলিল—আমি কি বেদব্যাস? যে যা বল্‌ব তাই সত্যি হবে?

মানুষের দুঃখের প্রতি বিমলের অসীম শ্রদ্ধা। মানুষের দুঃখকে আপনার করিয়া ভাবে, দরদ দিয়া লিখে, মানুষ পড়িয়া শান্তি পায়।

কল্যাণী এখন ঈষৎ একটু মোটা হইয়াছে। মানুষকে লইয়া আমোদ করিবার প্রবৃত্তি আজও তেমনি আছে। সে এখন একটি বিপুল আকারের শিশু-পুত্রের জননী। একদিন দীপ্তির বাড়ীতে তাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া হাসির বন্যা ছুটাইয়া দিল।

শান্তা তাহাকে একটু বেশীদিন পরে দেখিয়াছে, সে অবাক্ হইয়া বলিল—তোর হ'ল কি? আর যে আমাদের খবরই রাখিস্ না!—কবিতা লেখা-টেখা কি জলাঞ্জলি দিলি নাকি?

কল্যাণী বলিল—আর বলিস্ নি ভাই, হাড়মাস ভাজা-
হয়ে গেল! দিনে ছেলে, রাতে ছেলের বাপ!—'

হাসির তরঙ্গে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

কল্যাণী তাহার খোকাকে দীপ্তির কন্যার পার্শ্বে শোয়
বলিল—দেখ্, ঠিক যেন ঢাকের পাশে টেম্-টেমি
খোবা মাংস দেখেছিস্?

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কি নাম দিলি!

কল্যাণী বলিল—'ভাইরল্'।—ঠিক হয় নি?

শ্রীশ তাহার কাজে দুইজন অসীম শক্তিশালী মানুষকে পাইয়া
একজন অসিত, আর একজন সুধীর। দুই জনেই যন্ত্রী। শ্রী
কল্পনাকে তাহারা মূর্ত্ত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করে। ইহারা
আশ্রয় করিয়া আছে তটিনীর শেষ অভিলাষ। যাহারা শ্রী
কারখানায় কাজ করে, তাহারা অবাক্ হইয়া ভাবে, তাহাদের কা
মধ্যে কোথায় যেন মায়ের স্নেহ লুকাইয়া আছে! . . .

সুধীর বলে—একটি লাখ, বেশী নয়, একটি লাখ, এমনি
যদি আমাদের দেশে জন্মায় শ্রীশ, তাহ'লে দেখবে, আমাদের ম
সমস্ত বন্ধনের গ্রন্থিগুলি খসে পড়েছে। তিনি আবার বেঁচে উঠ
বক্তৃতা আর গুণ্ডামি, এতে হবে না। হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকেও না।

সুপ্রকাশ, শ্রীশকে ভালবাসিত কিন্তু তাহাকে বুঝিতে পারে
কোন দিন। শান্তাকে পাইয়া সে তাহাকে বুঝিয়াছে, তাই স
ভৃত্যের মত অত্যন্ত সম্ভ্রম এবং সতর্কতার সহিত তাহাকে চোখে
রাখে। শান্তাকে বার বার বলে—ওকে দেখো, আমার চেয়ে তে
চোখে ওর অশান্তি বেশী ধরা পড়বে।